দেবযান

কুডুলে-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটের সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেচে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ি এদেশের লোক কখনো দেখেনি। পুকুরের ধারে নহবৎ-মঞ্চে নহবৎ বসেচে, রং-বেরঙের কাপড় ও শালু দিয়ে হোগলার আসর সাজানো হয়েচে। খুব জাঁকের বিয়ে।

রাত সাড়ে ন'টা। রায়সাহেবের বাড়ির বড় নাটমন্দিরে বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েচে। তারা সকলেই কলকাতার বাবু, কুডুলে-বিনোদপুরের মত অজ-পাড়াগাঁয়ে যে তাঁদের শুভাগমন ঘটেছে, এতে রায়সাহেব কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন, বার বার বিনীতভাবে বরযাত্রীদের সামনে এই কথাই তিনি জানাচ্ছিলেন। সভামণ্ডপ থেকে নানারকম শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।

—ও কি পালমশায়, না-না—মাছের মুড়োটা ফেললে চলবে না—

—ওরে এদিকে একবার ভাতের বালতিটা (অর্থাৎ পোলাও-এর বালতি—পোলাওকে ভাত বলাই নিয়ম, তাতে সভ্যতা, সুরুচি ও বড়মানুষী চালের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়) নিয়ে আয় না—এঁদের পাত যে একেবারেই খালি—সন্দেশ আর দুটো নিতেই হবে—আজ্ঞে না, তা শুনবো না—বাটাছানার না হলেও পাড়াগাঁয়ের জিনিসটা একবার চেখে দেখুন দয়া করে—

ওদিকে যখন সবাই বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, নাটমন্দিরের সামনে উঠানে একপাশে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সাধারণ লোক খেতে বসেচে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র—সে অন্য লোকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বজায় রেখে একটু কোন মেরে বসেচে। বসলে কি হবে, এদের দিকে পরিবেশনের মানুষ আদৌ নেই—ফলে এরা হাত তুলে খালি-পাত কোলে বসে আছে।

ব্রাহ্মণযুবকের নাম যতীন। পাশের গ্রামের বেশ সৎ বংশের ছেলে। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। লোকটি বড়ই হতভাগ্য। বেশ সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া ভালই জানে, এম্-এ পর্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন্-কো-অপারেশনের সময় কলেজ ছেড়ে বাড়ি আছে। বিবাহ করেছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে, আজ কয়েক বৎসর তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেচে। এখানে নিজেও আসে না, ছেলেমেয়েদেরও আসতে দেয় না। যতীনের বাপ-মা কেউ জীবিত নন—সুতরাং বড় বাড়ির মধ্যে ওকে নিতান্তই একা থাকতে হয়, তার ওপর ঘোর দারিদ্র্যের কষ্ট। একজনের খরচ, তাই চলে না।

ভরসারাম কুণ্ডুর ছোটভাই ওদের পাতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—আরে এই যে যতীন, পাচ্চ-টাচ্চ তো সব? ওরে কে আছিস্ এদিকে পাতে লুচি দিয়ে যা—

যতীনের মনটা খুশি হোল। এতক্ষণ সত্যিই তাদের এখানে দেখবার লোক ছিল না। আয়োজন খুব বড় বটে কিন্তু পরিবেশন করবার ও দেখাশুনো করবার লোকের অভাবে সাধারণ নিমন্ত্রিতদের অদৃষ্টে বিশেষ কিছু জুটচে না।

আহারাদি শেষ হয়ে গেল। এখুনি পুকুরের ধারে বাজি পোড়ানো হবে, কলকাতা থেকে বরপক্ষ ভাল বাজি এনেচে, এসব পাড়াগাঁয়ে অমন কেউ দেখেনি। বাজি দেখবার জন্যে পুকুরের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়েচে। যতীনও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

হুস্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠে গিয়ে প্রায় নক্ষত্রের গায়ে ঠেকে ঠেকে তারপর লাল নীল সবুজ ফুল কেটে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

দলের অনেকে চিৎকার করে উঠলো, আগুন লাগবে। আগুন লাগবে।

দু-চারবার এ রকম তারাবাজি উঠলো নামলো, কারো ঘরের চালে আগুন লাগলো না দেখে উদ্বিগ্ন লোকদের মন শান্ত হোল।

তারাবাজি একটার গায়ে একটা হুস্ করে আকাশে উঠছিল, আর যতীন আশ্চর্য হয়ে সে দিকে চেয়ে দেখছিল একদৃষ্টে ঊর্ধ্বমুখে। বহুদিন ধরে সে পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে আছে, অনেকদিন ভাল কিছু দেখে নি। কলকাতার সে ছাত্রজীবন এখন আর মনে পড়ে না যেন—সে সব যেন গত জন্মের কাহিনী।

সুতোরগাছির মেঘনাথ চক্কত্তি ওকে দেখে বল্লে—এই যে যতীন। আজ রায়সাহেবের বাড়ি খেলে নাকি? তোমার নেমন্তন্ন ছিল? তা তোমাদের বলতে সাহস করে—কই আমাদের বলুক দিকি? ছোট জাত তিলি-তামলি, না হয় দুটো টাকাই হয়েচে, তা বলে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে বাড়িতে!...তোমরা গিয়ে নিজেদের গিয়ে মান খুইয়েচ তাই তোমাদের বলতে সাহস করে—ছিঃ—

যতীন যখন বাড়ি পৌঁছলো তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বাঁশবনের মধ্যে সুঁড়ি পথ পেরিয়ে ওর পৈতৃক আমলের কোঠা। অনেকগুলো ঘরদোর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ তবে এখন সবই শ্রীহীন। একটা ধানের বড় গোলা ছিল, অর্থকষ্টে পড়ে গত মাঘমাসে সে সাড়ে সাত টাকায় গোলাটা বিক্রি করে ফেলেচে। গোলার ইটে-গাঁথুনি-সিঁড়ি ক'খানা মাত্র বর্তমান আছে।

আলো জ্বেলে নিজের বিছানাটা পেতে নিয়েই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে—তেলের পয়সা জোটে কোথা থেকে যে আলো জ্বালিয়ে রাখবে? অন্ধকারে শূন্য বাড়িতে একা বসলেই মনে পড়ে আশালতার কথা।

আশালতা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছরের কথা মনে হোলে তার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এই ধরনের কত শ্রাবণ-রাত্রিতে ঐ ছাদে সে কত নিভৃত আনন্দ-মুহূর্তের কাহিনী এই বাড়ির বাতাসে আজও বাজে, কত মিষ্টি কথা, কত চাপা হাসি, কত সপ্রেম চাহনি।

মনে পড়ে তারা দুজনে একসঙ্গে তারকেশ্বর গিয়েছিল একবার, তখন যতীনেরবড় ছেলেটি আট মাসের শিশু। যাবার আগের দিন রাত্রে আশা রাত একটা পর্যন্ত জেগে খাবার তৈরি করলে। বল্লে, তোমায় কোথাও বাজারের খাবার খেতে দেবো না। নানারকম অসুখ করে যা-তা খাবার খেলে। তার চেয়ে তৈরি করে নিলুম, সস্তাও হবে, কেনা খাবারের চেয়ে। ওখানে গিয়ে বাবার প্রসাদ খেলেই চলবে, পথে এই যা করে নিলুম এতেই কুলিয়ে যাবে।

পথে দুষ্টুমি করে যতীন সব খাবার খেয়ে ফেলেছিল নৈহাটি যাবার আগেই, আশাকে ঠকাবার জন্যে। নৈহাটি স্টেশনে খাবার খেতে চাইলে আশা অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, খাবার একটুকরোও নেই। যতীন হেসে বল্লে—কেমন, বাজারের খাবার কিনতে হবে না যে বড়! এখন কি হয়?

হয়তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই পরের পাঁচ-ছ'মাস তাদের দুজনকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা জুগিয়েছিল। মনে আছে সেই নৈহাটি স্টেশনের কথা? কি হয়েছিল বল তো?

—যাও যাও, পেটুক গণেশ কোথাকার! আমি কি করে জানবো যে—ইত্যাদি ইত্যাদি...

আহা, প্রথম যৌবনের স্বপ্নে রঙিন্ রাগ-সাগরের লীলাচঞ্চল বীচিমালার সে কত চপল নৃত্য! কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে, মিশিয়ে গিয়েচে, অতলতলে তলিয়ে গিয়েচে সে সব দিন। তার ঠিকানা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই।

সেই আশালতা আছে তার বাপের বাড়িতে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দেয়নি যে তার স্বামী বেঁচে আছে না মরেচে। সেও শ্বশুরবাড়ি যায় না; একবার বছর তিনেক আগে গিয়েছিল, নিতান্ত না-থাকতে পেরে। আগে থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিল যে সে যাচ্চে।

দুপুরের আগে সে গিয়ে পৌঁছুলো।অনেক আগ্রহ করে গিয়েছিল। শাশুড়ি ঠাক্‌রুণ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কুটনো কুট্‌ছিলেন, তাঁকে দেখে যেন ভূত দেখলেন। যতীন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তিনি উদাসীন সুরে বল্লেন— থাক্ থাক্ হয়েচে, তারপর, এখন কি মনে করে এখানে?

—এই সব দেখাশুনা করতে এলাম। ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে? কোথায় সব?

—ঐ যে বাইরের দিকে খেলা করচে—ডেকে দিচ্চি।

যতীন স্ত্রীর কথাটা লজ্জায় উল্লেখ করতে পারলে না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যতীনের মনে হোল তারা কি একটা যেন ঢাকচে। ছেলেমেয়েও সব পর হয়ে গিয়েচে, ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চায় না আর। ছোট মেয়েটা তো তাকে দেখে নি বল্লেই হয়, আশা যখন চলে এসেছিল তখন খুকির বয়েস এক বছর মাত্র।

খাওয়া-দাওয়ার সময়েও আশাকে দেখা গেল না। তার ঘরেও নয়। ওর মনে ভয় হোল, আশা বেঁচে আছে তো? লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলে—

ওদের মা কোথায়?দেখচি নে যে?

শাশুড়ি তাড়াতাড়ি বল্লেন—সে এখানে নেই বাপু। সে আজ দিন-দশেক হোল গিয়েচে, তার দিদির শ্বশুরবাড়ি বারাসতে। তারা অনেকদিন থেকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করছিল, তা আমি বলি যাক বাপু দুদিন একটু বেড়িয়ে আসুক। জীবনে তো তার সুখের সীমে নেই!

যতীন ভীষণ নিরাশ হোল। সে যে কত কি মনে ভেবে এসেচে, আশাকে বলবে—চল আশা, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চলো। কাকে নিয়ে কাটাই বলো তো তুমি যদি এমন করে থাকবে?

তারপর শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলে—কবে আসবে?

—আসা-আসির এখন ঠিক নেই। এ মাসে তো নয়ই, পুজোর সময় পর্যন্তও থাকতে পারে। এখানে রাঁধবার লোক নেই, বুড়োমানুষ এতগুলো লোকের ভাতজল করচি দুবেলা, প্রাণ বেরিয়ে গেল।

শেষের কথাটি যে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, যতীনের তা বুঝতে দেরি হোল না। বিকেলের দিকেই সে ভগ্নমনে বাড়ির দিকে রওনা হোল। পথে তার খুড়তুতো শালী আন্না, দশ বছরের মেয়ে, অশথ-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে কাছে এসে বল্লে—দাদাবাবু, আজই এলেন, আজই চল্লেন যে। রইলেন না?

—না, সব দেখাশুনো করে গেলুম। তা ছাড়া তোর দিদি তো এখানে নেই, অনেকদিন পরে এলুম, প্রায় বছর দুই পরে, দেখাটা হোল না।

আন্না কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে চাইলে—তারপরে এদিক ওদিক চেয়ে সুর নিচু করে বল্লে—একটা কথা বলবো দাদাবাবু, কাউকে বলবেন না আগে বলুন!

যতীন বল্লে—না, বলচি নে। কি কথা রে আন্না?

—দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায় নি। আপনার আসবার খবর পেয়ে চৌধুরীদের বাড়ি ওর সই-মার কাছে লুকিয়ে আছে। জ্যাঠাইমা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে এসব কথা না বলতে।

যতীন বিস্মিত হয়ে বল্লে—ঠিক বলচিস্ আন্না!

পরেই বালিকার সরল চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে দৃষ্টিতে মিথ্যার ভাঁজ ছিল না।

যতীন চলে আসচে, আন্না বল্লে—আজ থেকে গেলেন না কেন দাদাবাবু?

—না, থাকা হবে না আন্না। বাড়িতে কাজকর্ম ফেলে এসেচি বুঝলি নে?

আন্না আবার বল্লে—দিদিকে একবার চুপি চুপি বলে আসবো যে আপনি চলে যাচ্ছেন, যদি দেখা করে? যাবো দাদাবাবু?

বালিকার সুরে করুণা ও সহানুভূতি মাখানো। সে ছেলেমানুষ হলেও বুঝেছিল যতীনের প্রতি তার শ্বশুরবাড়ির আচরণের রূঢ়তা। বিশেষ করে তার নিজের স্ত্রীর।

যতীন অবিশ্যি রইল না, চলেই এল।

চলে এল বটে, কিন্তু যে যতীন গিয়েছিল, সে যতীন আর আসে নি। মনভাঙা দেহটা কোনো রকমে বাড়িতে টেনে এনেছিল মাত্র।

তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গিয়েচে। একথা ঠিক যে, সে রকম বেদনা তার মনে এখন আর নেই, থাকলে সে পাগল হয়ে যেতো।সময় তার ক্ষতে অনেকখানি প্রলেপ বুলিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে এনেচে। কিন্তু এমন দিন, এমন রাত্রি আসে যখন স্মৃতির দংশন অসহ্য হয়ে ওঠে।...

তবুও নীরবে সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কিছু তো নেই। এই ক'বছরের মানসিক যন্ত্রণায় ওর শরীর গিয়েচে, মন গিয়েচে, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা নেই, মান-অপমান বোধ নেই।

যে যা বলে বলুক, দিন কোনো রকমে কেটে গেলেই হোল। কিসে কি এসে যায়? তেলি-তামলির বাড়ি নেমন্তন্ন খেলেই বা কি, রবাহুত অনাহুত গেলেই বা কি, লোকে নিন্দে করলেই বা কি, প্রশংসা করলেই বা কি। কিছু ভাল লাগে না—কিছু ভাল লাগে না।

২

যতীনের পৈতৃক বাড়িটা নিতান্ত ছোট নয়। পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েচেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না। পূর্বদিকের আল্‌সেটা কাঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েচে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসে নি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েচে।

গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ির উঠানে। বাবা...মা...বউদিদি....মেজদিদি...পিসিমা...দুইছোট ভাই...আশা...খোকা-খুকিরা...

কত ভালবাসতো সবাই...সব স্বপ্ন হয়ে গেল....কেউ নেই আজ...

সে শিক্ষিত বলে আগে গ্রামের লোক তাকে খুব মেনে চলতো। এখন তারা দেখেচে যে শিক্ষিত হয়েও তার এক পয়সা উপার্জন করবার শক্তি নেই, এতে এখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। তার নামে যা-তা বলে।

আশা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ি গিয়েছিল, তখন লজ্জা ও অপমান ঢাকবার জন্যে যতীন গাঁয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতো—শাশুড়ি-ঠাক্‌রুণের হাতে অনেক টাকা আছে—কোন্ দিন মরে যাবেন, বয়েস তো হয়েচে। এদিকে বড় মেয়ে প্রায়ই মার কাছে থাকে, পাছে টাকার সবটাই বেহাত হয়ে যায় তাই ও বল্লে—দ্যাখো, এই সময়টা কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি গে। নইলে কিছু পাবো না।

এই কৈফিয়ৎ প্রথম প্রথম খুব কার্যকরী হয়েছিল বটে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন লোকে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ বলে, অনেকদিন হয়ে গেল, এইবার গিয়ে বৌকে নিয়ে এসো গে যতীন। শাশুড়ির টাকার মায়া ছেড়ে দাও, বুড়ি সহজে মরবে না।

পিছনে কেউ বলে—এই মোটর গাড়ির শব্দ ওঠে দ্যাখো না! যতীনের বৌ টাকার পুঁটুলি নিয়ে মোটর থেকে নেমে বলবে—এই নাও, পাঁচ হাজার টাকা। তোমার টাকা তুমি রাখো। কি করবে করো—আমি খালাস হই তো আগে! এই ধরো পুঁটুলিটা।

তা ছাড়া আরও কত রকমের কথা বলে—সে সব এখানে ব্যক্ত করবার নয়।

এই সমস্ত ব্যঙ্গ-অপমান যতীনকে বেমালুম হজম করে ফেলতে হয়। সয়ে গিয়েচে, আর লাগে না—মাঝে মাঝে কষ্ট হয় মানুষের নিষ্ঠুরতা বর্বরতা দেখে। একটা সহানুভূতির কথা কেউ বলে না, কেউ এতটুকু দরদ

দেখায় না—কি মেয়ে, কি পুরুষ। সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা, দুঃখে কষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখীকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।

মানুষ হয়ে মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারতো না যদি একটু ভেবে দেখতো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের চিন্তার বালাই নেই তো!

এসব ভেবে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এসব সে গায়ে মাখে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অপমান। এর পরেও সে লোকের বাড়িতে ভাত চেয়ে খায়। কোনদিন লোকে দেয়, কোনদিন দেয় না—বলে, বাড়িতে অসুখ, রাঁধবার লোক নেই—বড়ই লজ্জিত হোলাম ভাই...ইত্যাদি।

যতীনের বাড়ির পেছনে খিড়কির বাইরে ছোট্ট বাগান আছে, তাতে একটা বড় পাতিলেবুর গাছ আছে। যেদিন কোথাও কিছু না মেলে, গাছের লেবু তুলে সে বিনোদপুরের হাটে বিক্রি করতে নিয়ে যায়, আম কাঁঠালের সময় গাছের আম কাঁঠাল মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। এতেও লোকে নিন্দে করে—শিক্ষিত লোক হয়ে ভদ্রসমাজের মুখ হাসাচ্চে। রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডু কেন তার বাড়ির কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করতে সাহস না করবে?

এক সময় বড্ড বই পড়তে ভালবাসতো সে। অনেক ভাল ভাল ইংরিজি বই ছিল, সংস্কৃত বই ছিল তার ঘরে—কতক নষ্ট হয়ে গিয়েচে, কতক সে-ই বিক্রি করে ফেলেচে অভাবে পড়ে। এইসব নির্জন রাত্রে বইগুলোর জন্যে সত্যি মনে কষ্ট হয়।

এইরকম নির্জন রাত্রে বহুদিন আগেকার আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে অনেকদিন। ভুলেও তাকে গিয়েছিল, কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেচে।

গত পাঁচ বছরে যতীন অনেক শিখেচে। মানুষের দুঃখ বুঝতে শিখেচে, নিজের দুঃখে উদাসীন হয়ে থাকতে শিখেচে, জীবনের বহু অনাবশ্যক উপকরণ ও আবর্জনাকে বাদ দিয়ে সহজ অনাড়ম্বর সত্যকে গ্রহণ করতে শিখেচে।

বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অসুখে। একা থাকতে হয়, এক ঘটি জল দেবার মানুষ নেই। মাথার কাছে একটা কলসী রেখে দিত—যতক্ষণ শক্তি থাকতো নিজেই জল গড়িয়ে খেত—যখন না থাকতো শুয়ে চিঁ চিঁ করতো। গাঁয়ের লোক একেবারেই যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু সে নিতান্ত দায়সারা গোছের দেখা। তারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতো—হয়তো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়ে ক্বচিৎ এক বাটি সাবুও পাঠিয়ে দিতো—সেও দায়সারা গোছের। সে দেওয়ার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ থাকতো না।

অনেকে পরামর্শ দিতো—ওহে, বৌমাকে এইবার একখানা পত্র দাও। তিনি আসুন—না এলে এই অবস্থায় কে দেখে, কে শোনে, কে একটু জল মুখে দেয়। আমাদের তো সব সময় আসা ঘটে ওঠে না, বুঝতেই তো পারো, নানারকম ধান্ধাতে ঘুরতে হয়। নইলে ইচ্ছে তো করে, তা কি আর করে না?...ইত্যাদি।

এ কথার কোনো উত্তর সে দিতো না।

৩

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যতীন সেরে উঠলো।যার কেউ নেই, ভগবান তাকে বোধ হয় বেশিদিন যন্ত্রণা ভোগ করান না। হয় সারান, নয় সারাবার ব্যবস্থা করেন। বৈকালের দিকে নদীর ধারের মাঠে সে বেড়াতে গেল। একটা জায়গায় একটা বড় বাবলা কাঠের গুঁড়ি পড়ে। চারিদিক ঘিরে সেখানে বনঝোপ। পড়ন্ত বেলায়

পাখির দল কিচ্ কিচ্ করচে, কেলে-কোঁড়া লতায় শরতের প্রথমে সুস্নিগ্ধ ফুল ফুটেচে, নির্মেঘ আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল।

গাছের গুঁড়িটার ওপর সে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় রইল। শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বা বসতে কষ্ট বোধ হয়।

ওর মনে একটা ভয়ানক কষ্ট...বিশেষ করে এই অসুখটা থেকে ওঠবার পরে। মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েচে রোগে পড়ে থেকে। নইলে যে আশালতা অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচে তার সঙ্গে, রোগশয্যায় পড়ে সেই আশালতার কথাই অনবরত মনে পড়বে কেন। শুধু আশালতা...আশালতা...

না, চিঠি সে দেবে না—দেয়ও নি। মরে যাবে তবুও চিঠি দেবে না। মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি, আশালতা আসবে না। যদি না আসে, তার বুকে বড় বাজবে, পূর্বের ব্যবহার সে খানিকটা এখন ভুলেচে, স্বেচ্ছায় নতুন দুঃখ বরণ করার নির্বুদ্ধিতা তার না হয়। সে অনেক দুঃখ পেয়েচে, আর নয়।

সব মিথ্যে...সব ভুল....প্রেম, ভালবাসা সব দুদিনের মোহ। মূর্খ মানুষ যখন মজে, হাবুডুবু খায়, তখন শত রঙিন কল্পনা তাতে আরোপ করে প্রেমাস্পদকে ও মনের ভাবকে মহনীয় করে তোলে। মোহ যখন ছুটে যায়, অপস্রিয়মাণ ভাঁটার জল তাকে শুষ্ক বালুর চড়ায় একা ফেলে রেখে কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্হিত হয় তার হিসেব কেউ রাখে না।

এই নিভৃত লতাবিতানে, এই বৈকালের নীল আকাশের তলে বসে সে অনুভব করলে জগতের কত দেশে, কত নগরীতে, কত পল্লীতে কত নরনারী, কত তরুণ, কত নবযৌবনা বালিকা প্রেমের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে আজ এই মুহূর্তে কত যন্ত্রণা সহ্য করচে। নিরুপায় অসহায় নিতান্ত দুঃখী তারা। অর্থ দিয়ে সাহায্য করে তাদের দুঃখ দূর করা যায় না। কেউ তাদের দুঃখ দূর করতে পারে না। এই সব দুঃখীদলের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে যেন একটা অদৃশ্য যোগ অনুভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।

দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, এই কষ্টই তাকে যন্ত্রণা দিয়েচে সকলের চেয়ে বেশি। আশা যদি আবার আজ ফিরে আসে—পুরোনো দিনের আশা হয়ে ফিরে আসে—সে নতুন মানুষ হয়ে যায় আজ এই মুহূর্তে। দশটি বছর বয়েস কমে যায় তার।

যাক, আশার কথা আর ভাববে না। দিনরাত ঐ একই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেচে। সে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

হঠাৎ সে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদচে।

একি ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ—নাঃ, সে সত্যিই পাগল হবে দেখচি। যতীন কাঠের গুঁড়িটা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ব্যস্তভাবে পায়চারি করতে লাগলো। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েচে—আর সে ও কথাই ভাববে না। যে গিয়েচে, ইচ্ছে করে যে চলে গিয়েচে, তাকে মন থেকে কেটে বাদ দিতে হবে—হবেই। কেটে বাদই দেবে সে।

যতীন বাড়ি ফিরে এল। অন্ধকার বাড়ি, অন্ধকার দোর। ভাঙা তক্তাপোশের ওপর তার রাজশয্যা তো পাতাই আছে। সে কেউ ঝাড়েও না, পাতেওনা, তোলেওনা।অন্ধকারের মধ্যে শয্যায় দেহ প্রসারিত করে শোবার সময় একবার তার মনে হোল—সেই আশা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে!

সেই রাত্রেই যতীনের আবার খুব জ্বর হোল। হয়তো এতখানি পথ যাতায়াত করা, এত ঠাণ্ডা লাগানো দুর্বল শরীরে তার উচিত হয় নি। পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল—কেউ খোঁজ খবর নিলে না। দুপুরের পর বোষ্টমদের বৌ ওদের উঠোনে তাদের পোষা ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলা পর্যন্ত ঘরের দোর বন্ধ দেখে বাড়ি গিয়ে খবর দিলে। সে সকালের দিকে আরও দুবার এদিকে কি কাজে এসে দোর বন্ধ দেখে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে তার জ্বর কমলে সে নিজেই দোর খুললে। কিন্তু এক পাও বাইরে আসতে পারলে না। বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তার জিব শুকিয়ে গিয়েচে। কাছাকাছি কারো বাড়ি নেই যে, ডাকলে শুনতে পাবে। বেশি চেঁচানোরও শক্তি নেই।

সকালে কেউ দেখতে এল না। এর একটা কারণ ছিল। যতীনের বাড়ি ইদানীং বড় একটা কেউ আসতো না। এক ছিলিম তামাকও যেখানে খেতে না পাওয়া যাবে, পাড়াগাঁয়ে সে-সব জায়গায় লোক বড় যাতায়াত করে না। কাজেই দুদিন কেটে গেল, যতীনের ঘরের দোর বন্ধ রইল, কেন লোকটা দোর খুলছে না, এ দেখবার লোক জুটলো না। পরের দিন অনেক বেলায় বোষ্টম-বৌ আবার ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলায় যতীনের দোর বন্ধ দেখে ভাবলে—যতীন ঠাকুর কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্চে আজকে!...বেলা দশটা বাজে এখনো সাড়াশব্দ নেই! বেলা বারোটার সময় একবার কি ভেবে আবার এসে দেখলে তখনো দোর বন্ধ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে না। পাড়ার মধ্যে খবরটা বল্লে।

পাড়ার দু-চারটা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের যুবক এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

—ও যতীন দা, এত বেলায় ঘুম কি, দোর খুলুন—ও যতীন-দা—

কেউ সাড়া দিলে না। আরও লোকজন জড় হোল—দোর ভাঙা হোল।

যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেচে কে জানে, দু'ঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।

তখন সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলো। বাস্তবিকই কারো দোষ ছিল না। যতীন লোকটা আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছিল, লোকজনের সঙ্গে তেমন করে মিশতো না, কথাবার্তা বলতো না বলে লোকেও এদিকে বড় একটা আসতো না। সুতরাং যতীনের আবার অসুখ হয়েচে, এ খবরও কেউ রাখে না।

নবীন বাঁড়ুয্যে বল্লেন—আহা, ভবতারণ-দা'র ছেলে! ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পাশা খেলেচি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে। লোকটা বেঘোরে মারা গেল। তাই কি আমি জানি ছাই যে এমনি একটা অসুখ হয়েচে (বাস্তবিকই তিনি জানতেন না), আমার স্ত্রী আর আমি এসে রাত জাগতাম। আর সে বৌটিরই বা কি আক্কেল—ছ'বছরের মধ্যে একবার চোখের দেখা দেখলে না গা—হ্যাঁ?

সকলে একবাক্যে যতীনের বৌ-এর উদ্দেশে বহু গালাগালি করলে।

যতীনের মৃতদেহ যখন শ্মশানে সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হোল, তখন বেলা দুটোর কম নয়।

৪

যতীন হঠাৎ দেখতে পেলে তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসচে।...

পুষ্প! এক সময় পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল?

দুজনে—

নৈহাটিরঘাটে

বসে পৈঠার পাটে

কত খেলেচি ফুল ভাসায়ে জলে—

সেই পুষ্প।

নৈহাটির ঘাট নয়—সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। নৈহাটির আরপারে।

সেখানে ছেলেবেলায় তার মাসিমার জীবদ্দশায় সে কতবার গিয়েচে। এক এক সময় ছ'মাস আটমাস মাসিমার কাছেই সে থাকতো। মাসিমার ছেলেপুলে ছিল না, যতীন ছিল তার চক্ষের মণি। তারপর মাসিমা মারা গেলে, মেসোমশায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন, সাগঞ্জ-কেওটাতে মাসিমার বাড়ির দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে।

বুড়োশিবতলায় পুরোনো মন্দিরের কাছে ছিল ওর মাসিমার বাড়ি আর রাস্তা। ওপাশেই ছিল পুষ্পদের বাড়ি। পুষ্পর বাবা শ্যামলাল মুখুয্যে বাঁশবেড়ের বাবুদের জমিদারিতে কি কাজ করতেন। পুষ্প ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে—তার হাসি—সে হাসি কেবল পুষ্পই হাসতে পারতো। দোষের মধ্যে পুষ্প ছিল অত্যন্ত গর্বিত মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল তার মত সুন্দরী মেয়ে এবং তার বাবার মত সম্ভ্রান্ত লোক গঙ্গার ওপারে কোথাও নেই।

ধীরে ধীরে পুষ্পের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, ধীরে ধীরে সে আলাপ জমে। ও তখন তেরো বছরের ছেলে, পুষ্প তেরো বছরের মেয়ে। সমান বয়স হোলে কি হবে, বাচাল ও বুদ্ধিমতী পুষ্পের কাছে যতীন ভেসে যেতো। পুষ্প চোখে-মুখে কথা কইতো, যতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার গর্বিত সুন্দর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইত। মস্ত অশ্বত্থগাছ যে পুরোনো ঘাটটার ওপরে, যেটার নাম সেকালে ছিল বুড়োশিবতলার ঘাট, ওই ঘাটে কতদিন সে ও পুষ্প একা বসে গল্প করেচে, জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের দিন পাঁপরভাজা কিনে ঘাটের রানার ওপর বসে দুজনে ভাগ করে খেয়েচে। কেমন করে যে সেই রূপ-গর্বিতা বালিকা তার মত সাদাসিধে ধরনের বালককে অত পছন্দ করেছিল, অত দিনরাত মিশতো, নিত্য তাদের বাড়ি না গেলে অনুযোগ করতো—এ সব কথা যতীন জানে না, সে সব বোঝবার বয়েস তখন ওর হয়নি।

দু-দশ দিন নয়, দেড় বছর দুবছর ধরে দুজনে কত খেলা করেচে, কত গল্প করেচে, কত ঝগড়া করেচে, পরস্পরের নামে পরস্পরের গুরুজনের কাছে কত লাগিয়েচে, আবার দুজনে পরস্পরে যেচে সেধে ভাব করেচে—সে কথা লিখতে গেলে একখানা ইতিহাসের বই হয়ে পড়ে।

মাসিমার মৃত্যুর পরে কেওটার পথ বন্ধ হোল। বছরখানেকের মধ্যে পুষ্পও বসন্ত হয়ে মারা গেল। দেশে থাকতে পুষ্পর মৃত্যুসংবাদ মেসোমশায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল। তারপর তেরো বছর কেটে যাওয়ার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে যতীন বিবাহ করে। বাল্যের তেরো বছর—বহুদিন। পুষ্প তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েচে। তারপর আশালতার সঙ্গে নবীন অনুরাগের রঙিন দিনগুলিতে পুষ্প একেবারে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চাপা পড়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনো যে কক্ষ সে একবার অধিকারকরেচে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি আর ফিরেও না আসে কখনো, চিরদিনের জন্যই চলে যায়—এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে—তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ সুদ্ধ সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়—তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।

পুষ্পের ঘরের কবাট বন্ধ ছিল—চাবি দেওয়া, বাইরে ছিল পুষ্পের নাম লেখা। হয়তো চাবিতে মরচে পড়েছিল, হয়তো কবাটের গায়ে ধুলো মাকড়সার জাল জমেছিল, হয়তো এ ঘরের সামনে অনেক দিন কেউ আসে নি, কিন্তু সে ঘর দখল করে কার সাধ্য?আশালতা সে ঘরে ঢোকে নি—আশালতার ঘর আলাদা।

সেই পুষ্প।

যতীন অবাক্ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা ওর মনে উঠলো সেটা এই যে, পুষ্পের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে যে বহু বছর কেটে গিয়েচে—তেরো বছর পরে সে বিয়ে করে আশাকে, বিয়ে করেচেও আজ দশ বছর—এই দীর্ঘ, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটের সেই রূপসী মেয়ে বালিকা পুষ্প কোথা থেকে এল? যে বয়সে তারা দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে

বসে পৈঠার পাটে

খেলা করেছিল ফুল ভাসায়ে জলে—!

বুড়োশিবতলার ঘাটের প্রাচীন সোপানশ্রেণীর ওপরে বাঁকাভাবে অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েচে—ঘাটের রানায় শেওলা জমেচে, ঠিক ওপারে হালিসহরে শ্যামাসুন্দরী ঘাটের মন্দিরেও পড়েচে রাঙা আলো, কিন্তু সেটা পড়েচে পশ্চিমদিক থেকে সোজাভাবে গিয়ে, এখনো সেই প্রাচীন পাখির দল ডাকচে বড় অশ্বত্থগাছটার ডালে ডালে, সাদা পাল তুলে ইলিশ মাছ ধরা পুরোনো জেলেডিঙির সারি চলেছে ত্রিবেণীর দিকে...যতীন বসে পুষ্পের সঙ্গে গত বারোয়ারীতে যাত্রায় দেখা কি একটা পালার গল্প করচে...তেইশ বছর পরেও পুষ্প এখনো সেই রকমটি দেখতে রয়েচে কেমন করে?

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল—পুষ্প তো নেই! সে তো বহুকাল মরে গিয়েচে। ব্যাপার কি, সে স্বপ্ন দেখচে না কি? পুষ্প কিন্তু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বল্লে—অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখচো কি? চিনতে পেরেচো? বল তো আমি কে?

যতীন তখনো হাঁ করে চেয়েই আছে। বল্লে—খুব চিনেচি। কিন্তু তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কত কাল হোল—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—মরে গিয়েচি, অর্থাৎ তোমার হাড় জুড়িয়েছিল—এই তো? কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন করে? তুমিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েচ অর্থাৎ পটল তুলেচ।

যতীনের হঠাৎ বড় ভয় হোল। এ সব কি ব্যাপার? তার জ্বর হয়েছিল খুব, সে কথা মনে আছে। তারপর মধ্যে কি হয়েছিল তার জানা নেই। বর্তমানে বোধ হয় তার জ্বরের ঘোর খুব বেড়েচে, জ্বরের ঘোরে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখচে। তবুও সে এতকাল পরে পুষ্পকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হোল। স্বপ্নই বটে, বড় মধুর স্বপ্ন কিন্তু!

পুষ্প কিন্তু ওকে ভাববার অবকাশ দিলে না। বল্লে—পুরোনো দিনের মত দুষ্টুমি কোরো না যতুদা। এখন তুমি ছেলেমানুষটি নেই। এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে, থাকতে পারচি না—এখন এসো আমার সঙ্গে।

সে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? সে তো কিছুই বুঝতে পারচে না। যাবে কোথায় চলে সে? পুষ্পই বা আসে কোথা থেকে? অথচ সে তো এই তার পুরোনো ঘরেই রয়েচে। ঐ তো চুনবালি খসা দেওয়াল, ঐ তো উঠোনের পেঁপে গাছটি, ঐ পৈতৃক আমলের গোলার ভাঙা সিঁড়ি।

পুষ্পকে সে বল্লে—তুই কি করে জানলি আমার অসুখ করেচে? প্রশ্ন করলে বটে, অথচ যতীন সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে, আশ্চর্য! কাকে একথা জিজ্ঞেস করচি? পুষ্প, যে তেইশ বছর আগে মারা গিয়েচে, তাকে? অদ্ভুত স্বপ্ন তো! এমনধারা স্বপ্ন তো সত্যিই জীবনে কোনদিন দেখি নি!

পুষ্প বল্লে—কি করে জানলুম? বেশ কথাটি বল্লে তো যতুদা! তোমার এই ঘরে তোমার কাছে আমি বসে নেই পরশু তোমার জ্বর হওয়ার দিন থেকে? দিন রাতে অনবরতই তো তোমার শিয়রে বসে।

—বলিস্ কি পুষ্প! আমার শিয়রে তুই বসে আছিস দুদিন থেকে? পুষ্প, একটা কথা বল্ তো—আমি পাগল হয়ে যাই নি তো জ্বরের ঘোরে?

—সবাই ও-রকম কথা বলে যতুদা। প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের বারোআনা ওই কথাই বলে। তারা বুঝতে পারে না তাদের কি হয়েচে। তুমিও জ্বালালে যতুদা।

কথা শেষ করে পুষ্প ওর হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে নিতেই যতীন বেশ সুস্থ ও হালকা অনুভব করলে নিজেকে। তারপর কি মনে করে খাটের দিকে একবার চাইতেই সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাটের ওপর তার মত একটা দেহ নির্জীব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ মুখ—সবই তার মত।

পুষ্প বল্লে—দাঁড়িও না যতুদা—এসো আমার সঙ্গে। কেমন, এখন বোধ হয় বিশ্বাস হয়েচে? বুঝলে এখন?

পুষ্প তো ঘরের দরজা খুললে না? তবে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কি করে! এখনো রাত আছে। অন্ধকার হয়েচে, মাথার ওপরে অগণ্য তারা জ্বলচে...নবীন বাঁড়ুয্যের বাড়ির দিকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করচে। অথচ এই ঘন অন্ধকার রাত্রে সে চলেচে কোথায়?কার সঙ্গেই বা চলেচে? এখনো কি সে স্বপ্ন দেখচে?

পুষ্প বল্লে—এখন বিশ্বাস হোল যতুদা? দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এলাম কি করে এলামদেখলে না?

—কি করে এলাম?

—ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধোঁয়ার মত। আমাদের এ শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমায় দেখাবো, পায়ে হেঁটে যেও না, মনে ভাবো যে উড়ে যাচ্চি—

যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেচে। দুজনে চললো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্চে, যতীন কিছুই জানে না।

সে অনেক কথা ভাবছিল যেতে যেতে। এত অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে আর কখনো হয়নি। স্বপ্নে কি এমন সব ব্যাপার ঘটে? স্বপ্ন যদি না হয় তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কেমন করে হয়, তবে পুষ্প আসে কোথা থেকে? কিম্বা সবটাই মনের ধাঁধা—hallucination?

না—একেই বলে মৃত্যু?

এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? কেউ তো কখনো তাকে বলেনি যে মৃত্যুর পরে মানুষ জীবিত থাকে—বরং তার মনে হচ্চে সে আরও বেশি জীবন্ত হয়েচে—বেঁচেই বরং রোগের যন্ত্রণায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেচে—দেশটা পৃথিবীর মতই। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে—কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য দেখা যায় না—অথচ অন্ধকারও নেই—ভারি চমৎকার এক ধরনের অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরি।

এক জায়গায় এসে পুষ্প থামলো।

একি! এ তো সেই পুরোনো দিনের কেওটা-সাগঞ্জের বুড়োশিবতলার ঘাট। ঐ গঙ্গা। ঐ সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা। ঐ তো বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরটা। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে গোধূলির সময় মেঘলা আকাশে যেমন একটা অদ্ভুত হল্‌দে আলো হয়, ঠিক তেমনি একটা মৃদু, তাপহীন, চাপা আলো গাছপালায়, গঙ্গার জলে, বুড়োশিবের মন্দিরের চুড়োয়। ওকে ঘাটের সোপানে একা বসিয়ে পুষ্প কোথায় চলে গেল। যতীন চুপ করে বসে অদ্ভুত আলোকে রঙিন গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে রইল। বাল্যের শত সুখের, শত আনন্দস্মৃতির রঙ্গস্থল সেই পুরোনো জায়গা—ঐ তো ওপারে শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, শ্যামাসুন্দরীর মন্দির। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কোনো দিকে আর কোনো লোকজন নেই। এতখানি সুবিস্তীর্ণ স্থান একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই সে ছাড়া!

এমন সময়ে অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই প্রাচীন পথটা দিয়ে পুষ্পকে আসতে দেখা গেল। তার খোঁপায় কি একটা ফুলের মালা জড়ানো।

যতীন বল্লে—এ কোথায় অন্‌লি পুষ্প? বুড়োশিবতলার ঘাট না? এ কিসাগঞ্জ-কেওটা?

পুষ্প যে সত্যিই দেবী, যতীন তার দিকে চেয়ে সেটা এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলে। এমন গাঢ়যৌবনা, শান্ত আনন্দময়ী মূর্তি মানবার হয় না—কি রূপই তার ফুটেচে। কি জ্যোতির্ময় মুখশ্রী! যতীন অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

পুষ্প বল্লে—না যতুদা—এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয়!...

তারপর মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—এ আমাদের স্বর্গ—তোমার আর আমার স্বর্গ।

৫

যতীনকে পুষ্প একটা ছোট-খাটো সুন্দর বাড়িতে নিয়ে গেল। সে বাড়ি ইট-কাঠের তৈরি নয়, যেন মনে হোল এক ধরনের মার্বেল পাথরে তৈরি, কিন্তু মার্বেল পাথরও নয় সে জিনিস। বাড়ির চারিধারে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঠ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পুষ্প বল্লে—এসব আমার তৈরি। জানো আমি এদেশে এসেচি আজ আঠারো বছর, তোমার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে বসে আছি। পৃথিবীতে কেওটার গঙ্গার ঘাটের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু ছিল না। এখানে এসে কল্পনায় তাই সৃষ্টি করেচি। এখানে যার যা ইচ্ছে কল্পনায় গড়ে নিতে পারে। এই বাড়িও আমার কল্পনায় তৈরি।

যতীন বল্লে—কেমন করে হয়?

—এদেশের বস্তুর ওপর চিন্তার শক্তি খুব বেশি! পৃথিবীর বস্তুর মত এখানকার বস্তু নয়। আরও অনেক সূক্ষ্ম—অন্য ধরনের, সে পরে নিজেই টের পাবে। চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে তোমাকেও শিখতে হবে—সৃষ্টি করতে হোলে পৃথিবীতেও যেম্‌নি চিন্তার দরকার, এখানে তার চেয়েও বেশি দরকার। চিন্তার শক্তিকে যে বাড়াতে পেরেছে, ইচ্ছামত চালাতে পারে, সে এদেশের বড় কারিগর। কিন্তু এও যে বস্তু, সে বিষয়ে ভুল নেই; পৃথিবীর মানুষ যাকে চেনে, সে বস্তু নয়—তা হোলেও বস্তুই।

—আমার বাবা-মা কোথায় পুষ্প?

—এখনই আসবেন। অসুখের সময় তোমার মা আর আমি তোমার শিয়রে বসে থাক্‌তাম। তাঁরা অন্য জায়গায় থাকেন। পৃথিবী থেকে তোমাকে আনতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সন্তানের মরণের দৃশ্য তাঁদের দেখতে কষ্ট হবে ভেবে আমিই তাঁদের যেতে বারণ করি। তোমার পৃথিবীর দেহটা বড্ড খারাপ দেখতে হয়ে গিয়েছিল মরণের আগে—মা গো, ভাবলে ভয় করে।

যতীন বল্লে—আর তোমাদের দেখলে আমার ভয় হচ্ছে না? তোমরা যে ভূত, সেটা খেয়াল আছে?

পুষ্প বল্লে—সে তো তুমিও।

যতীন বল্লে—এদেশে আর সব লোক গেল কোথায় পুষ্প? এখানে কি তুমি আরআমি দুটি প্রাণী? তোমার বাবা-মা কোথায়?

পুষ্প হেসে বল্লে—এটা তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চল। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েচ বলে এখানে আসতে পেরেচ—আর এসেচ আমি এখানে তোমায় ডেকেচি, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেচি তোমার দুঃখের দিনের অবসানের জন্যে। সে সব কথা তুমি কি জানো? নইলে সাধারণ লোক মরার পরে এ জায়গায় আসতে পারে না? আমার বাবা এখনো মরেন নি, খুব বড়ো হয়েচেন, কালনায় আছেন, আমাদের দেশে। মা অনেক বছর স্বর্গে এসেচেন বটে, কিন্তু তিনি অন্য জায়গায় আছেন। এ স্তরের নিয়ম এই যে তুমি যদি ইচ্ছে

করো তুমি কাউকে দেখতে পাবে না, কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তুমি আমি এখন নির্জনে খানিকটা থাকতে চাই—কতকাল তোমায় দেখিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিনি—আমি চাইনে যে এখানে এখন কেউ আসে।

কথা শেষ করে পুষ্প একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন দেখলে। তারপর বল্লে—চলো তোমায় পৃথিবীতে একবার নিয়ে যাই। তোমার মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করচে। তোমার দেখা দরকার।

পুষ্প যতীনের হাত ধরলে, পরক্ষণেই স্বর্গ গেল মিলিয়ে। তাদের গ্রামের শ্মশানে যতীন দেখলে সে আর পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। চিতার ধূম জিউলি গাছটার মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেচে।

যতীন হেসে বল্লে—দেখচিস্ পুষ্প, পুণ্যাত্মার চিতার ধোঁয়া কতদূর উঠেচে!

পুষ্প বল্লে—আমি না থাকলে পুণ্যাত্মাগিরি বেরিয়ে যেতো।

তাদের পাড়ার ছেলে-ছোক্‌রার দল মৃতদেহ এনেচে। বুড়োদের মধ্যে এসেছেন নবীন বাঁড়ুয্যে। তিনিই মুখাগ্নি করচেন। সকলেই আশালতাকে কি করে খবরটা দেওয়া যায় সেই আলোচনা করচে।

যতীন হঠাৎ বলে উঠলো—পুষ্প, আশালতাকে একবার দেখবো। নিয়ে যাবি? ওর বড্ড সর্বনাশ করে গেলাম, ওর জন্যে ভারি মন কেমন করচে।

পুষ্প বল্লে—ভাবো যে তুমি আশালতাদের বাড়ি গিয়েচ। বেশ মনকে শক্ত করে ভাবো।

আশালতা স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কিছুই জানে না, সে দুপুরে খাওয়ার পরে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে অবস্থায় নিশ্চিন্ত-মনে মাটির ওপর ঘুমুতে দেখে দুঃখে ও সহানুভূতিতে যতীনের মন পূর্ণ হয়ে গেল। আহা, হিন্দুর মেয়ে, স্বামী অভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কি অসহায় অবস্থাতেই পড়লো! আজ হয়তো বুঝতে পারবে না—কিন্তু একদিন বুঝতেই হবে। মায়ের পাশে ছোট মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল, খোকা পাড়ায় কোথায় খেলতে গিয়েচে। এই বয়সে পিতৃহীন হোল—সত্যি, কি দুর্ভাগা ওরা!

পুষ্প ওসব ভাবনা যতীনকে ভাবতে দিলে না। বল্লে—চলো যাই, পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকা নিয়ম না।

আশালতাকে আঁচল পেতে মাটিতে ঘুমুতে দেখে পর্যন্ত যতীন যেন কেমন হয়েগিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছা নেই স্বর্গে যেতে। তার মন আর কোথাও যেতে চায় না। পুষ্প বল্লে—যতীনদা, তুমি এত ভালবাসো আশাকে! ওর মত হতভাগিনী মেয়েও দেখিনি, ও তোমাকে বুঝলো না। সত্যি কষ্ট হয় ওর জন্যে, কিন্তু তুমি এখানে থেকে ওর কোনো সাহায্য করতে পারবে না। চলো যাই।

গতির বেগে পৃথিবীটা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু মেঘ—সাদা মেঘ চারিদিকে। ওদের পায়ের তলায় বহুদূরে কোথায় অভাগিনী আশালতা মেঝেতে আঁচল পেতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমুতে লাগলো।

যতীন বাড়ি ফিরে এসে দেখলে একটি মহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করচেন। প্রথমে দূর থেকে তার মনে হোল এঁকে কোথায় সে দেখেচে—কিন্তু মহিলাটি যখন ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তখন তার চমক ভাঙ্‌লো।

—বাবা মন্টু, বাবা আমার! আমার মানিক!...

—মা, তুমি?

যতীন মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক্ হয়ে গেল। বাহান্ন বছর বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু এখন তাঁর মুখে বার্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই। তাই বোধহয় সে মাকে চিনতে পারেনি প্রথমটা।

—বাবা কোথায় মা?

যতীন কথা শেষ করে ঘরের দোরের দিকে চাইতেই বাবাকে দেখতে পেলে। পঞ্চাশ বছর বয়সে যতীনের বাবা মারা গিয়েছিলেন—এ চেহারা তত বয়সের নয়। এ দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোক নেই? যতীন বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি এগিয়ে এসে ওকে আশীর্বাদ করলেন। বল্লেন—তোমার এখনো আসবার বয়েস হয়নি বাবা, আর কিছুদিন থাকলে বিষয়-সম্পত্তিগুলোর একটা গতি করতে পারতে। মাখন রায়ের জমিটা কত শখ করে খরিদ করেছিলাম কাছারির নীলেমে, সেটা রাখতে পারলে না বাবা? আর বেছ্‌লে বেছ্‌লে ওই শশধর চক্কত্তি ছাড়া আর কি লোক পেলে না?

যতীনের মা বল্লেন—আহা বাছা এল পৃথিবী থেকে এত কষ্ট পেয়ে, তোমার এখন সময় হোল পোড়া বিষয়ের কথা নিয়ে ওকে বক্‌তে? কি হবে বিষয় এখানে? কি কাজে লাগবে মাখন রায়ের জমি এখানে আমায় বুঝিয়ে বলো তো শুনি?

যতীনের বাবা বল্লেন—তুমি মেয়েমানুষ, বিষয়ের কি বোঝ? তুমি সব কথার ওপর কথা বলতে আসো কেন? মাখন রায়ের জমা—

পুষ্প ঘরে ঢুকতে যতীনের বাবা কথা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। যতীনের মা বল্লেন—পুষ্পকে চিনতে পেরেছিলি তো মন্টু?

যতীন বল্লে—খুব।

—ওর মত তোকে ভালবাসতে আর কাউকে দেখলুম না। এই আঠারো-উনিশ বছর ও এখানে এসেচে, এই বাড়িঘর সাজিয়ে তৈরি করে তোরই অপেক্ষায় বসেআছে। পুষ্প তোকে এনেচে বলেই তৃতীয় স্তরে আসতে পেরেচিস, নইলে হোত না। আর উনি এখনো দ্বিতীয় স্তরে পড়ে রইলেন। বিষয়-সম্পত্তিই ওঁর কাল হয়েচে। এসেচেন আজ ষোল বছর, বিষয়ের কথা ভুলতে পারলেন না, সেই ভাবনা সর্বদা। এত করে বোঝাই, এত ভাল কথা বলি, ওঁর চোখ সেই পৃথিবীর জমিজমার দিকে। কাজেই ওপরে উঠতে পারছেন না কিছুতেই—

যতীনের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর স্নেহের দৃষ্টিতে পুষ্পের দিকে চেয়ে বল্লেন, উন্নতি করেচে আমার পুষ্প মা। এ রকম কেউ পারে না। এত অল্প দিনে ও যেখানে আছে এখানে আসা যায় না। ওর পবিত্র একনিষ্ঠ ভালবাসা এখানে এনেছে ওকে। কত উঁচু জাতির লোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে, দেখিস এখন। তাঁরা যখন আসেন, আমি থাকতে পারিনে তাঁদের সামনে।

যতীন বল্লে—মা, তুমি কোন্ স্তরে আছ?

—আমি ওঁর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে থাকি। ওঁকে ছেড়ে আসি কেমন করে? ওঁকে এত করে বলি, কানে কথা যায় না। ঐ দেখলে না, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না, বিশেষত পুষ্পের সামনে উনি দাঁড়াতে পারেন না, ওর তেজ উনি সহ্য করতে পারেন না।

পুষ্প লজ্জায় রাঙা হয়ে বল্লে—কি যে বল মা!...তারপর সে ঘরের বাইরে চলে গেল। যতীনের মা বল্লেন—না মন্টু, সত্যি বলচি শোন। তুমি নতুন এসেচ, তোমার পক্ষে এখন বোঝা অসম্ভব যে পুষ্প কত উঁচুদরের আত্মা। ও যে-সব উচ্চস্তরে যায়, সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে এসে। তোমার জন্যে ও এখানে কষ্ট করে থাকে নইলে এর অনেক উঁচুতে ওর জায়গা। আর কী ভালবাসার প্রাণ ওর, সেই কবে ছেলেবেলায় সাগঞ্জ-কেওটাতে থাকতে তোকে ভাল লেগেছিল, জীবনে সেই ওর ধ্যান জ্ঞান। তোকে আর ভুলতে পারলে না। তুই বৌমার ব্যাপারে পৃথিবীতে কষ্ট পেতিস, পুষ্পর এখানে কি কান্না! ওর মত আত্মার পৃথিবীতে যেতে কষ্ট হয় কিন্তু তোমার জন্যে সদাসর্বদা ও সেখানে যেতো। ওকে দেখতে পাওয়া পুণ্যের কাজ।

সম্মুখের এই সুন্দর আকাশ ঐ কলস্বনা ভাগীরথী, অদ্ভুত রঙের বনানী, অপরিচিত বন লতার সর্বাঙ্গ ছেয়ে সে সব অপরিচিত বনপুষ্পরাজি এই শান্তি, এই রূপ—এও যেমন স্বপ্ন—পুষ্পের কথা পুষ্পের ভালবাসাও তেমনি স্বপ্ন। তার জীবনে সে শুধু নিজেকে ভুলিয়ে এসেচে সুখ পেয়েচে বলে, কিন্তু সত্যিই কোনো জিনিস

পায়নি কখনো—আজ মৃত্যুপারের দেশে এসে তার সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেচে একথা তার বিশ্বাস হয় না। কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা বাস্তব, তার কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ি, না এই স্বপ্নলোক?...আশালতা, না পুষ্প?...

যতীনের মা বল্লেন—তাঁরা ওকে বড় ভালবাসেন, মাঝে মাঝে অনেক ওপরে নিয়ে যান, তাঁদের রাজ্যে? আমি ওর মুখে সে সব গল্প শুনেচি, ইচ্ছে হয় এখুনি যাই,কিন্তু আমাদের অনেক বছর কেটে যাবে সে রাজ্যে পৌঁছুতে, তবুও পৌঁছুতে পারবো না।সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে যারা আসে তারা এত নিম্নস্তরের জীব যে, এই তুমি যে দেশে আছ, এ-ই তাদের কাছে উচ্চ স্বর্গ। অন্য সব উচ্চস্তরের কথা বাদই দাও।

একটা আশ্চর্য চাপা আলো আকাশের এক কোণ থেকে এসে পড়লো। সমস্ত স্থানটা অল্পক্ষণের জন্যে নীল আলোয় আলো হয়ে উঠলো—আবার তখনি সেটা মিলিয়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা, নীলোজ্জ্বল আলোর সার্চলাইট যেন দু-সেকেন্ডের জন্যে কে ঘুরিয়ে দিলে।

যতীন বল্লে—ও কিসের আলো মা?

—আমি কিছু বলতে পারবো না বাবা। এ সব দেশের ব্যাপার ভারি অদ্ভুত, চন্দ্র-সূর্য্যির দেশ এ নয়। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমি কি করে জানবো কিসে থেকে কি হয়। দেখি চোখে এই পর্যন্ত। কেন ঘটে, কিসের থেকে ঘটে, সেসব যদি জানবো তবে তো জ্ঞানী আত্মা হয়ে যাবো।পুষ্পও জানে না, পুষ্প মেয়েমানুষ, ও ভালবাসায় বড় হয়ে এখানে এসেচে, জ্ঞানে নয়। ও-সব কথার উত্তর সে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এখন আসি মন্টু। নতুন সবে কাল এসেচ, ক্রমে কত কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে, কত কি নিজেই জানতে পারবে। সময় ফুরিয়ে যাবে না, সময় এখানে অফুরন্ত, অনন্ত।

যতীনের মা চলে গেলেন।

৬

যতীন একদিন পুষ্পকে বল্লে—কত দিন হয়ে গেল এখানে এসেচি বলতে পারিস পুষ্প? এখানে দিনরাত্রির কোনো হিসেব পাইনে।

পুষ্প বল্লে—পৃথিবীর অভ্যেস দূর হতে এখনো তোমার অনেক দিন লাগবে যতুদা। এখানে দিনরাত্রির কোনো দরকার যখন নেই, তখন ঘড়ি দেখা অভ্যেসটা ছেড়ে দাও। সময়, যে অফুরন্ত, অনন্ত, যতদিন সেটা অনুভব না করবে, ততদিন মুক্তি হবে না। মনের দ্বিধা সংকীর্ণ ভাব দূর না হোলে মুক্তি সম্ভব নয়, যতুদা।

—কি ধরনের মুক্তি?

—কি জানি, আমি এ সব বড় বড় কথা জানিনে, তোমায় আবার আমি কি বোঝাবো যতুদা, তুমি কি আমার চেয়ে কম বোঝো?

—বাজে কথা বলে আমায় ভোলাতে চাস নে পুষ্প। আমি অনেক কিছু জানতে চাই, আমাকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দিবি? কত কি যে জানতে চাই তার ঠিক নেই।কে আমায় বলে দেবে বল্ তো!

—আছে, লোক আছে। তোমায় নিয়ে যাবো একদিন সেখানে। খুব উঁচু এক আত্মা আমায় বড় স্নেহ করেন। আমার স্তরে আসতে তার কষ্ট হয়। তাই আমিই যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তুমি যাবে একদিন? আমি গুরুদেব বলি তাকে। বৈষ্ণব সাধু।

—কিন্তু আমি সে সব উচ্চস্তরে কি করে যাবো পুষ্প? মোটে সেদিন পৃথিবী থেকে এসেচি—তোমার দয়ায় তাই এত উঁচু স্তরে আছি, এর চেয়েও উঁচুতে কি ভাবে যাবো?

—যাওয়া ঠিক কঠিন নয়, কিন্তু থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। যাতে যেতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করবো।

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি পুষ্প, আমার এখনো একটা সন্দেহ হয়, এ সব স্বপ্ন নয় তো?

—যাও, পাগলামি কোরো না যতুদা। তোমার একথার উত্তর অন্তত একশো বার দিয়েচি তুমি আসা পর্যন্ত? দেখবে আর একটা জিনিস, দেখবো? অবিশ্যি তোমায় সেখানে আজ যেতেই হবে।

—কি সেটা?

—আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন। তোমার ছেলে নিনু কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করচে। পিণ্ডদানের সময় তোমায় গিয়ে হাত পেতে পিণ্ড নিতে হবে।

ছেলের কথা শুনে যতীন অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। নিনু, আহা দুধের বালক, তাকে কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হচ্চে!...সে সে বড় করুণ দৃশ্য!

যতীন বল্লে—আমি যাবো না সেখানে।

পুষ্প হেসে বল্লে—ঐ যে বলছিলাম, তুমি এ জগতের ব্যাপার কিছুই জানো না। সে ছেলেমানুষ, যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে, সে এমনি আকর্ষণ তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার সাধ্য কি তুমি না গিয়ে থাকো? খুব ভালবেসে যে টানবে, তার টান এ জগতে এড়ানো যায় না। পৃথিবীর স্থূল দেহে স্থূল মন বাস করে—এখানে তা নয়। এখানে মন আপনা-আপনি বুঝতে পারবে কোন্‌টা সত্যিকার ভালবাসা, বুঝে সেখানে যাবে। আচ্ছা তুমি বসো, আমি একবার দেখে আসি। ওদিকে কি হচ্চে।

পৃথিবীর হিসাবে মিনিট-দুই সময়ও তারপর চলে যায়নি পুষ্প হঠাৎ কোথায় চলে গেল এবং ফিরে এসে বল্লে—ওখানে এখন সকাল সাতটা। শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েচে। নিনু কিন্তু এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। যতীনের আগ্রহ হোল জিজ্ঞেসকরে—আশা কি করচে। সে ভয়ানক ব্যাকুল হয়েচে আশার খবর জানবার জন্যে। কত দিন খবর পায়নি। আশা কেঁদেছিল, চোখের জল ফেলেছিল তার মৃত্যুসংবাদে?

জানবার জন্যে সে মরে যাচ্চে, কিন্তু লজ্জা করে পুষ্পকে এসব কথা বলতে। যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটের রানায় চুপ করে বসে রইল। সামনে কুলু-কুলু-বাহিনী গঙ্গা, নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল পাখি উড়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্চে। ঘাটের ওপরে বৃদ্ধবটের শাখার নিবিড় আশ্রয়ে একটা অজানা গায়ক-পাখিঅতি মধুর স্বরে ডাক্‌চে। যতীনের মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশা খুব কেঁদেছিল? আশাকে সে বড় নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এসেচে—স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখা, তারঅভাবে তারা কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করা। সে অকর্মণ্য স্বামী; নিজের কর্তব্য পালন করার শক্তি তার ছিল না। আশাকে সে সুখী করতে পারেনি একদিনও।

পুষ্প এসে বল্লে—বৌদিদির কথা ভেবে যে সারা হোলে, যতুদা!

তারপর সস্নেহে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। বৌদিদির কাছে নিয়ে যেতাম—কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে বেশি যোগাযোগ এখন তোমার পক্ষে ভাল নয়। তা ছাড়া তুমি তার কোনো উপকারও করতে পারবে না এ অবস্থায়।

—কোথায় নিয়ে যাবি পুষ্প?

—অনেক উঁচু এক স্বর্গে। নতুন এসেচো পৃথিবী থেকে, তোমরা বুঝতে পারবে না। মনে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। তোমার যাওয়া সম্ভব হবে শুধু আমি নিয়ে যাবো বলে। তুমি কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সকলরকম চিন্তা মন থেকে তাড়াও।

—তা আমি পারবো না পুষ্প। তোর বৌদি বড় অভাগিনী, তার কথা ভুলতে পারবো না।

—দয়া বা সহানুভূতি তোমায় নামাবে না, ওপরে ওঠাবে। তাই ভেবো যতুদা, কিন্তু সাবধান, বিষয়-সম্পত্তির কথা যেন ভেবো না—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হবে। এসোআমার সঙ্গে।

দুজনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চললো। ডাইনে বাঁয়ে অগণিত তারালোকে, মৃদু নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো জীবনপুলক ওদের মুক্ত দেহে এনেচে শিহরণ, প্রাণে মুক্তির আনন্দ—দূর...দূর...বহুদূর তারা চললো কত নতুন অজানা দেবলোক...

ক্রমে আর একটা নতুন লোকের ওরা সমীপবর্তী হতে লাগলো...দূর থেকে তার সৌন্দর্যে যতীনের সমস্ত জৈবিক চেতনা অবশ হয়ে এল—বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে দিয়ে তার মনে হোল বহু কদম্বদ্রুম যেন কোথায় মুকুলিত, লতানিকর বিকশিত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গিরিগ্রামে বহু বিহগকণ্ঠের কাকলী, প্রেম...স্নেহ...সুগভীর স্নেহের নিঃস্বার্থ আত্মবলি...আরও কত কি...কত কি সে সবের স্পষ্ট ধারণা ওর নেই... ওর চেতনা রইল না...পুষ্প বিব্রত হয়ে পড়লো—যতীন অতি উচ্চ স্তরে যে সচেতন থাক্‌বে না, পুষ্পের এ ভয় হয়েছিল, তবুও তার আশা ছিল চেষ্টা করলে নিয়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব... একবার সে দেখবে।

না, যতীন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে। যতীনের দেহটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ওর মন থাকবে নিদ্রিত। কিছুই দেখবে না, জানবে না, শুনবে না। নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

পুষ্প ডাকতে লাগলো—ও যতুদা...চেয়ে থাকো, কোথায় যাচ্চ ভেবে দেখো... আমি পুষ্প, ও যতুদা...চোখ চাও...

নিকটেই একটা বেগুনি রঙের শৈলশৃঙ্গ...বন্য লতাপাতার আড়ালে একটা শিলাখণ্ডে যতীনকে সে শোওয়ালে। সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের গতিবন্ধ হয়ে গিয়েচে...নিকটের ঝরণা থেকে জল এনে ওর মুখে দিয়ে পুষ্প আঁচল দিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগলো। পরে নিজের দেহের চৌম্বক শক্তি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ওর দেহে সঞ্চালিত করতে লাগলো।

এমন সময়ে পুষ্পের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হলো ওই উচ্চ শিখরটার প্রান্তদেশে। সেখানে পরম সুন্দর এক তরুণ দেবতা বহুদূরে মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন আনমনে। কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই, কি যেন ভাবচেন। তাঁর অঙ্গের নীলাভ জ্যোতি দেখে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পুষ্প বুঝলে এ অতি উচ্চ শ্রেণীর আত্মা, দেবতাগোত্রে চলে গিয়েচেন—মানুষের কোনো পর্যায়ে ইনি এখন আর পড়েন না।

পুষ্প জানতো এ জগতে যে যত পবিত্র, উচ্চ, সে দেখতে তত রূপবান, তত তরুণ। তারুণ্য এখানে নির্ভর করে না জন্মের তারিখের দূরত্ব বা নিকটত্বের ওপরে। এখানে দেহের নবীনতা ও সৌন্দর্য একমাত্র নির্ভর করে আধ্যাত্মিক প্রগতির ওপরে। এঁর রূপ ও নবীনতা পৃথিবীর হিসেবে ষোলো-সতর বছরের অতি রূপবান্ কিশোর বালকের মত—অত্যন্ত উচ্চ স্তরের দেবতা ভিন্ন এ রকম হয় না।

দেবতার ধ্যানভঙ্গ করতে পুষ্পের সাহস হোল না। সে এত উঁচু আত্মা কখনো দেখেনি। কি করবে ভাবচে, এমন সময় দেবতার অন্যমনস্ক চক্ষু অল্পক্ষণের জন্যে ওদের দিকে পড়লো।পরক্ষণেই তিনি অতীব জ্যোতিষ্মান দুটি চোখ দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—কে তোমরা?

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—সবই তো বুঝচেন, দেব।

এইবার যেন দেবতার অন্যমনস্ক একাগ্রতা কিছু ভগ্ন হোল—বর্তমান সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। বল্লেন—কি বলো তো? আমার যোগ নেই এ স্তরের সঙ্গে। বুঝতে পারবো না।

পুষ্প নিজেদের পরিচয় দিয়ে তার গন্তব্যস্থানের কথা ও যতীনের অবস্থা সব বললে।

আত্মা বল্লেন—ওকে যেখানে এনে ফেলেচ, এখানেও তো ওর চৈতন্য হবে না—ওর পক্ষে এও তো অতি উচ্চ স্থান; নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও ওকে।

পুষ্প বল্লে—আপনি কে বলুন দেবতা, আমার কত শুভদিন আজ, আপনাকে দেখলাম। এতকাল তো আছি এ জগতে, আপনার মত আত্মা কখনো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আপনি কে দেব?

আত্মা অতি মধুর প্রসন্ন হাসি হেসে বল্লেন—তুমি অত জানতে চাও কেন? তুমি ভারতবর্ষের কন্যা, ভক্তি তোমার জন্মগত। বিশ্বাস কর, এই মাত্র। তুমিও খুব উচ্চস্তরের আত্মা, নইলে আমায় দেখতে পেতে না। তোমার সঙ্গীকে যদি আমি জাগিয়েও দিই, ও আমায় দেখতে পাবে না। যাও ওকে নামিয়ে নিয়ে যাও।

তবু পুষ্প সাহসে নির্ভর করে বল্লে—আপনি কে দেব?...পাহাড়ের চুড়োতে বসে ছিলেন কেন? এ স্তর তো আপনার নয়।

কথাটা শেষ করেই পুষ্প বুঝলে আত্মা তখনই বড় হয়, যখন প্রেমে সে বড় হয়। সামান্য পৃথিবীর মেয়ের এই প্রগল্‌ভ কথায় আত্মা চটে তো গেলেনই না, কৌতুকমিশ্রিত গভীর স্নেহে তাঁর সুশ্রী বিশাল জ্যোতির্ময় চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এল। বল্লেন—দেখবে কি দেখছিলাম? এসো এখানে। তোমায় দেখাবো, তুমি তার উপযুক্ত হয়েচো।

পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আত্মা শৈলশৃঙ্গের প্রান্তসীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে বল্লেন—দেখচ?

পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সাম্‌নে এ এক অন্য পৃথিবী, বিশাল জলাভূমিতে বড় বড় অতিকায় জীবজন্তু কর্দমে ওলট-পালট খাচ্ছে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয়। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প—সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর...তারপর ছবির পর ছবি...কত দেশ, কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল...কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন...প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর...পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই..ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কী বীভৎস দৃশ্য!

আত্মা বল্লেন—বহু দূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব জন্মে। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়—আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দূর প্রান্তের মোহনায় বসে তাদের কথা মনে পড়েছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষ্মী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।

পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে বিনীত ভাবে বল্লে—আপনার দেখা আবার কবে পাবো?

—যখন স্মরণ করবে। একমনে স্মরণ করলেই আসবো—কিন্তু যখন তখন আমায় কষ্ট দিও না। আমার নানা কাজ, কোথায় কখন থাকি। কল্প-পর্বতে সঙ্গীত যেদিন বাজবে, চুম্বকের ঢেউ কম থাকবে, সেদিন আমায় ডেকো।

কল্প-পর্বতের সঙ্গীত কি, পুষ্প তা জানতো। চতুর্থ স্তরে একটি সুনির্জন পাহাড়ে বহু শতাব্দী ধরে এক নির্দিষ্ট সময়ে আপনা-আপনি অতি মধুর অপার্থিব সঙ্গীতধ্বনি ওঠে। কত কাল পূর্বে জনৈক পবিত্র আত্মা ঐ স্থানটিতে বসে নূতন সুর সৃষ্টি করতেন—কোনো বড় সুরশিল্পী হবেন। ওপরের স্বর্গে উঠে গিয়েছেন বহুকাল, কেউ তাঁকে এখন আর দেখে না—কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে এখনো তাঁর সৃষ্ট সুরপুঞ্জে স্বর্গমণ্ডলের অজ্ঞাত কোণটি ছেয়ে যায়।

দেবতা বিদায় নিলেন—বহুদূরব্যাপী নভোমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো তাঁর দেহজ্যোতিতে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও যেন খানিকক্ষণ আকাশটা আলো হয়ে রইল। পুষ্প অবাক্ হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। এত বড় দেবতা এতদিন এখানে থেকেও কখনো সে দেখেনি।

৭

যতীনের চেতনা ফিরে এল বাড়িতে ফিরবার পথেই।

পুষ্পকে বল্লে—এ কোথায় যাচ্চি আমরা, এখনো পৌঁছুইনি?

পুষ্প বল্লে—না, চলো বাড়ি ফিরে যাই। সেখানে এখন তোমার যাওয়া চলবে না। তুমি পথে এমন হয়ে পড়লে! চতুর্থ স্তর পার হতে না হতেই তোমার সংজ্ঞা চলে গেল। পঞ্চম স্তরে নিয়ে যাই কি করে? উঃ, একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখলে না।

তারপর পুষ্প সবিস্তারে উন্নত আত্মাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে। বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে ছিল তুমি দেখতে পাও, কিন্তু বুঝলুম তিনি এখন তোমায় দেখা দিতে ইচ্ছুক নন। তুমি দেখতে পাবেও না।

যতীনের মনে পড়লো তার মায়ের সঙ্গে যেদিন কথা বলছিল আকাশের দূর প্রান্তে অমনি একটা অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্লেখা দেখা গিয়েছিল, পুষ্প যেমন বর্ণনা করলে তেমনি। পুষ্পকে সে কথা বল্লে। পুষ্পকে বল্লে—আমি জানি, ও আলো সব সময়ই উচ্চ আত্মাদের, যাঁদের আমরা দেবতা বলি, তাঁদের গতিবিধির পথে দেখা যায়। উল্কার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁদের পথ, যখন তাঁরা যান। অত শুদ্ধ আত্মা কিন্তু আমাদের স্তরে কমই আসেন, খুব কমই দেখা যায়।

—দেখ পুষ্প, আমি তোমার এখানে এসে ভাবতুম কত উঁচু স্তরে এসেচি! আজ আমার সে অহঙ্কার ভেঙে গেল। অত সব উঁচু স্তর আছে, তা কি জানতাম!

পুষ্প হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বল্লে—এ কথা তো কখনো শুনিনি! তুমি ভাবতে আমাদের এই বুঝি বৈকুণ্ঠধাম? তবে তুমি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমার দোষ কি যারা এখানে অনেকদিন আছে তারাও জানে না। আমি শুনেছিলাম এক শুদ্ধ আত্মার কাছে, যাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন সপ্তম স্তর পর্যন্ত আছে, যেখানে পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে। তার ওপরেও অসংখ্য স্তর আছে, তবে সে সব অঞ্চলের খবর তিনিও জানেন না। সে সব পৃথিবীর মানুষের জন্য নয়।

—আর আমি চতুর্থ স্তর ছাড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম!

—তা যদি না হোত, আমি বৌদিকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতাম।

যতীন আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু কিছু অবিশ্বাসের সুরে বল্লে, আশাকে? কি করে?

—সে ঘুমিয়ে পড়লে তার সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ থেকে বার করে। এ রকম করা যায়, আমি করতেও জানি। কিন্তু বৌদিদির কোন জ্ঞান থাকবে না, যখন তাঁকে এখানে আনা হবে। তোমার মত অচৈতন্য হয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্তর পার না হতেই। এই এ জগতের নিয়ম। যে স্তরের যে উপযুক্ত নয়, সে স্তরে পৌঁছুলে তার চেতনা লোপ পায়। কার সঙ্গে কথা কইবে যতুদা?

—কোনো উপায় নেই পুষ্প? আমরা পৃথিবীতে গিয়ে দেখা দিতে পারি নে?

—প্রথমত, তা পারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর যদিও বা পারা যায়, তাতেও কোনো ফল হবে না। বৌদিদি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, মানুষ মরে কোথায় যায়, তাদের কি অবস্থা হয়, এসব সম্বন্ধে কিছু জানে না। মন কুসংস্কারে পূর্ণ। তোমায় দেখে সে এমনি ভয় পাবে যে তোমার যে জন্যে যাওয়া বা দেখা দেওয়া, তা হবে না।

যতীন কিছুতেই ছাড়ে না। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুষ্প অবশেষে ওকে আশার কাছে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে রাজী হলো।যতীন বল্লে, আজই চলো।

পুষ্প ঘাড় নেড়ে বল্লে—এখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে। ওর আলোর ঢেউ আমাদের দেহ ধারণ করে দেখা দেওয়ার পক্ষে বড় বাধা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে অনেক সহজ হবে। কটা দিন সবুর করো না!

তারপর একদিন ওরা কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে দুজনে পৃথিবীতে নেমে গেল। যতীন নতুন পৃথিবী থেকে গিয়েচে, সে স্পষ্টই সব দেখতে লাগলো, কিন্তু পুষ্প অনেক দিন উচ্চস্তরে কাটানোর ফলে ওর সব ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট কুয়াশার মত ঠেকচে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তার কষ্ট হতে লাগলো।

ওরা বেশি রাত্রে আসে নি, কারণ আশা তখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওদের দেখবে কি করে?

পুষ্প বল্লে—খুব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো। খুব জোর করে ভাবো যে আমি আশাকে দেখা দেবো, দেবো, দেবো। তুমি বেশিদিন পৃথিবী ছেড়ে যাওনি, তোমার দেহ স্থূলচোখে দেখা যাবে তা হোলে।

পৃথিবীর হিসেবে দুঘণ্টা প্রাণপণে চেষ্টা করেও যতীন নিজের দেহ কিছুতেই আশার চোখে দৃশ্যমান করতে পারলে না। আশা রান্নাঘরে যাচ্ছে আসচে, ছেলেদের খাইয়ে আঁচিয়ে দিলে, ঘরে গিয়ে বাবার জন্যে পান সাজলে, দোতলার ঘরে একা গিয়ে ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এল। যতীন সব সময় ওর পাশে পাশে সামনে, রোয়াকে, ঘরে, দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুতেই কিছু করতে পারলে না। কতবার ডাকলে—আশা, ও আশা, এই যে আমি, ও আশা—আশা? আমি এসেচি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আশা ওকে টেরও পেলে না। এমন কি মনেও অনুভব করলে না। পুষ্প বল্লে, আচ্ছা, এখন থাক। ওর মন এখন চঞ্চল অবস্থায় রয়েচে। যখন বিছানায় এসে শোবে, প্রথম তন্দ্রা আসবে, তখন মন হবে শান্ত, স্থির, একাগ্র। সেই সময়ে সামনে দাঁড়িও।

যতীন বল্লে—উঁহু, সে হবে না। ওর হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরে সারারাত জ্বালিয়ে ঘুমুনো অভ্যেস। সে আলোতে তো কোনো কাজই হবে না!

—আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমি চেষ্টা করবো এখন।

ততক্ষণ যতীন পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির বাইরে গেল। এই তার শ্বশুরবাড়িরদেশ। প্রথমে সে যখন এখানে আসে তখন এই মজুমদারের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে আরও পাড়ার পাঁচজন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে পাশা খেলে তাস খেলে কত দুপুর সন্ধ্যা কাটিয়েছে! ওই সেই যদু ভড়ের পুকুর, যেখানে মস্ত বড় রুইমাছ ধরেছিল ছিপে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। ওঃ, মাছটা ঘাটের ঐ পৈঠাটার ওপর পড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল জলে, ওরই বড় শালা, আশার ভাই ছেনি জাল দিয়ে মাছটা ধরে ফেলে। সে সব এক দিন গিয়েচে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

ওরা দুজনেই ফিরে চাইলে। যদু ভড়ের ছেলে শ্রীশ ভড় গাড়ু হাতে পুকুরের ঘাটে নামতে গিয়ে হাঁ করে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে—হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে।

পুষ্প বল্লে—তুমি পৃথিবীর ভাবনা খুব একমনে ভাবছিলে, তোমায় দেখতে পেয়েচে। পরক্ষণেই দেখা গেল শ্রীশ গাড়ু ঘাটে রেখে ওর দিকে এগিয়ে আসচে, সে যে পুষ্পকে দেখতে পাচ্চে না—সেটা বেশ বোঝাই গেল। তার বিস্মিত দৃষ্টি শুধু যতীনের দিকে নিবদ্ধ। পরক্ষণেই কিন্তু সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। যতীন তো অবাক! ভয়ে চিৎকার করে কেন? সে বাঘ না ভালুক!

শ্রীশ ভড়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণ তাদের বাড়ির মধ্যে থেকে, পাশের নিমাই ভড়ের বাড়ি থেকে, ওর জ্যাঠামশাই নন্দ ভড়ের বাড়ি থেকে অনেক লোক ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এল। সকলের সমবেত ভদ্র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—উঃ কি কাণ্ড ! এমন তো কখনো দেখিনি।

সবাই বল্লে—কি, কি, কি দেখলি রে?

—ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল সাদামত দিব্যি একজন মানুষ। যেমন ডেকেচি, অমনি মিলিয়ে গেল। বাপ্...না রে বাপু, সপষ্ট নিজের চোখে দেখলাম, তোমরা বলচো চোখের ভুল! আমি কি গাঁজা খাই যে চোখের ভুল?

সবাই গোলমাল করতে লাগলো, দু-একজন সাহসী লোক এগিয়ে দেখতে এল লেবুগাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা, যতীনের আশেপাশে যাতায়াত করচে অথচ সে আর পুষ্প সেইখানেই দাঁড়িয়ে।

যতীন কৌতুকের হাসি হেসে বল্লে—লোকগুলো কানা নাকি? খুঁজচে যাকে, সে তো এখানেই দাঁড়িয়ে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বল্লে—যাক্, ভালই হয়েচে তোমায় চিনতে পারেনি। চিনতে পারলে বলতো, মুখুয্যেদের বাড়ির জামাই ভূত হয়ে লোকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌদিদি শুনলে কষ্ট পেতো। লোকে বলতো গতি হয়নি। কেমন, শখ মিটলো তো? নিরীহ লোককে আর ভয় দেখিয়ে দরকার কি, চলো পালাই।

৮

বুড়োশিবতলার ঘাটে অশ্বত্থতলায়, যতীন অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল।

পুষ্প মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আজও বেরিয়েচে। তার নানা কাজ, কোথায় কখন ঘোরে। পুষ্পকে যতীন খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। পুষ্পের ভালবাসায় সেবাযত্নে তার বহুদিনের বুভুক্ষু প্রাণ তৃপ্ত হয়েচে বটে কিন্তু সঙ্গিনী হিসাবে যতীনের মনে হয় পুষ্প অনেক উঁচু। সে পুষ্পকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি কিছু কিছু ভয়ও করে। তার সঙ্গে কিন্তু মন খুলে কথা বলা যায় না, বলতে চাইলেও মুখে অনেকটা আটকে যায়। এমন সুখ, শান্তি, আনন্দের মধ্যেও যতীন নিজেকে খানিকটা একা মনে না করে পারে না।

আশা, আজ যদি আশা...

এই সব সুন্দর দিনে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে আশার কথাই মনে হয়। আরও মনে হয় সে বড় হতভাগিনী, তার এত ভালবাসা আশা বোঝেনি; আশা যদি বুঝতো, তার মূল্য দিত, হতভাগিনী নিজেই কত তৃপ্তি পেতো।

তার ইচ্ছা হয় যখন তখন আশার কাছে যায়। কিন্তু পুষ্প তাকে যেতে দেয় না। এর কারণ যতীন জানতো না। আশার জীবনের অনেক ব্যাপার পুষ্প যা জানে যতীন তা জানে না। পাছে সে সব দেখলে যতীনের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়, সেজন্যে পুষ্প প্রাণপণে সে সব জিনিস ওর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। যার কোনো প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই, তা ওকে জানতে দিয়ে কোনো লাভ নেই।

যতীন জানতো আশা খেয়ালের বশে অভিমান করে বাপের বাড়ি গিয়ে উঠেছিল এবং অভিমানের দরুনই তার সঙ্গে দেখা করেনি। তার নিষ্ঠুরতা, সেও অভিমানপ্রসূত। আশার চরিত্রের আসল দিক পুষ্প কত কৌশলে ঢেকে রেখেচে যতীনের কাছে তা একমাত্র জানতেন যতীনের মা। পাছে ওর চোখেও সে সব ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে নিজে সঙ্গে না নিয়ে যতীনকে একা আশার কাছে যেতে দিত না। যতীনের একা যাবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও একা পৃথিবীতে যেতে সে তেমন সাহস পায় না—একদিন যাবার চেষ্টা করে খানিকটা গিয়েছিলও, হঠাৎ মধ্যপথে কে যেন ওকে চৌকো কাঠের বাক্সের আকারের ঘর তৈরি করে তার মধ্যে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগলো। ও এগিয়ে যায়, একটা ঘর ফুঁড়ে বার হয়, আবার সামনে ঐ রকম কিউব দিয়ে সাজানো ঘর আর একটি তৈরি হয়—সেটা অতি কষ্টে পার হয়, তো আর একটা। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত স্থূল অথচ অত্যন্ত নমনীয় বস্তুপুঞ্জের ওপর ওর নিজের চিন্তাশক্তি কার্য করে আপনা-আপনিই এই রকম কিউব-সাজানো দেওয়ালের বেড়াজাল সৃষ্টি হচ্ছিল—চিন্তার সংযম বা পবিত্রতা অভ্যাস না করলে এই সব নিম্নস্তরে যে ও রকম হয় তা যতীনের জানা ছিল না—যতীন যত ভয় পায়, ততই তার মনের বল কমে যায়—ততই সেনিজের সৃষ্টি কিউবরাশির মধ্যে নিজেই বন্দী হয়। জনৈক উচ্চস্তরের পথিক-আত্মা তাকে সে বিপদ থেকে সেদিন উদ্ধার করেন। সেই থেকে একা পৃথিবীতে আসতে ওর ভরসা হয় না।

আজও বসে ভাবতে ভাবতে আশার জন্যে সহানুভূতি ও দুঃখে ওর মন পূর্ণহয়ে গেল। কিন্তু কি করবার আছে তার, অশরীরী অবস্থায় আশার কোনো উপায়ই সে করতে পারে না—অন্তত করবার উপায় তার জানা নেই।

হঠাৎ তার প্রবল আগ্রহ হোল আর একবার সে আশার কাছে যাবার চেষ্টা করবে। এলোমেলো চিন্তা মন থেকে সে দূর করবে—ভেবে ভেবে চণ্ডীর একটা শ্লোক তার মনে পড়লো...

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।।

এই শ্লোকটা একমনে আবৃত্তি করতে করতে সে ইচ্ছা করলে যে পৃথিবীতে যাবে—আশাদের বাড়িতে—আশার কাছে। পরক্ষণেই সে অনুভব করলে সে মহাশূন্যে মহাবেগে কোথায় নীত হচ্চে, গতির বেগে তার শরীরে শিহরণ এনে দিলে, মন মাঝে মাঝে অন্যদিকে যায়, আবার ফিরিয়ে এনে জোর করে চণ্ডীর শ্লোকের প্রতি নিবদ্ধ করে।

এই তো তার শ্বশুরবাড়ির পুকুর। ঐ তো সামনেই বাড়ি। বড় মজার ব্যাপার। এটা এখনো যতীন বুঝতে পারে না, কি করে সে চিন্তা করা-মাত্রেই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। এরোপ্লেন যারা চালায়, তাদের তো দিকভুল হয়, কত বিপাকে বেঘোরে কষ্ট পায়—কিন্তু কি নিয়ম আছে এ জগতে যে, জনৈক অজ্ঞ আত্মা শুধু মাত্র চিন্তা দ্বারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছয়।

রাত্রি...আশা দোতলার ঘরে ঘুমুচ্চে, ও গিয়ে তার শিয়রে বসলো। খানিকটা পরে দেখলে আশার দেহের মধ্যে দিয়ে ঠিক আশার মত আর একটি মূর্তি বার হচ্চে। যতীন শুনেছিল গভীর নিদ্রার সময় মানুষের সূক্ষ্মদেহ তার স্থূলদেহ থেকে সাময়িক ভাবে বার হয়ে ভুবর্লোকে বিচরণ করে। কিন্তু আশার এই সূক্ষ্মদেহ দেখে যতীন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে গেল। কি জ্যোতি-হীন, শ্রীহীন অপ্রীতিকর মেটে সিঁদুরের মত লাল রঙের দেহটা! চোখ অর্ধনিমীলিত, ভাবলেশহীন, বুদ্ধিলেশহীন...একটু পরে সে দেহের চক্ষুদুটির দৃষ্টি যতীনের দিকে স্থাপিত হলো—কিন্তু সে দৃষ্টিতে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে যতীন বুঝতে পারে যে আশা ওকে চিনেচে বা ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও সচেতন হয়েচে। যেন মুমূর্ষু লোকের চোখের চাউনি—যা কিছু বোঝে কিছু বোঝে না, চেয়ে থাকে অথচ দেখে না। যতীন ভুবর্লোকের অল্পদিন-সঞ্জাত সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলে, আশার সূক্ষ্মদেহ অত্যন্ত অপরিণত এবং আদৌ উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত নয়। সে জিজ্ঞেস করলে—আশা, কেমন আছ? আমায় চিনতে পারো?

আশার চোখে-মুখে এতটুকু চৈতন্য জাগলো না, সে যেন ঘুমুচ্চে। যতীন চতুর্থ স্তরে যেমন অবস্থায় পড়েছিল, আশার ভুবর্লোকে অতি নিম্নস্তরেই সেই অবস্থা। এখনও যদি পৃথিবীর স্থূল দেহটা হারায়, এ লোকে এসে মহাকষ্ট পাবে, কারণ যে দেহটা নিয়ে এ লোকের সঙ্গে কারবার সে দেহটাই ওর তৈরি হয়নি। সদ্যপ্রসূত অন্ধ বিড়াল ইঁদুর ধরবে কেমন করে?

অর্থাৎ আশা অতি নিম্নশ্রেণীর আত্মা। যতীন আরও কয়েকবার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশাকে সচেতন করবার বৃথা চেষ্টা করে ব্যথিত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।

সেদিনই বুড়োশিবতলার ঘাটে গঙ্গার ধারে এক ব্যাপার ঘটলো।

৯

পুষ্প ও যতীন দুজনে নিজেদের বাড়ির সামনে বাগানে বসে গল্প করচে। যতীন পুষ্পকে পৃথিবীতে যাওয়ার কথা কিছুই বলেনি। তবুও পুষ্প সব ব্যাপার জানে। পাছে মনে কষ্ট পায় এই জন্যে যতীনকে সে বলেনি যে সে জানে। হঠাৎ আকাশের এক কোণে নীল উজ্জ্বল আলো দেখা গেল—গঙ্গার এপার ওপার, ওদের বাড়ি, ঘর, বাগান, বুড়োশিবতলার ঘাট, এমন কি ওপারের শ্যামাসুন্দরীর ঘাট পর্যন্ত সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।পুষ্প শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দ্যাখো, দ্যাখো, কোনো দেবতা হচ্চেন—চেয়ে দ্যাখো—

পরক্ষণেই যতীনের মনে হোল একটা বিরাট প্রজ্বলন্ত উল্কা তাদের বাড়ির অদূরে উন্মুক্ত বনজ লিলির ঝোপের ধারে এত প্রখর আলো বিকাশ করে এসে পড়লো যে, দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তীব্রতায়।

ওরা আশ্চর্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখলে যে এক মহাজ্যোতির্ময়দেহধারী পুরুষ ঝোপের ধারে বসে পড়েচেন। অমন মহিমময় শ্রী যে পৃথিবীর মানুষের হয় না—তা দুবার দেখে বুঝতে হয় না।

দুজনেই বিস্ময়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দূরে থেকে চেয়ে দেখচে, এমন সময় দেবতার নিকট থেকে পুষ্পের নিকট পর্যন্ত একটা ম্যাজেন্টা রঙের আলোর চওড়া শিখা সাপের মত কুটিল বক্র আকৃতি ধরে একবার খেলে গেল। একটা বড় দশ ব্যাটারির টর্চের আলো কে যেন একবার টিপে তখনি বন্ধ করলে।

পুষ্প বুঝলে এটা কি। অতি উচ্চশ্রেণীর দেবতাদের বিদ্যুতের ভাষা!

পঞ্চম স্তরের সেই আত্মার কাছে পুষ্প একথা শুনেছিল।

তিনি বলেছিলেন, ঊর্ধ্বতন লোকে—নবম বা দশম স্তরের ওপরেও যে সব উচ্চ স্তর সেখানে দেববিবর্তনের জীবেরা বাস করেন। মানুষের সর্বপ্রকার ধারণার অতীত তাঁদের ক্রিয়াকলাপ—তাঁদের সে বিরাট জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকই বা কি, সাধারণ প্রেতলোকের আত্মারাই বা কি, কোনো খবর জানে না। মুখের ভাষায় তাঁরা কথা বলেন না—তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগুনের বা বিদ্যুতের ভাষায়চলে তাঁদের কথাবার্তা।

পুষ্প হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। পুনরায় মহাব্যস্ত ও ক্ষিপ্র আর একটা তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা ওকে এসে স্পর্শ করতেই ওর মনের মধ্যের চিন্তায় এই প্রশ্ন জাগলো—আমি কোথায়...?

দেবতাকে দেখা যায় না। তাঁর স্থানে শুধু একটা আলোর মণ্ডলী পরিদৃশ্যমান। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

আবার বিদ্যুতের শিখা। পুষ্পের মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো—পৃথিবী কি?

পুষ্প বল্লে—পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

পুষ্পের এ কথাগুলা কি ভাবে দেবতা বুঝলেন, পুষ্প জানে না। বোধ হয় এ উত্তরগুলো চিন্তারূপে দেবতার নিজের মনে জাগছিল। পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করলে দুজনের কথাবার্তা খানিকটা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়ায়। পুনরায় প্রশ্ন হোল—

—বিশ্বের কোন্ অংশে?

পুষ্প বিপদে পড়ে একমনে সেদিনকার সেই দেবতাকে স্মরণ করলে। এ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার সাধ্যের অতীত।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! সেদিনকার সেই শৈলশিখরারূঢ় দেবতা তখনই তার সম্মুখে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেব, আমি সামান্য মানবী। উনি যে প্রশ্ন করছেন, আমি তার কি উত্তর দেবো? আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তারপর সে দ্বিতীয় দেবতাটির পানে কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিনি সেদিন বলেছিলেন বটে ‘স্মরণ করলেই আমি আসবো’ পুষ্প একথা বিশ্বাস করেনি। সে মহা অপরাধী দেবতার কাছে ছি ছি, কি অবিশ্বাসী তার আত্মা!

কিন্তু এ চিন্তা চাপা পড়ে গেল আর এক আশ্চর্য ব্যাপারে। দুই দেবতার মধ্যেতীব্র বিদ্যুৎশিখার ক্ষিপ্র আদানপ্রদান চলচে—পৃথিবীর কোনো ঘটনার উপমা দ্বারাই তার স্বরূপ বোঝানো যাবে না। দুখানা বড় যুদ্ধজাহাজ যেন পরস্পর পরস্পরের ওপর তীব্র অক্সি-হাইড্রোজেন আলোর সার্চলাইট বিক্ষেপ করচে! দুই বিরাট দেবতার কথাবার্তা চলছিল। পরে এই কথাবার্তা পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করে পুষ্পের দেবতা-বন্ধু তাকেযা বলেছিলেন, তা এইরূপ—

পুষ্পের দেবতাবন্ধু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি কে দেব?

আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমি কোথায় আগে বলুন।

—পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

—পৃথিবী কি?

—ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য নামে একটা নক্ষত্রের চারিধারে ঘোরে।

—বিশ্বের কোন্ অংশে?

—এ প্রশ্নের কি জবাব দেবো? ছায়াপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ যে নক্ষত্রজগৎ, তারইএক অংশে। আপনি কোন্ অংশের অধিবাসী?

এর উত্তরে আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমার কথা শুনে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি বহু, বহু দূরের অন্য নক্ষত্রজগতের অধিবাসী। আমি বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভ্রমণে এবং নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলাম। আমার চৈতন্য যতদিন হয়েচে আমার মনে এক অদম্য পিপাসা ছিল বিশ্বের প্রত্যন্ততম সীমা আবিষ্কার করবো। কি কি নতুন দেশ এতে আছে দেখবো। এতকাল ধরে বেগমান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শুধু শূন্যে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি নক্ষত্রের, গ্রহের, নানা জগতের ও বিভিন্ন লোকের গোলকধাঁধার অরণ্যে দিশাহারা হয়ে এখানে শক্তিহীন, অবসন্ন ও বিমূঢ় অবস্থায় এসে পড়েচি। নক্ষত্র ও বস্তুজগৎ এখানে এত বেশি কেন? এ দুটি প্রাণী কোথাকার লোক?

—এই দুই জীব পৃথিবীর তৃতীয় স্তরের অধিবাসী। পুরুষটি সম্প্রতি বস্তুতর থেকে আত্মিক স্তরে এসেচে। ওরা নিতান্ত নিরীহ, অজ্ঞ। মেয়েটি কিছু উন্নত—তাও জ্ঞানে নয়, প্রেমে।

যতীন এতক্ষণ শ্রদ্ধায় ভয়ে ও গভীর বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এই কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও বুঝছিল না—তার মনে অত উচ্চ দেবাত্মাদের চিন্তা প্রতিফলিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুষ্প ওর দিকে চেয়ে কথা বলতে সে বুঝলে যে তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হচ্চে। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে চুপ করে রইল। এত বড় জ্যোতির্ময় আত্মা সে আর কখনো দেখেনি। দেবতা বল্লেন—উঃ কোথায় এসে পড়েচি। বিশ্বের কোন্ অংশে যে আছি তা কিছুই বুঝতে পারচি নে। তুমি কোন্ একটা গ্রহের নাম করলে? যে নক্ষত্রটার চারিধারে ঘোরে সেটা আমি নতুন দেখলাম। নক্ষত্রটা খুব বড় নক্ষত্রের দলে পড়ে না। এবং ওর আলোও পরিবর্তনশীল, আমি বার কয়েক ওর আলো-কে বাড়তে-কমতে দেখেচি। ওর নাম কি বল্লে—সূর্য!

পুষ্প তার নিজের চিন্তার কিছু অংশ এবার যতীনের মনে চালনা করলে। সে বেচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝচে না কোন্ ভীষণ মহাপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প পোড়ারমুখী কথা বলচে। জানুক ও বুঝুক কিছু।

পুষ্পের মনের মধ্যে দিয়ে ওদের কথাবার্তা যতীন বুঝতে পারলে এবং বুঝে অবাক হয়ে গেল। পুষ্প ভাবছিল—এ আবার কত উচ্চস্তরের, কি ধরনের লোক রে বাবা, যে সূর্যের নামটাই শোনেনি কখনো, পৃথিবী তো দূরের কথা!

কথাটা মনে হয়ে তার বড় হাসি পেল। ছিঃ—হাসি সামলে নিয়ে সে বল্লে— আপনার কথা শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে। আপনি আমাদের বাড়িতে বসে একটু বিশ্রাম করুন। আর দয়া করে বলবেন কি, কি দেখলেন এতকাল ধরে?

আগন্তুক ওদের বাড়ির বাইরে পাথরের বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

যতীন সম্ভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে হঠাৎ বিনীতভাবে বলে বসলো, একটুচা খাবেন কি সার?

পুষ্প মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে হাসি দমন করে বল্লে—কি যে তুমি করো যতুদা! পৃথিবীর অভ্যেস্ তোমার এখনও গেল না। চা খাবে কে? আর 'সার' বলচো কাকে?

যতীন অপ্রতিভ হয়ে অধিকতর বিনীত ভাব ধারণ করলে।

এই দুই নবদৃষ্ট আত্মার কাণ্ড দেখে আগন্তুক দেবতার মন কৌতুকে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোথাকার জীব এরা, অথচ দ্যাখো কি সুন্দর হাসে! মহামহেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি শুধু বিরাটতার দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যেও এর কি রহস্যময় মূর্তি। এরা কেন হাসচে, কি নিয়ে কথা বলচে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা কথাও তিনি বোঝেননি, তাই এখন পুষ্পকে প্রশ্ন করলেন—গ্রহের জড়লোক আর আত্মিকলোক কি বলচো, বুঝতে পারলাম না তো? কি সেটা?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি, তখন আমাদের দেহ অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। সে দেহ স্থূল, সেখানকার সব জিনিসই সেই ধরনের স্থূল পদার্থে গড়া। তারপর একটা সময় আসে, যখন সেই স্থূল দেহটা নষ্ট হয়ে যায়—তখন আমরা এই আত্মিক লোকে আসি। কেন, প্রভু, আপনি কি এ জানেন না?

দেবতাবল্লেন—শুনেচি বটে এমন হয় কোনো কোনো গ্রহের জীবের ক্ষেত্রে, আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমায় সেখানে একবার নিয়ে যাবে—তোমাদের এই পৃথিবী গ্রহের জড়লোকে?

—কিন্তু সেখানে আপনি যেতে পারবেন দেব অত স্থূল রাজ্যে?

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি পথিক। কত বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে দিয়ে চলা অভ্যেস্ করতে হয়েচে আমাকে, তবে বিশ্বভ্রমণ করা সম্ভব হয়েচে। নইলে তোমাদের এই যে যাকে বলচো আত্মিকলোক, এখানেই কি আমি আসতে পারতাম? জড়বস্তুর নিবিড় প্রকাশ আত্মার ক্ষেত্রে আমি দেখেচি অন্য অনেক গ্রহে। চল, যাই।

একটু পরে ওরা তিনজনে পৃথিবীর দিকে চললো। পৃথিবীর নিকটে এসে দেবতা বল্লেন—উঃ, মেঘের মত কি সব বিশ্রী চিন্তার ধোঁয়া চারিদিকে! তোমরা দেখতে পাচ্ছ না?

যতীন তো কিছুই দেখতে পায় না—পুষ্প জানে, পৃথিবীর মানুষের পাপের ও দুঃখের নানারকম চিন্তার মেঘ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জমা হয়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যাতায়াতের সময় তাকে কষ্ট দিয়েচে। তবুও সে পৃথিবীরই জীব, তার ততটা কষ্ট হয় না, যতটা ইনি পাবেন।

যেখানে ওরা গিয়ে নামলো সেটা ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলের একটা ছোট গ্রাম। মহিষদল মাঠে চরাচ্চে রাখালরা। তিনজন মেয়েমানুষ একটা ভুট্টাক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করচে। পৃথিবীতে ভাদ্রমাস। শরতের বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ, বন্যার জলএসে নেমে গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ির উঠানে পচা কাদা। একটা বাড়িতে মকাই-এর মরাই-এর মধ্যে জল ঢুকে মকাই-এর দানা পচিয়ে ফেলেচে বলে বাড়ির মেয়েরা মকাইগুলো নামিয়ে ঝাড়চে।

দেবতা বল্লেন—কি আশ্চর্য! এদের গতি এতটুকু জায়গায় সীমাবদ্ধ! এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না?

কাটিহার থেকে মুঙ্গেরগামী একখানা ট্রেন এসে পড়লো। দেবতা বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—ও ব্যাপারটা কি?

—মানুষে ওই গাড়িটা তৈরি করেচে। ওকে বলে রেলগাড়ি। খুব জোরে মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, প্রভু।

দেবতা কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—ওই কি দ্রুত যাওয়ার নমুনা? নমুনা দেখে তো খুব আশা হয় না এদের দ্রুতগামিতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে। ওর নাম কি জোরে যাওয়া?

এক জায়গায় দুটি ছোট ছেলেমেয়ে ভুট্টাক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি করে খেতে গিয়ে ক্ষেত্রস্বামীর হাতে পড়ে খুব মার খাচ্চে দেখে দেবতা বল্লেন—আহা, কচি ছেলেমেয়ে দুটিকে অমন করে মারচে কেন? পরে তিনি ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা বিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। স্থূল দেহের স্থূল মনে প্রথমেই কোনো কার্যকরী

হোল না—কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী দেবতার মনের জোরে তাকে সৎ চিন্তার প্রেরণা স্পর্শ করলে। সে ছেলেমেয়ে দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে—আচ্ছা, যা, নিয়েচিস্ যা তা এবারকার মত নিয়ে যা—আর কখনো আসিসনে।

দেবতা বল্লেন—আহা, এদের তো বড় কষ্ট! কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি! যত দেখচি ততই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্চি। আমার কি ইচ্ছে হচ্চে জানো—এদের মধ্যে মানুষ হয়ে থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।

পুষ্প বল্লে—দেব, নিকটের এই পাহাড়ের চূড়াটাতে বসে আপনার ভ্রমণের গল্প একটু করবেন দয়া করে? শুনবার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

ভাদ্র মাসের গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। বিকেল হয়েচে। পশ্চিম দিগন্তে জামালপুরের পাহাড়ের পিছনে রঙিন্ মেঘস্তূপের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্চে।

পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট জঙ্গল। একটা ফাঁকা জায়গায় বন্য হরীতকী গাছের তলায় ওরা বসলো। নীচে গঙ্গার ধারে একটা পাট-বোঝাই ভড়ের মাঝিমাল্লারা রান্নাবান্নার উদ্যোগ করছিল। যতীন ভাবছিল—এই তো বৃহত্তর জীবন, মৃত্যুর পরে যাসে লাভ করেচে। কোথায় বাংলাদেশের এক ছোট্ট গ্রামে সে ছিল বন্দী, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল তার জীবন—পৃথিবীর অতীত কত লোকে কত স্তরে এমনি কত নিস্তব্ধ শরৎ দুপুরে, অপরাহ্ণে, কত বসন্তদিনের আসন্ন বেলায়, কত জ্যোৎস্নারাত্রিতে তার ইচ্ছামত অভিযান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে জমা রয়েছে! এমন সব সুখের দিনে শুধু মনে হয়সেই হতভাগী—

দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।

সে ভারি চমৎকার কথা। তাঁর সব কথা পুষ্প বা যতীন বুঝতে পারছিল না। তবুও তারা মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের ভঙ্গিতে, কথার সুরে। কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েচেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানসগতিতে ভ্রমণ করচেন। আলো বা বিদ্যুতের সেখানে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে সব সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েও লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েচেন। তখনো দেখেচেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। আবার সে বিশ্বেও পৌঁছেচেন, আবার অগণিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকারাজির মধ্যে দিয়ে দেবতার অমিত গতিতে বহু শত বৎসর ধরে ছুটে গিয়ে যেমন তার সীমা ছাড়িয়েচেন, আবার দূরে দেখতে পেয়েচেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী। কত প্রজ্বলন্ত নক্ষত্র, কত স্বয়ম্প্রভ বাষ্পমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত হয়ে রয়েচে শূন্যের দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে...অবশেষে এই বর্তমান বিশ্বটায় পৌঁছে গ্রহনক্ষত্রের গোলকধাঁধার মধ্যে কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।...

পুষ্প বল্লে—আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

দেবতা বল্লেন—তা অসম্ভব। এই গ্রহের বিভিন্ন আত্মিক স্তর ছেড়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। এর আকর্ষণে টেনে রাখবে। সে দেহ তোমাদের তৈরি হয়নি। তবে আর কিছুকাল অপেক্ষা কর। কাছাকাছি বহু অদ্ভুত জগৎ আছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবো; আমায় স্মরণ কোরো না—তাতে আমি আসবো না। যখন তোমরা তার উপযুক্ত হয়েচ বুঝবো—আমি নিজেই আসবো। এখন আমি যাই। আর একটা বিষয়ে সাবধান থেকো, তোমরা দেখতে পাচ্চ না, আমি পাচ্চি, তোমাদের এই গ্রহটার চারিদিক ঘিরে একটা বিরাট শক্তিশালী চৌম্বক ঢেউ বইচে, সেটা সব সময় তোমাদের ঐ পৃথিবীর দিকে টানচে! এই ঢেউ-এ পড়লে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ঐ পৃথিবীর জড়লোকে তোমাদের ফেলে পুনরায় জড়দেহ ধারণ করাতে বাধ্য করবে। এটাকে পুনর্জন্মের ঢেউ বলা যেতে পারে। খুব সাবধান। বিশ্বের সীমা আবিষ্কার করবার যার আগ্রহ, সে যেন ক্ষুদ্র গ্রহের স্থূলস্তরে আবার স্থূল জড়দেহ ধারণ না করে।

পুষ্প ও যতীন দুজনে প্রণাম করলে। পুষ্প বল্লে—আবার যেন আপনার দেখা পাই, দেব।

পরমুহূর্তে দেবতা অন্তর্হিত হলেন।

পুষ্প বল্লে—দেখলে তো?শুনলে?ওই সেই চুম্বকের ঢেউ। আমাদের এক দেবতা বলেছিলেন অনেক দিন আগে। তোমাকে একবার পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে বিপদে পড়েছিলুম, তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে—মনে আছে? সেইবার তাঁর সঙ্গে দেখা।

১০

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময় যতীন দেখে অবাক হয়ে গেল যে দিব্যি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। একেবারে পৃথিবীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। তার শুভ্র আলোর ঢেউ পড়লো গঙ্গাবক্ষে, পড়লো গিয়ে ওপারের শ্যামাসুন্দরী মন্দিরের সর্বাঙ্গে, তীরের প্রাচীন বটের মাথায় ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

যতীন ভাবলে—এ আবার কি? জ্যোৎস্না তো কখনো এখানে দেখিনি! এখানে রাত্রিই বা কি, দিনই বা কি!

এমন সময়ে পুষ্প হাসতে হাসতে পাশে বসে বল্লে—কেমন জ্যোৎস্না হয়েচে দেখ; মনে পড়ে তুমি আর আমি কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটে এমনি জ্যোৎস্নারাতে কত বসে ইলিশমাছ ধরা দেখতাম?

—কিন্তু জ্যোৎস্না উঠলো কোথা থেকে? চাঁদ এল কি করে?

—তৈরি করলুম জ্যোৎস্নাটা। ভাবলুম তোমার সঙ্গে একদিন জ্যোৎস্নারাতে ঘাটে বসা যাক। কেমন, বেশ হয়নি?

—আচ্ছা পুষ্প, যে কোনো ঋতু, যে কোনো সময়কে তৈরি করতে পারো? এ তো অদ্ভুত!

—সময় এখানে মনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, যেমন অন্য সব জিনিস করা যায়। সে তো তুমি চোখের ওপর দুবেলা দেখচো। আচ্ছা যতুদা, সাগঞ্জ-কেওটার কথা মনে পড়ে?

—খুব পড়ে পুষ্প। সেই একবার আমি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম মনে আছে? তোর কি কান্না! সত্যি আমি এক একবার ভাবি জীবনে কি পুণ্য না জানি করেছিলুম যে তোর মত মেয়ের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েচি। আমার এখনও মনে হয় এ সব স্বপ্নই বা।

পুষ্প লজ্জিত সুরে বল্লে—আহা!

পুষ্প বুঝতে পারে যে, যতীন আশার কথা ভাবচে, ঘাটে এসে বসেই তার কথা ওর মনে হয়েচে। যত উচ্চ স্তরের আত্মাই হোক, পুষ্প মেয়েমানুষ, তার মনটা হু হু করে ওঠে। যতুদাকে সে আবাল্য ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু যতুদা তার চেয়ে যে আশা-বৌদিকে বেশি ভালবাসে, একথা সে জেনেও মনে স্থান দেয় না বেশিক্ষণ। উপায় কি? এই তার অদৃষ্টলিপি, নইলে সে ছেলেবেলায় পৃথিবী ছেড়ে, যতুদাকে ছেড়ে আসবে কেন? যতীনের গত তেরো বছরের জীবনে পুষ্প ছিল না, ছিল আশা—এ অবস্থায় আশার সঙ্গেই যতীনের মনের যোগ অনেক গাঢ়বদ্ধ। কারো কোনো দোষ নেই।

পুষ্পের মনে দুঃখের ছায়া এসে পড়তেই বাইরের জ্যোৎস্না ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। মন প্রফুল্ল না থাকলে মানসিক সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হবেই।

হঠাৎ পুষ্প যতীনের দিকে চেয়ে বলে—একটা কথা ভুলে গিয়েছিলুম, যতুদা।আজ কল্প-পর্বতের গান বাজবার দিন। চল তোমাকে শুনিয়ে আনি। সে এক অদ্ভুত জিনিস।

ওদের স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওরা শূন্য বেয়ে চললো। বহুদূরে একটা সবুজ নক্ষত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে পুষ্প বল্লে—ওইখানে আমাদের যেতে হবে। ওই দিকে একদৃষ্টেচোখ রেখে ভাবো যে আমরা ওখানে যাবো।

নক্ষত্রটা যেন ক্রমে বড় হচ্ছে, যতীনের মনে হোল সে সবেগে ওর দিকে নীত হচ্চে। কি অদ্ভুত এ যাত্রা। যতীন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গ্রহ ডুবে ডুবে ঘুরচে।

পুষ্প বল্লে—এই হচ্চে শুক্রগ্রহ—সন্ধ্যাবেলা সেটাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়।

আকাশের রং এখানে নীল নয়, অনেকটা ধূসরমিশ্রিত বেগুনী। শূন্যপথে অনেক আত্মা তাদের মতই যাওয়া আসা করচে, তবে তাদের মধ্যে কেউই উচ্চশ্রেণীর নয়, ওদের রং দেখে শ্রেণী ঠিক করতে শিখে গিয়েচে যতীন। এ সব আত্মার রং খানিকটা খানিকটা মেটে সিঁদুরের মত লাল। খুব সাধারণ শ্রেণীর আত্মা। তবে নিম্ন শ্রেণীর আত্মা এখানে আসে না। তাদের দ্বিতীয় স্তরের নিম্ন পর্যায় ছাড়িয়ে ওঠবার সাধ্যই নেই।

হঠাৎ যতীন বল্লে—সে পাহাড় তো চতুর্থ স্তরে, সেখানে পৌঁছে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বো না পুষ্প?

পুষ্প হেসে বল্লে—তাহলে তোমায় কি আনতুম যতুদা? সেবার তুমি যেখানে অজ্ঞান হয়েছিলে, সেটা চতুর্থ স্তরের ঊর্ধ্বলোক। চতুর্থ স্তরে ঠিকই ছিলে। চতুর্থ স্তরে সেই নীল হ্রদ দেখেছিলে, যেখানে দেব-দেবীরা স্নান করছিলেন।

যতীন বল্লে—কই, কোথায় দেবদেবীরা স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি? তখন থেকেই আমার জ্ঞান চলে যাচ্ছিল তাহলে।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই যতীন দেখলে তারা একটা অভ্যন্ত সুন্দর দেশে এসে পৌঁছেচে।

দেশটার চারিদিকেই চক্রবাল রেখার কূলে কূলে নীলপাহাড়। গাছপালা সেখানে আদৌ তৃতীয় স্তরের মত নয়—কোনোটার রং নীল, কোনোটার বেগুনী, কোনোটার সোনালী; ফুলফল যেন রঙিন আলো দিয়ে গড়া। পাহাড়ের মাথায় মাথায় যেন জ্বলন্ত রঙিন্ আলোর মেলা। পুষ্প একটা গাছের ফুল তুলে ওকে দেখালে, তুলবামাত্র বোঁটায় আর একটা ফুল কোথা থেকে এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করলে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, প্রান্তরের ও শৈলসানুর সব ফুল মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হচ্চে, যেন চারিদিকে রাশি রাশি লক্ষ লক্ষ নানা বিচিত্র বর্ণের জোনাকি নিবচে জ্বলচে। পাখিগুলো যখন আকাশে উড়চে, তাদের ডানায় যেন সাতরঙা রামধনুর খেলা। এদেশে বাতাসে একটা অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দের বার্তা—একটা বিচিত্র জীবন-উল্লাসের ইঙ্গিত।

যতীন একটা জিনিস লক্ষ্য করলে, এখানকার দৃশ্য যে রকম, পৃথিবীতে এ দৃশ্যকল্পনাও করা যায় না। এর কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই।

পুষ্পকে সে কথাটা বল্লে।

—পৃথিবীর সঙ্গে খুবই কম মিল এ দেশের, না, পুষ্প?

পুষ্প বল্লে—যতুদা, এর একটা সহজ কারণ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের আত্মারা পৃথিবী থেকে সদ্য এসেচে। পৃথিবীর স্মৃতি তখনো তাদের কাছে ম্লান হয়নি। যখন তারা মানসলোক সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সেই স্মৃতি তাদের অনেকখানিই সাহায্য করে। কাজেই তাদের তৈরি স্বর্গ হয় পৃথিবীরই অবিকল নকল। কিন্তু এই সব স্তরের আত্মাদের মনে পৃথিবীর স্মৃতিঅত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেচে—অনেকের নেই বল্লেই হয়। কাজেই তারা যখন গড়ে— নিজেদের কল্পলোক নিজেদের কল্পনা থেকে গড়ে। তাই সব হয় নতুন, সবই হয় আজগুবি। এ সবই যা দেখচো এ স্তরের অধিবাসীদের সৃষ্টি—ওই পাহাড়পর্বত গাছপালা, ফুল, পাখি, সাধারণ দৃশ্য—সব।

—কিন্তু তোমার মানুষজন কই? একজনেরও তো সাক্ষাৎ নেই।

—তাঁরা ইচ্ছে না করলে এ স্তরের আত্মাকে তুমি সহজে দেখতে পাবে না যতুদা। কল্পপর্বতের কাছে যাকে আমরা চুম্বকশক্তির ঢেউ বলি—তা অত্যন্ত প্রবল। সেখানে গেলে তোমার দেহ শক্তিমান হবে, তখন খুব উচ্চ স্তরের আত্মাকেও অল্পক্ষণের জন্যে—মানে মাত্র যতক্ষণ সেই পর্বতের কাছে থাকবে ততক্ষণের জন্যে—দেখতে পাবে।

অল্প পরেই একটা অনুচ্চ পর্বত সামনে দেখা গেল, তার ওপরটা অনেকখানি সমতল। সেই সমতল জমিটুকুর ওপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল যতীনের, তাতে সে বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সেখানে বহু দেবদেবী একত্র হয়েচেন। তাঁদের অঙ্গের জ্যোতি ও রূপে সমস্ত ভূমিশ্রী আলোকিত হয়ে উঠেচে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল (যদি এখানে বায়ুমণ্ডল বলে কোনো কিছু থাকে) তাঁদের দেহনিঃসৃত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নির্ঝর হয়ে উঠেচে যেন, দেহগন্ধের সুরভিতে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত।

যতীন এ পর্যন্ত এত উচ্চ জীবের একত্র সমাবেশ কখনো দেখেনি। সে চুপি চুপি বল্লে—এ যে ওঁদের দস্তুরমত ভিড় লেগে গিয়েচে দেখচি, পুষ্প! উঃ—

সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করচে। সকলের চোখ বাঁ দিকের একটা খুব উঁচু পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ। যতীন বল্লে—ও পুষ্প, এ যেন ফোর্টের র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে এসেচে সব—আহা, টিকিট কিনতে পায়নি বেচারীরা!

পুষ্প তিরস্কারের সুরে বল্লে—নাঃ, তুমি জ্বালালে যতুদা—চুপ করে থাকো না কেন ছাই।

যতীন কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

বাঁ ধারের সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে এক অপূর্ব, মধুর শব্দের ঢেউ উত্থিত হোল। দেবদেবীরা সকলে অবনতমস্তকে শুনতে লাগলেন। কেউ কেউ পাহাড়ের ঢালুর রঙিন স্বয়ম্প্রভ তৃণদলে শুয়ে পড়লেন অলসভাবে। কেউ বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন।বেশির ভাগই কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

সে মধুর শব্দ কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতের মত শব্দটা। কিন্তু পরিচিত কোনো যন্ত্রে বাদিত সঙ্গীত নয়। অত্যন্ত রহস্যময় তার উৎপত্তিস্থল। যেন গঙ্গার ধারা—কোন্ উচ্চ পর্বতের তুষারপ্রবাহে তার জন্ম, কেউ খবর রাখে না। যতীনের সর্বাঙ্গ বার বার শিউরে উঠতে লাগলো।

শুনতে শুনতে যতীনের মনে হোল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েচে, সে মুক্ত, সে বিরাট—তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যেপে সচেতন হতে চায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাপী তাপী, মূর্খ ও নিন্দুকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেচে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেচে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। একি আনন্দ! একি শিল্পমাধুর্য!একি অভিনব অননুভূতপূর্ব অমরতা!

কোনো দিকে কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই...সবাই বসে পড়েচে...নিস্তব্ধ চারিদিক...মধুর অশরীরী রহস্যময় মোহিনী সঙ্গীতলহরী কখনো উচ্চে, কখনো মৃদুস্বরে একটানা বয়ে চলেচে...বিরাম নেই...বিরতি নেই, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তার বর্ণনা নেই...কতক্ষণ সময় কেটে গেল তার লেখাজোখা নেই—অনন্তকাল ধরে অমন সঙ্গীতপ্রবাহিণী গোমুখী-নির্গত ভাগীরথীধারার মত বয়ে চলেচে...চলেচে। যতীনের মনের কোন্ গুপ্ত কক্ষের গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে গেল। সে দেখতে পেল তার পৃথিবীতে যাপিত আরও অনেক পূর্ব জীবন...এই অনন্ত জীবনপ্রবাহে সে যুগ-যুগান্তর ধরে ভাবের ও প্রেমের স্রোতে বয়ে আসচে...আশা কি এক জন্মের আশা, না পুষ্প এক জন্মের পুষ্প? কত যুগ ধরে ওরা যে ওর নিত্যসঙ্গিনী, ওর জীবনে ছন্দে গাঁথা ওদের জীবন—কতবার কত বিরহ-মিলন হাসি-অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে কতবার দেখাশোনা, কতবার ছাড়াছাড়ি—কত বিস্মৃত মরুদ্বীপে, কত শ্যামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কত ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরের কুটিরে, কত পাহাড়ের নীচেকার আদিম কালের গুহায়...কত রাজার রাজপ্রাসাদে...কত দশার্ণ গ্রামে ব্যাধরূপে, কত শারদ্বীপে ক্রৌঞ্চমিথুন রূপে, কত কুরুক্ষেত্রে বেদগায়ক ব্রাহ্মণরূপে...

যতীন দেখলে পুষ্প কাঁদচে...ও নীরবে পুষ্পের হাতে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে সস্নেহে নিয়ে এল...

তারপর কখন সে অপূর্ব সঙ্গীত থেমে গিয়েচে, বিচিত্ররূপী জ্যোতির্ময় জীবেরা মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচেন...কখন জ্যোৎস্নার আলোতে সারা দেশ ভরে গিয়েচে যতীনের খেয়াল নেই...জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না... বহু পূর্ণিমার সম্মিলিত জ্যোৎস্নালোক চারিদিকে...

যতীন বল্লে—পুষ্প, চল ওঠো।

১১

ওরা কিছু দূরে মাত্র এসেচে—এক জায়গায় দেখলে মাটির বুকে যেন চাঁদ খসে পড়েচে।

দুজনে কাছে গিয়ে দেখলে, পরমরূপসী এক দেবী ঘাসের ওপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। ওরা অবাক হয়ে গেল। এত উচ্চস্তরের দেবীর দুঃখ কিসের?

যতীন জিজ্ঞেস্ করলে—মা, আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি?

দেবী ওদের দিকে চাইলেন। যতীনের মনে হলো দেবী কি সাধে হয়? এত রূপ এত জ্যোতি এত মহিমা—অথচ কি মমতা, করুণা, দীনতায় ভরা দৃষ্টি!

বল্লেন—পারবে?

দুজনেই বলে উঠলো—হুকুম করুন, আপনার আশীর্বাদে পারবো।

দেবী বল্লেন—কল্পপর্বত থেকে ফিরচো? তোমরা কোথায় থাকো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা এর নীচের স্বর্গে থাকি, তৃতীয় স্তরে।

—কি মধুর সঙ্গীত! শুনলে?

যতীন বল্লে—শুনলাম, মা। আমি বেশিদিন পৃথিবী ছেড়ে আসিনি। এই ব্যাপারটা কি আমায় একটু বলবেন দয়া করে?

দেবী বল্লেন—বলবো এর পরে। এখন বলি শোনো। আমি থাকি অন্য নক্ষত্রলোকে। পৃথিবীর এক জায়গায় মানুষের ভয়ানক কষ্ট। আমি সে দেশে জন্মেছিলুম হাজার হাজার বছর আগে। তাদের দুঃখে, আর আজ কল্পপর্বতের সঙ্গীত শুনে, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে। চলো যাই পৃথিবীতে, দেখি কি করা যায়— কিন্তু মুশকিল হয়েচে এই যে আমি এতকাল আগে পৃথিবী থেকে চলে এসেচি, জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক এতকাল হারিয়েচি যে, সরাসরি ভাবে কোনো কাজই সে জগতে করতে পারি নে। মধ্যবর্তী স্তরের আত্মার সাহায্য ভিন্ন আমি পৃথিবীতে গিয়ে কি করবো? তোমরা যদি যাও—

ওরা বলে উঠলো, নিশ্চয়ই যাবো মা!

দেবী বল্লেন—একটু অপেক্ষা করো। আমার এক সঙ্গী আছেন—তিনি আমার লোকেই থাকেন, উচ্চ স্তরের জীব, পৃথিবীতে গিয়ে শুধু আঁকুপাঁকু করেন, কিছু করতে পারেন না কাজে। পৃথিবীর জড়স্তরে আমরা সংস্পর্শ স্থাপন করতে পারি নে। তিনি প্রাচীন যুগের একজন বড় কবি ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাই চলো। এসো আমার সঙ্গে।

আবার নীল শূন্যে যাত্রা।...বহু দূরে একটা ক্ষীণ নক্ষত্র জ্বলছিল। দেবী সেই নক্ষত্র লক্ষ্য করে চললেন। পরক্ষণেই এক সুন্দর উপবন। এক ক্ষুদ্র নদী বয়ে যাচ্ছে উপবনের মধ্য দিয়ে—লতাপাতা কিন্তু পৃথিবীর মত শ্যামল—পৃথিবীরই যেন এক শান্ত প্রাচীনকালীন তপোবন। মৃগকুল নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্চে, লতায় লতায়

বিচিত্র বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত। এক সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় আত্মা লতাবিতানে বসে কি যেন লিখচেন। দেবীওদের নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড় করালেন। মুখ তুলে চাইতেই যতীন ও পুষ্প এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

দেবী বল্লেন—কল্পপর্বতের পথে এদের সঙ্গে দেখা। পৃথিবীতে নিয়ে যাবো তাই সঙ্গে করে আনলাম।

যতীন ও পুষ্পের দিকে চেয়ে দেবী বল্লেন—রামায়ণ-রচয়িতা কবি বাল্মীকি তোমাদের সামনে।

ওরা দুজনেই চম্‌কে উঠলো। মহাকবি বাল্মীকি!

দেবতা স্মিতহাস্যে ওদের বসতে বল্লেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—এই আমার আশ্রম। ওই পাশেই তমসা নদী। ওই আমার গৃহ। পৃথিবীতে যা আমার প্রিয় ছিল এখানে তাই সৃষ্টি করেচি, ওই আমার স্বর্গ। আর তোমাদের সামনে ইনি আমার মানসদুহিতা—সীতা, যিনি তোমাদের সঙ্গে করে এনেচেন।

পুষ্প, যতীন বিস্মিত, স্তব্ধ। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়ে তারা। সীতার নামে ওদের সর্ব শরীরে বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে গেল। কত যুগ ধরে ভারতের আকাশ বাতাস যে পুণ্য নামে মুখরিত, সেখানকার বনের পাখিও যে নামে গান গায়, সেই ভগবতী দেবী জানকী তাদের সম্মুখে! এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

বাল্মীকি বল্লেন—তোমরা বিস্মিত হয়েচ। বোধ হয় এ লোকে বেশি দিন আসনি। সীতাকে আমি সৃষ্টি করেচি। যা ছিলেন পৃথিবীতে আমার কল্পনার মধ্যে—এ লোকে তা মূর্তিমতী হয়েচেন।

যতীন বল্লে—বুঝতে পারলাম না, দেব।

—এ লোকে চিন্তার দ্বারা জীবের সৃষ্টি করা যায়। শুধু যে বাড়িঘর করা যায় তাই নয়, স্থানের ও সময়েরও সৃষ্টি করা যায়।—আমার আশ্রমের সময় কি দেখচো?

—আজ্ঞে, সন্ধ্যা গোধূলি।

—আমার সময় সন্ধ্যা গোধূলি। আমি ভালবাসি গোধূলি। আমার কল্পনা এই সময় জাগ্রত হয়। তাই আমার আশ্রমে সবসময় গোধূলি।

—আচ্ছা দেব, শ্রীরামচন্দ্র তবে কোথায়?

—সীতাকে যত আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, রামচন্দ্রকে তত সহানুভূতি নিয়ে গড়িনি। তাই আমার স্বর্গে আমার প্রিয়তম সৃষ্টি সীতাই আছেন, রামচন্দ্র নেই। লক্ষ্মণ নেই, ভরত নেই, —কেউ নেই।

—তবে কি, দেব, সীতা বা রামচন্দ্র সত্যি সত্যি কেউ ছিলেন না?

—হয়তো ছিলেন। আমি তাঁদের জানি না। আমার কাব্যের রাম, আমার কাব্যের সীতা—আমারই সৃষ্ট জীব। ও প্রায়ই আমার এখানে আসে। নানা কাজে সারাজগৎ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমায় ভোলে না।

করুণা দেবী বল্লেন—বাবা, ওসব এখন রাখো। পৃথিবীতে যাবে?

বাল্মীকি বল্লেন—তুই তো জানিস, পৃথিবীতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারিনে।বহুকাল আগে ভবভূতিকে প্রভাবান্বিত করে একখানা কাব্য লিখিয়েছিলাম—চমৎকার কাব্য হয়েছিল। আর বাংলাদেশের মধুসূদনকে দিয়ে আর একখানা কাব্য লেখাতে গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশি প্রভাবান্বিত করতে পারিনি—গিয়ে দেখি কয়েকটি ভিন্নদেশীয় কবি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। তাঁদের প্রভাবই তার ওপর বেশি কাজের হোল। আমি গিয়ে ফিরে এলাম। তুই একাই যা মা—এদের নিয়ে যা—এই ছেলেমেয়ে দুটিকে। এরা নতুন পৃথিবী থেকে এসেচে—এদের দিয়ে কাজ ভাল হবে।

পুষ্প বল্লে—চলুন দয়া করে, যেখানে আমাদের নিয়ে যান যাবো।

ওরা কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছলো। পৃথিবীতে তখন সকাল দশটা, কিন্তু দেশটা খুব শীতের দেশ। রৌদ্রের মুখ দেখা যায় না। কুয়াশায় চারিদিক ঘেরা। প্রথমে একটা গ্রামে ওরা গিয়ে পৌঁছলো—সেখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েচে। প্রত্যেক বাড়িতে অনাহার-জীর্ণ বাপ মা ছেলে মেয়ে—পথের ধারে অনাহারে মৃত মানুষের দেহ। পাশাপাশি অধিকাংশ গ্রামেরই সেই অবস্থা। নিকটবর্তী একটা গ্রামে মোটরভ্যান এসেচে মৃতদেহ কুড়িয়ে ফেলবার জন্যে। পুলিশের লোক জেলের কয়েদীদের দিয়ে মৃতদেহ বহন করাচ্চে। তারা রাস্তার ধার থেকে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মোটরভ্যান বোঝাই করচে! গাড়িটা ময়লা ফেলা গাড়ির মত বোঝাই হয়ে গিয়েচে মৃতদেহের স্তূপে। তার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু সকলের মৃতদেহই আছে। পচা মড়ার গন্ধে চারিদিক নিশ্চয়ই পূর্ণ, কারণ যে সব জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের কাজ করচে, তাদের নাকে মুখে কাপড় বাঁধা। বীভৎস দৃশ্য।

রোগজীর্ণ ও অনাহারশীর্ণ লোক দলে দলে শহরের দিকে চলেচে—সকলের ভাগ্যে শহরে পৌঁছনো ঘটবে না, পথেই অর্ধেক লোক মরবে। তারপর আছে পুলিশের মোটরভ্যান ও জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের দল। যারা শহরে পৌঁছুচ্চে, তারা অনেকে সেখানে দুর্বল শরীরে দুরন্ত শীতের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পেভমেন্টের ওপর ল্যাম্প-পোস্টের তলায় মরে পড়ে থাকবে। বেচারীরা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় আশ্রয় নিচ্চে ওপরের আলোটা থেকে এতটুকু উত্তাপ পাবার মিথ্যা আশায়। তারপর তাদেরও জন্যে রয়েচে পুলিশের মোটরভ্যান ও সেই জেলকয়েদী শ্মশানবন্ধুর দল।

পথের ধারে বসে এক জায়গায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট আট বছর বয়সের বড় ভাই পাঁচ বছর বয়েসের শীর্ণকায় কঙ্কালসার ছোটভাইকে একটা ভাঙা তোবড়ানো, রাস্তার ধারে কুড়োনো টিনের মধ্যে করে মুসুরির ডাল সিদ্ধ মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। এই সব অসহায় ছেলেমেয়ের কষ্ট সকলের চেয়ে বেশি—দেবীর চোখে জল এল এদের কষ্টে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বাপ-মা তাদের শহরে ছেড়ে দিয়ে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়েচে—এই আশায় যে, শহরে থাকলে তবু তাঁদের পাঁচজনে দয়া করবে, একেবারে না খেয়ে মরবে না, কোনো কোনোছেলেমেয়ের বাপ-মা অনাহারের ও রোগের কষ্টে পথের ধারেই ইহলীলা সংবরণ করে লাসবোঝাই মোটরভ্যানে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে—

আরও কয়েকটি আত্মা এদের মধ্যে কাজ করচে দেখা গেল।

দেবীকে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এলেন। এঁর দেহ অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুনীল জ্যোতিমণ্ডিত—দেখেই বোঝা যায় খুব উচ্চ শ্রেণীর আত্মা।

এঁদের কাজ দেখে মনে হোল দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যাতে আত্মিকলোকে এসে দিশাহারা হয়ে কষ্ট না পায়—সেই দেখতেই এঁরা সমবেত হয়েচেন।

দেবী সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন। মেয়েটি বল্লে—আমার এই দেশ। বহু দিন আগে ভল্‌গা নদীর ধারে একটি গ্রামে এক কৃষকপরিবারে আমি জন্ম নিয়েছিলাম—জার আইভ্যানের রাজত্বকালে। রাশিয়ার কৃষকেরা চিরদিনই দুঃখী—সোভিয়েট গবর্নমেন্টের আমলে এদের ক্ষেত্রের ফসলের ভাগ দিতে হয় কারখানার শ্রমিকদের ও শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক শ্রেণীর জন্যে। এদের জন্যে যা থাকে, তাতে এদের কুলোয় না। তাই এই ঘোর দুর্ভিক্ষ। এদের ছেড়ে আমি যেতে পারিনে—তাই এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি। আর একজন লোকের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই আসুন।

একজন অতি সুন্দর সুশ্রী যুবক কিছু দূরে একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক-বালিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন।

মেয়েটি বল্লেন—ইনি ডাক্তার আমেন্ডো। রাশিয়ার কৃষকদের জন্যে ইনি সারা জীবন খেটেচেন পৃথিবীতে থাকতে। গবর্নমেন্টের কুদৃষ্টিতে পড়ে লন্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে। সোভিয়েট গবর্নমেন্টের সময়েও ফিরে এসে অনেক দুর্দশা ভোগ করেচেন। স্ট্যালিনের সুনজরে বড় একটা ছিলেন না। এঁর জীবনের

একমাত্র কাম্য হচ্চে গরিব ও দুঃখী লোকের দুঃখ দূর করা। সোভিয়েট গবর্নমেন্টের অনেক জিনিস ইনি সুদৃষ্টিতে দেখতেন না, তারাও এঁকে সুনজরে দেখতো না। আজ মাত্র পাঁচবছর হোল আত্মিক লোকে এসেচেন, তাও সেই গরিবদেরই কাজে প্রাণ দিয়ে। আমাশা রোগে আক্রান্ত পল্লীতে ডাক্তারি করতে গিয়ে নিজে সংক্রামক আমাশা রোগেই প্রাণ হারান। এত বড় নিঃস্বার্থ দয়ালু আত্মা এ যুগে খুব কমই জন্মেচে। মরণের পরে এ লোকে এসেও সেই রাশিয়ার গরিব লোকদের নিয়েই থাকেন। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে রোগ-শোক সেখানেই ছুটে আসচেন। চতুর্থ স্তরের আত্মা, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান না কোথাও।

ডাক্তার আমেন্ডো এদের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। বল্লেন—আপনারা ভারতবর্ষের লোক ছিলেন না? দেখলেই বোঝা যায়। এরা ভগবানকে দেখিয়ে দিচ্চে দেশ থেকে, যেন ইটপাথরের তৈরি গির্জা ভাঙলেই ভগবানকে তাড়ানো যায়! রাশিয়াতে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মুক্তাত্মা যদি দয়া করে আসেন, তবে কিছু কাজ করা যায়।

মেয়েটি বল্লেন—সে দু-একজনের কাজ নয়, ডাক্তার। অনেক আত্মার সমবেত চেষ্টার ফলে যদি চিন্তার চৌম্বক ঢেউ-এর সৃষ্টি করা যায়—খুব শক্তিশালী ঢেউ, তবে হয়তো কিছু হতে পারে। তোমার আমার দ্বারা তা হবে না।

ডাক্তার আমেন্ডো বল্লেন—আর একটা ব্যাপার। পৃথিবীতে এসে এখন দেখচি আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের আত্মার সাহায্য না নিয়ে কিছু করতে পারিনে। জন কতক দ্বিতীয় স্তরের লোক আমরা যোগাড় করে এনেচি কিন্তু ওরা মন দিয়ে কাজ করছে না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের দুজনকে নিন্ দয়া করে আপনার দলে। আমাদের দিয়ে যা সাহায্য হয় পাবেন। একটা কথা, আমাদের ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষে আর বন্যায় বড় কষ্ট পায় লোকে। সেখানকার জন্যেও আপনারা সাহায্য করবেন—তারা বড় দুঃখী।

ডাঃ আমেন্ডো বল্লেন—সে আপনি ভাববেন না। যেখানেই লোকে দুঃখ পাচ্চে, সেখানেই আমরা থাকবো। দেশ, জাতি, ধর্মের গণ্ডি নেই আমাদের কাছে। সারা পৃথিবী আমাদের দেশ। তবে কি জানেন, এই রাশিয়া আমাদের জন্মভূমি। এখানকার লোকের দুঃখ আমাদের প্রাণকে বড় স্পর্শ করে। ভারতবর্ষেও যখন যেতে বলবেন, তখনই আমরা যাবো। আমাদের দলে অনেক লোক আছেন—সবাইকে নিয়ে যাবো।

যতীন বল্লে—আরও উচ্চ স্তরের কোনো লোক আসেন না কেন? পঞ্চম বা ষষ্ঠ কি তারও ওপরের স্তরের কাউকে তো দেখতে পাইনে।

ডাঃ আমেন্ডো বল্লেন—তাঁরা কাজ করেন আমাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরা এলেও আপনি তাঁদের চোখে দেখতে পাবেন না। পৃথিবীতে এলে তাঁরা আমাদের চেয়েও অসহায় হয়ে পড়েন। পৃথিবীর স্থূললোকের স্থূল মনের ওপর তাদের প্রভাব আদৌ কার্যকর হয় না। তাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা দেন আমাদের—আমরা কাজ করি।

মেয়েটি বল্লেন—এর মধ্যে আরও কথা আছে। বড় বড় দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি কষ্ট পায়—এ সবের মূলে অতি উচ্চ দেবতা—যাঁরা গ্রহদের প্ল্যানেটরি স্পিরিট—তাঁদের হাত রয়েচে। তাঁদের উদ্দেশ্য বা কর্মপ্রণালী আমরা বুঝিনে। কিন্তু ঐ সব উচ্চ স্তরের বড় বড় লোকে তা বুঝতে পারেন। এর হয়তো কোথাও বড় একটা উদ্দেশ্য রয়েচে। আমাদের দৃষ্টি তত দূর পৌঁছোয় না—তাঁরা সেটা দেখতে পান, কাজেই গ্রহদেবদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যান না। আপনি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন ঘোরাফেরা করুন, অনেক কিছু দেখতে বা জানতে পারবেন। এ লোকের কাণ্ডকারখানা এত বিরাট ও জটিল যে নতুন পৃথিবী থেকে এসে মানুষে হতভম্ব হয়ে পড়ে—কিছুই ধারণা করতে পারে না।

যতীন বল্লে—কিন্তু জানবার আগ্রহ আমার অত্যন্ত বেশি, দেবী। আমি জানতে চাই কি করে এই বিরাট আত্মিকমণ্ডলী কাজকর্ম চালাচ্চেন—এঁরা কি করেন, এঁদেরই বা কে চালাচ্চে, গ্রহদেব যাঁদের বলচেন, তাঁরাই বা কে, কোথায় থাকেন, কত উচ্চ স্তরের আত্মা, তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না কেন—কোথা থেকে তাঁরা এলেন—এ সব না জানলে আমার মনে শান্তি নেই।

মেয়েটি বল্লেন—জানবার ইচ্ছে থাকলেই ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারবেন। এই আগ্রহই আসল। বেশির ভাগ মানুষ পৃথিবী থেকে এখানে এসে কিছুই জানে না, বোঝেনা, বোঝবার চেষ্টাও করে না। জানবেন, জ্ঞান ভিন্ন উন্নতি নেই। এ লোকে আরওশক্ত নিয়ম। সেবা বলুন, ধর্ম বলুন, প্রেম বলুন—ততদিন ঊর্ধ্বলোকে আপনার ঠাঁই হবে না, যতদিন জ্ঞানের আলো আপনার মনের অন্ধতা দূর না করচে।

ডাক্তার আমেন্ডো বল্লেন—পৃথিবীতে কি জানেন, নানা মুনির নানা মতে সেখানে সত্যের সমাধিলাভ ঘটেচে। এখনো পৃথিবীর মন আপনার যায়নি। এ জীবনের বিরাট প্রসারতা এখনো আপনি দেখতে পাননি। আপনি অজর, অমর, আপনার জীবন শাশ্বত অফুরন্ত। আপনার জন্মগত অধিকার এই জীবনের অমৃতপানে। আপনি তৃতীয় স্তরের মানুষ, আপনি কি ছোট? আপনিও মুক্তাত্মা, আপনার সঙ্গে এই মহীয়সী মহিলা তো সাক্ষাৎ দেবী। এই সব পৃথিবীর হতভাগ্যদের ভরসার স্থল আপনারা। এরা যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে সে প্রার্থনা যাঁর কাছে পৌঁছোয়, তিনি আপনাদের মত পবিত্র মুক্তাত্মাদের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এদের সাহায্য করেন। তিনি শক্তি বিকীর্ণ করচেন, আপনারা যন্ত্ররূপে সেই শক্তিকে ধরচেন, ধরে কাজে লাগাচ্চেন। বেতারের ঢেউ-এর আপনারা রিসিভার। যন্ত্র যত উঁচুদরের, যত নিখুঁৎ—তাঁর বাণীর প্রকাশ সেখানে তত সুস্পষ্ট, সুন্দর।

যতীন অদ্ভুত প্রেরণা পেলে, ডাক্তার আমেন্ডোর মত এত বড় আত্মার প্রশংসাতে। কিছু লজ্জিতও হোল। এতখানি প্রশংসার উপযুক্ত সে নয় তা সে জানে। তবে হবার চেষ্টা আজ থেকে তাকে করতেই হবে।

কিছু পরে পুষ্প ও যতীনের পায়ের তলায় বিশাল ভল্‌গা একটা সরু রৌপ্যসূত্রের মত হয়ে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিনের মত ওরা বিদায় নিলে।

পুষ্পদের বুড়োশিবতলার বাড়িতে আজকাল দেবী প্রায়ই আসেন। এঁকে আমরা করুণাদেবী বলে পরিচয় দেবো। করুণাদেবী অতি উচ্চ স্তরের নীলজ্যোতিবিশিষ্ট আত্মা কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি তিনি থাকতে ভালবাসেন, কারণ পৃথিবীর আর্ত জীবকুল ছেড়ে ঊর্ধ্বে স্বর্গে গিয়ে তিনি শান্তি পান না। এঁর চরিত্রের মাধুর্যে ও সুন্দর ব্যবহারের কথা শুনে পুষ্প ও যতীন এঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

যখনই তিনি আসতেন, একরাশ ফুল ও ফল নিয়ে আসতেন ওপরের স্বর্গ থেকে। সে ফুল যেন স্পন্দনশীল আলোর তৈরি—খাওয়া যায়, খুব সুস্বাদু এবং ভারি চমৎকার ভুরভুরে সুগন্ধ তার। সে ফল খেলে মনে শক্তি ও পবিত্রতা আসে, এই তার গুণ। কিন্তু এই নিম্নতর তৃতীয় স্বর্গে সে ফল বেশি সময় থাকতো না—কিছুক্ষণ পরেই ঠিক কর্পূরের দলার মত উবে যেত। দেবী বলতেন, ওপরকার জগতের এই সব ফল পৃথিবীর ন্যায় স্থূল দেহের সৃষ্টির জন্যে জন্মায় না, মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টির খোরাক যোগানোই এদের কাজ।

সেদিন তখন ওদের বাড়িতে সকালবেলা করে রেখেছে পুষ্প। ঠিক যেন পৃথিবীর সকাল, লতাপাতায় শিশির, পাখি ডাকচে ও গঙ্গার ওপারে সূর্য উদয় হচ্চে, পুষ্প সবে গঙ্গাস্নান করে শিবমন্দিরে পুজো করতে যাচ্চে, এমন সময় করুণাদেবী এলেন। পুষ্পকেবল্লেন—বেশ সকালটি করে রেখেচ তো! পুজো সেরে নাও, চল তুমি আর যতীন আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে।

যতীন ঘরের মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

দেবীকে বসবার আসন দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। করুণাদেবী বল্লেন—তুমি পুজো কর না?

—ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় পৃথিবীতে দেবতা ও ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে, এখানে এসে তার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সে ভাবের দেবতা কই এখানে? সে ভাবের ভগবানই বা কোথায়? পুষ্প মেয়েমানুষ, ওর মনে ভক্তি ও পূজার্চনার প্রবৃত্তি কোনো প্রশ্ন ওঠায় না। বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে সে পূজার ফুল তার মনগড়া ইষ্টদেবের পায়ে দেয়। আমি তা পারি না। আমার মনে হয়—

করুণাদেবী বল্লেন—তোমার এ কথার মধ্যে ভুল রয়েচে, যতীন। তুমি ভেবো না ভগবান সম্বন্ধে তুমি কোনো ধারণা কখনো করে উঠতে পারবে। তুমি কোথায়, আর সেই বিরাট বস্তু, যাঁকে পৃথিবীতে বলে ভগবান, তিনিই বা কোথায়? অতএব ভক্তি ও অর্চনা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হলে তোমার মনের মত ভগবান তোমাকে

গড়ে নিতে হবে। তোমার সেই মন-গড়া দেবতার মধ্যে দিয়েই অর্ঘ্য পৌঁছোবে সেই বিশ্বদেবের পায়ে। তুমি তৃতীয়-স্বর্গবাসী জীব, এর বেশি কি করতে পারো?

যতীন ছাড়তো না তর্ক করতো, এমন সময়ে পুজো শেষ করে পুষ্প ফিরে এল। দেবী ওদের দুজনকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন।

যে জায়গাটিতে তাঁরা এলেন, সেখানটা একটা নির্জন স্থান। ছোট একটা নদী, তার ধারে অনেকদূরব্যাপী ঘন জঙ্গল।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ দেশ?

দেবী বল্লেন—বাংলাদেশ, চিনতে পারচ না কেন? মধুমতী নদী, এইখানে ছিল বড় গঞ্জ নকীবপুর, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে। ধ্বংস হয়ে জঙ্গল হয়ে রয়েচে। বাংলাদেশ ছাড়া তোমাদের আনতাম না—কারণ যে কাজ করতে হবে তাতে বাঙলা ভাষা বলা দরকার হবে। চল দেখাচ্চি।

নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ছোট একখানা খড়ের বাড়ি। কিন্তু বাড়িখানা দেখেই যতীন অবাক হয়ে গেল। ঘরখানা পৃথিবীর বস্তু দিয়ে তৈরি নয় আত্মিকলোকের চিন্তাশক্তিতে সৃষ্ট আত্মিকলোকের সূক্ষ্ম পদার্থে তৈরি ঘর। পৃথিবীতে এমন ঘর কি করে এল, যতীন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চে—এমন সময় একটি বৃদ্ধ এক বোঝা কঞ্চি বয়ে নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

যতীন আরও অবাক হয়ে গেল।

বৃদ্ধটি পার্থিব স্থূল দেহধারী মানুষ নয়—খুব নিম্নস্তরের আত্মা—পৃথিবীতে যাকে বলে প্রেত! তার হাতের কঞ্চির বোঝাও সত্যিকার কঞ্চির বোঝা নয়, সেটা চিন্তাশক্তিতেগড়া আত্মিকলোকের বস্তু দিয়ে তৈরি।

বৃদ্ধের ভাব দেখে মনে হোল সে তাদের কাউকে দেখতে পায়নি।

যতীন বিস্মিত ভাবে বল্লে—ব্যাপার কি? এ তো মানুষ নয়। এখানে এ ভাবে কি করচে?

করুণাদেবী বল্লেন—সেই কথা বলবো বলেই তোমাদের আজ এনেচি। বড় করুণ ইতিহাস লোকটির। ওর নাম দানু পাড়ুই। স্ত্রীকে সন্দেহ হয় বলে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়—দেশ থেকে পালিয়ে পুলিশের ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নকীবপুরের এই জঙ্গলে অনেক দিন ঘর বেঁধে ছিল। আট-দশ বছর পরে ওর নিমোনিয়া হয়, তাতেই মারা পড়ে। মৃত্যুর পরে হয়ে গিয়েচে আজ ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরেও ও বুঝতে পারেনি যে ও মরে গিয়েচে। ভাবে, ওর কি অসুখ করেচে, তাই ওকে কেউ দেখতে পায় না। জঙ্গলের মধ্যে খুব কমই লোক আসে, কাজেই জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ওর পার্থক্য কি, বুঝবার সুযোগ ঘটেনি। নিজেও পুলিশের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। অথচ এত স্থূল ধরনের মন, এত নিম্নস্তরের আত্মা যে, আমি কতবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। আমাকে ও দেখতেও পায় না। ওর নিজের লোক যারা মারা গিয়েচে, কখনো কেউ আসে না। তাই তোমাদের এনেচি আজ।

যতীন বল্লে—আশ্চর্য!

দেবী বল্লেন—মরে গিয়ে বুঝতে না পারা আত্মিকলোকের এক রকম রোগ। পুরোনো হয়ে গেলে এ রোগ সারানো বড় কঠিন, কারণ, মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ কখনো না জানার দরুন এই সব অজ্ঞ নিম্ন আত্মারা বেঁচে থাকার সঙ্গে মৃত্যুর পরের অবস্থার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু আদৌ বুঝতে পারে না। এমন কি, বুঝিয়ে না দিলে ষাট, সত্তর, একশো, দুশো বছর এ রকম কাটিয়ে দেয়, এমন ব্যাপারও বিচিত্র নয়।

যতীন এমন ব্যাপার কখনো শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্য, বন্ধুহীন, স্বজনহীন, অসহায় বৃদ্ধের ওপর তার সহানুভূতি হোল। করুণাদেবী সত্যই করুণাময়ী বটে, পৃথিবীর এই সব হতভাগ্যদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের সাহায্য করা তাঁর কাজ, তিনি যদি দেবী না হবেন, তবে কে হবে?

যতীন বল্লে—আচ্ছা এই খড়ের ঘরটা—

এবার উত্তর দিলে পুষ্প। বল্লে—বুঝলে না? ওর আসল পৃথিবীর ঘরখানা কোন্ কালে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েচে। কিন্তু সেই ঘরখানার ছবি ওর মনে তো আছে—ওর চিন্তা সেই ছবির সাহায্যে ঘরটা গড়েচে—যেমন আমার তৈরি গঙ্গা আর কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। এ লোকে তো ও তৈরি করা কঠিন নয়। অনেক সময় আপনা-আপনি হয়।

দেবী বল্লেন—পুষ্পকে আর আমাকে ও তো দেখতে পাবেই না। যতীন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও তো ওর সামনে!

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে জোনাকি পোকাজ্বলে উঠলো। যতীন গিয়ে বুড়োর সামনে দাঁড়ালো, কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। বৃদ্ধ ওকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো এবং ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। দেবী বল্লেন, ও তোমাকে দেখতে পেয়েচে, কিন্তু ভাবচে তুমি ভূত।

পুষ্প ভাবলে, কি মজার কাণ্ড দ্যাখো! ভূত হয়ে ভূতের ভয় করচে!

দেবী বল্লেন—ওর সঙ্গে কথা বলো—

যতীন বল্লে—ভয় কি বুড়োকর্তা! ভয় পাচ্চ কেন?

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপচে আর রাম রাম বলচে। যতীনের হাসি পেল কিন্তু দেবী সামনে রয়েচেন বলে সে অতি কষ্টে চেপে গেল।

যতীন আবার বল্লে—বুড়োকর্তা, ভয় কিসের, তুমি এখানে একলা আছ কেন? এবার বোধহয় বৃদ্ধের কিছু সাহস হোল। সে বল্লে—আজ্ঞে কর্তা আপনি কে?

—আমার এখানেই বাড়ি। কাছেই থাকি। তুমি কতদিন এখানে আছ? একলা থাকো কেন? তোমার কেউ নেই?

বৃদ্ধ এইবার একটু ভিজল। বল্লে—বাবু, আপনি পুলিশের লোক নয়? আমায় ধরিয়ে দেবেন না?

যতীন বল্লে—না, কেন ধরিয়ে দেবো? কি করেছ তুমি? তা ছাড়া তোমার যা অবস্থা তাতে পুলিশে তোমাকে এখন আর কিছু করতে পারবে না।

বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত সুরে বল্লে—কি হয়েছে বলুন তো বাবু আমার? আপনি কি ডাক্তার? সত্যি বাবু, আমিও বুঝতে পারিনে যে আমার এ কি হোল। একবার অনেককাল আগে আমার শক্ত অসুখ হয়—তারপর অসুখ সেরে গেল, কিন্তু সেই থেকে আমার কি হয়েচে আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, লোককে ডেকে দেখেচি আমার ডাক না শুনে তারা চলে যায়। মামুদপুরের হাটে যাই, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার শরীরে যেন খিদে তেষ্টা চলে গিয়েচে। আগে আগে ভাত খেতাম, এখন খিদে হয় না বলে বহুকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শরীরটা কেমন হাল্কা মনে হয়, যেন তুলোর মত হাল্কা—মনে হয়, যেন আকাশে উড়ে যাবো। তেষ্টা নেই শরীরে। আর একটা জিনিস বাবু, কোনো কিছুতে হাত দিলে আগের মত আর আঁকড়ে ধরতে পারিনে। হাত গলিয়ে চলে যায়। এ কি রকম রোগ বাবুমশাই? পুলিশের ভয়ে কোথাও যেতে পারি নে, নইলে নলদীর সরকারি ডাক্তারখানায় গিয়ে এবার ডাক্তারাবুকে দেখাবো ভেবেছিলাম।

যতীন বল্লে—বল্‌ছি সব কথা। কিন্তু পুলিশের ভয় কর কেন? কি করেছিলে?

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কেন বাবু?

—বল না। আমি কাউকে বলবো না। আমার অবস্থা বুঝতে পারচ না? আমিও তোমার দলের একজন। আমিও মানুষজনের সঙ্গে মিশতে পারিনে।

কথাটার মধ্যে দুরকম অর্থ ছিল। বৃদ্ধ সোজাটাই বুঝলে। বুঝে বল্লে—আপনার নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে না কি বাবু? কি করেছিলেন আপনি?

—আমি আমার স্ত্রীকে খেতে দিতাম না। বাপের বাড়ি ফেলে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হোত প্রায়ই। তারপর একদিন—

বৃদ্ধ বল্লে—বাবুমশাই, আপনি পুলিশের লোক। আমি বুঝতে পেরেচি। আপনি সব জানেন দেখচি। তা ধরুন আমায়, আমার যে রোগ হয়েচে, বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবো না। এ রকম জ্যান্ত মরা হয়ে থাকার চেয়ে ফাঁসি যাই যাবো। এতদিনে আমার ভুল বুঝতে পেরেচি বাবুমশাই। আমার বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না, সতীলক্ষ্মী ছিল সে। আমার মনে মিথ্যে ধুক্‌বুক ছিল কালীগয়লার ছোট ভাইটার সঙ্গে বড় হাসিঠাট্টা করতো। বারণও করে দেলাম অনেকবার, তাও শুনতো না। তাই একদিন রাগের মাথায়—কিন্তু দোহাই দারোগা বাবু, খুন করবো বলে মারিনি। মাঠ থেকে সবে এসে পা দিইচি বাড়িতে দেখি কালীগয়লার ভাই ছিচরণ খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে; চাষার রাগ—বল্লাম—ও কেন বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল? বউ উত্তর দেবার আগেই রাগের মাথায় তার মাথায় এক ঘা—

বৃদ্ধ হঠাৎ কেঁদে ফেললে। বল্লে—তারপর আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম দারোগাবাবু। ছিচরণকে বউ ভাই-এর মত দেখতো। ছিচরণ হাসির গল্প বলতে পারতো, বউ তাই শুনতে ভালবাসতো। বৌ-এর কোন দোষ ছিল না। সেই পাপের ফলে আজ আমার ভয়ানক রোগ জন্মেচে শরীরে। আর আমার জীবনে মায়া নেই, সর্বদা বউডার কথা ভাবি আজকাল। অনেকদিন থেকেই ভাবি। একা একা এই জঙ্গলে এই রোগ নিয়ে আর কাটাতে পারিনে, দারোগাবাবু। জেলে গেলে তবুও পাঁচটা মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচবো।

দেবী বল্লেন—ওকে জিজ্ঞেস কর, ওকি বৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়?

যতীন বৃদ্ধকে কথাটা জিজ্ঞেস করতেই সে অবাক হয়ে ওর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্লে—তবে কি বাবু বৌ হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল?

যতীন বল্লে—তা নয়, তুমিও আর বেঁচে নেই। তুমিও মরে গিয়েচ, তোমার বৌও মরে গিয়েচে। আমিও মরে গিয়েচি। সবাই আমরা পরলোকে আছি এখন। তোমাকে উদ্ধার করতে আরও দু'জন দেবী এখানে এসেচেন, তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছ না। এখানেই তাঁরা আছেন। তোমার এ অবস্থা দেখে তাঁদের দয়া হয়েছে। এবার তোমার ভাবনা নেই, তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করিয়ে দেব।

বৃদ্ধ কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করলে না। সে সন্দিগ্ধ সুরে বল্লে—তবে আমার এই রোগটা হোল কেন? এটা সারবার একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। বৌ-এর সঙ্গে দেখা করে কি হবে বাবু? হাসপাতাল থেকে সে যদি সেরে থাকে, তবে তো ভালই। তার ভাই-এর বাড়ি আছে বুঝি? তা থাক, দেখা করে আর কি হবে বাবুমশাই, এ রোগ নিয়ে আর কারু সঙ্গে দেখা করতে চাইনে বাবু।

যতীন ওর কাছে পরলোক ও মৃত্যুর প্রকৃতি বর্ণনা করলে খানিকক্ষণ। করুণাদেবী বল্লেন—ও সব বোলো না যতীন ওর কাছে। ওতে কোনো উপকার হবে না। ও কি বুঝবে ওসব কথা?দেখচো না কত নিম্ন স্তরের আত্মা? বুদ্ধি বলে জিনিস নেই ওর মধ্যে। ওকে বোঝাতে হোলে অন্যপথে যেতে হবে। ওর স্ত্রীকে আনতে হবে খুঁজে পেতে কোনরকমে, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওর তো দেখচি ভালবাসার কোনো বন্ধননেই স্ত্রীর সঙ্গে। এ অবস্থায় দুজনের যোগ স্থাপন করানোই কঠিন কাজ। এ লোকে যার সঙ্গে যার ভালবাসা বা স্নেহ নেই, তার সঙ্গে তার কোনো যোগই যে সম্ভব নয়।

আরও কয়েকবার যাতায়াত ও অনবরত চেষ্টা করলে ওরা। বৃদ্ধ কিছুই বোঝে না। তাকে তার অবস্থা বোঝানো সাংঘাতিক কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সে মরে গিয়েছে। কারো ওপর তার টান নেই—না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, না অন্য কারো ওপর।

করুণাদেবী বল্লেন—শুধু বুদ্ধিহীন বলে নয়, এমন একটি অদ্ভুতধরনের হৃদয়হীন প্রেমহীন আত্মা আমি খুব কমই দেখেচি। মনে হয় প্রেম ভালবাসা স্নেহ এসব যদি থাকতো তা হলেও এর উদ্ধার এত কঠিন হোত না। কি যে করি এখন!

কিন্তু কি অপূর্ব নিঃস্বার্থ দরদ করুণাদেবীর! পতিত হতভাগ্যদের ওপর কি তার মায়ের মত গভীর সহানুভূতি! কত কষ্ট করে তিনি নিম্নস্তরের বহু জায়গা খুঁজে পেতে একদিন এক স্ত্রীলোককে এনে হাজির করলেন ওর সামনে! যতীন আর পুষ্প সব সময়েই ওঁকে সাহায্য করতো, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কারণ অত নিম্নস্তরে দেবী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য—পুষ্পও তাই—যতীনের বিনা সাহায্যে কোন কাজই সেখানে হবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটিরও তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, মনে প্রেম ভালবাসাও তথৈবচ। ধূসরমিশ্রিত লাল রঙের দেহধারী আত্মা। তবে সে সক্রিয় ধরনের বা অনিষ্টকারী চরিত্রের মেয়ে নয়—মোটামুটি ভাল-মানুষ এবং ওর স্বামীর মতই প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না।

খুব এমন কিছু উঁচুদরের আত্মা না হোলেও বৃদ্ধের অপেক্ষা কিছু উঁচু। কিন্তু হঠাৎ খুন হয়ে মৃত হওয়ার ফলে অনেকদিন পর্যন্ত তার এ লোকে ভাল জ্ঞান হয় নি। সম্প্রতি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেচে।

যতীন বৃদ্ধকে বল্লে—চিনতে পারো? এগিয়ে এসে দ্যাখো তো!

বৃদ্ধ চমকে উঠলো, বল্লে—বড় বৌ যে!

ওর স্ত্রী হেসে বল্লে—হ্যাঁ, মুগুরের বাড়ি মাথায় দিয়ে ভেবেছিলি হাত থেকে বুঝি এড়ালি। তা আর হোল কৈ?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বল্লে—বড় বৌ, তুই তাহলে বেঁচে আছিস্?

বড় বৌ বল্লে—তুইও যা আমিও তাই। দুজনেই মরে ভূত হয়ে গিয়েচি। আজ এঁরা সবএসেচেন তাই এঁদের দয়ায় উদ্ধার হয়ে গেলি।নে এঁদের গড় কর্ পায়ে।

—পুলিশের দারোগাবাবুকে?

—যমের অরুচি—পুলিশের দারোগা আবার কে এর মধ্যে? মরচেনকেবলপুলিশ পুলিশ করে; অত যদি পুলিশের ভয় তবে রাগের সময় কাণ্ডজ্ঞান ছিল না কেন রে মুখপোড়া? এঁকে প্রণাম কর, আর দুজন আছেন, তাঁদের দেখবার ভাগ্যি তোর এখনো হয়নি, এই পিটুলি গাছের তলায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর।চল্ আমার সঙ্গে, তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্চি—এখন কিছু বুঝবিনে।

বৃদ্ধ যতীনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। স্ত্রীর কথায় পিটুলি গাছের তলায় মাথা নীচু করে অদৃশ্য পুষ্প ও দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করল। স্ত্রীলোকটিও সকলকে প্রণাম করলে—তারপর বৃদ্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

ফেরবার পথে করুণাদেবী বল্লেন—যারা কিছুই বোঝে না, তাদের দিয়ে না হয় নিজের উপকার না হয় পরের উপকার। দেখলে তো চোখের সামনে? যারা এই বিরাট বিশ্বরহস্যের কিছুই বোঝে না, তারা নিজেদের মহান অদৃষ্টলিপি, আত্মার বিরাট ভবিষ্যৎ কি বুঝবে? এসব লোকের এখনো কতবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে, তবে এরা উচ্চস্তরের উপযুক্ত হবে। এদের নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয় এমন!

যতীন মনে মনে ভাবলে—পতিতের ওপর এমন দয়া না থাকলে সাধে কি আর দেবী হওয়া যায়!

পৃথিবী থেকে ফেরবার পথে এক জায়গায় শূন্যপথে ক্ষুদ্র একটি জগৎ মহাশূন্যসমুদ্রের মধ্যে নির্জন দ্বীপের মত দেখা যাচ্চে। তার কিছু ওপর দিয়ে যাবার সময় একটি দৃশ্য দেখে যতীন আর পুষ্প দুজনেই থেমে গেল। এ জগতে এসে পর্যন্ত ওরা অনেক উন্নত স্তরের জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী রূপসী দেবীদের দেখেচে, যেমন একজন করুণাদেবী তাদের সঙ্গেই রয়েচেন। কিন্তু এই নির্জন ক্ষুদ্র জগৎটির একস্থানে প্রান্তরের মধ্যে শিলাখণ্ডের ওপর যে নারীকে ওরা বসে থাকতে দেখলে, তাঁর শ্রী ও মহিমার কোনো তুলনা দেওয়া চলে না। কি তেজ, কি দীপ্তি,

কি প্রজ্জ্বলন্ত রূপ—অথচ মুখে কেমন একটা দুঃখ ও বিষাদের ছায়া—তাতে মুখশ্রী আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। স্বচ্ছ নীল আভা তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হয়ে শিখাখণ্ডটাকে পর্যন্ত যেন দামী পান্নায় পরিণত করেচে।

করুণাদেবীও সেদিকে চেয়ে চমকে থেমে গেলেন। বল্লেন—ওঁকে চেন না? বহু সৌভাগ্যে দেখা পেলে। বহু উচ্চস্তরের দেবী, চল, দেখা করিয়ে দিই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে উনি বিশেষ খুশি হবেন এই জন্যে যে, উনি প্রেমের দেবী। ওঁর কাজ পৃথিবীতে শুধু চলে না, বহু গ্রহে উপগ্রহে, স্থূল ও আত্মিক জগতে, বিশ্বের বহু দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে যেখানেই জীব বাস করে—সেই সব স্থানেই দুটি প্রেমিক আত্মার মিলন সংঘটন করিয়ে বেড়ান। উনি একা নন, ওঁর দলবল খুব বড়। অনেক সঙ্গিনী আছে ওঁর। উনি অসীমশক্তিময়ী দেবী, আলাপ হোলে হঠাৎ কিছু বুঝতে পারবে না। অত বড় প্রাণ, অত উদার প্রেম-ভালবাসা ভরা আত্মা তোমরা কখনো দেখনি। খুব সৌভাগ্য তোমাদের যে চোখে ওঁকে দেখতে পেয়েচ আজ, এর একমাত্র কারণ আজ তোমরা পৃথিবীতে ওই আত্মাটির উদ্ধারের সাহায্য করেচ, সেই পুণ্যে এই মহাদেবীকে চোখেদেখার সৌভাগ্য লাভ করলে! নইলে সাধ্য কি তোমাদের ওঁকে দেখতে পাও? এসো আমার সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিই।

ওরা এসে সেই দেবীর সামনে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে—করুণাদেবী বললেন—এরা পৃথিবীর লোক, মেয়েটি এঁকে ভালবাসতো বড়। বাল্যপ্রেম। মেয়েটি আগে মারা যায়, তারপর এ লোকে সে বহুদিন প্রতীক্ষায় ছিল। সম্প্রতি মিলন হয়েচে।

প্রণয়দেবী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—আমি জানি, সখী। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। আমি ওদের ওপরে দৃষ্টি রাখিনি ভেবেচ? এই একটি সত্যিকার প্রেমের উদাহরণ। যেখানেই সত্যিকার জিনিস, সেখানেই আমি আছি। চেষ্টা করি তাদের মিলিয়ে দিতে, কিন্তু সব সময় পারিনে। আরও ওপরে রয়েছেন কর্মের দেবতারালিপিকা-লিপিকদের দল। তাঁদের প্যাঁচ ছাড়ানো কত কঠিন তোমার তো জানতে বাকি নেই! এদের পূর্বজন্মের কর্ম ছিল ভাল, তাও, এই ছেলেটির গোলমাল রয়েছে এখনো, পরে দেখতে পাবে। তা এনে ভালই করেছ। আমার মণ্ডলীতে এরা আসুক, কারণ এরা আমারই দলের উপযুক্ত লোক।

পুষ্প ও যতীন উল্লসিত হয়ে উঠল।

প্রেমের ব্যাপারে কি সাহায্য তাদের দিয়ে হবে তারা জানে না, কিন্তু একথা তাদের প্রাণের কথা যে তারা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করবে যদি পৃথিবীর একটি ব্যর্থ প্রণয়ীর জীবনেও তারা সার্থকতার আলো জ্বালাতে পারে। এই তাদের অন্তরের কথা। যারা যে দলের, এতদিন পরে যতীন ও পুষ্প যেন সগোত্র আত্মার আত্মীয়মণ্ডলীকে আবিষ্কার করলে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, বিশ্বের কি অদ্ভুত কার্যপ্রণালী! অদৃশ্য জগতের কি বিরাট সংঘরাজি, কি বিরাট কর্মপ্রবাহ। পুষ্প ভাবছিল—কিন্তু করুণাদেবীকে ছেড়ে ওরা কি করে যাবে? তাঁকে যে ওরা বড় ভালবাসে—কিন্তু তার মনে কষ্ট দেওয়া হবে যে।...করুণাদেবী যেন ওর মনের কথা বুঝেই বল্লেন—তোমাদের প্রকৃত স্থান এ মণ্ডলীতে। আমার দেখা সর্বদাই পাবে, যখন চাইবে তখনই দেখা দেবো, সেজন্য ভেবো না।তোমরা যাও এঁর সঙ্গে।

প্রণয়দেবী বল্লেন—উনি আর আমি পৃথক নই। উনি যেখানে, সেখানে আমি আছি; আমি যেখানে, সেখানে উনিও থাকেন। প্রেম আর করুণা পরস্পর ফুল আর সুতোর মত একসঙ্গে আছে। সুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না, ফুলকে বাদ দিয়ে সুতো নিয়ে মালা হয় না।

—কেন, বিনি সুতোয় মালা হয় না সখী?

—বড় সন্তর্পণে গলায় দিতে হয়। বড় ঠুনকো হয়। বড় অল্পে মরে বাঁচে। করুণা প্রেমকে সাহায্য না করলে প্রেম হয় ঠুন্‌কো। এদিকে প্রেম পেছনে না থাকলে করুণা রক্তাল্পতা রোগে মারা পড়ে। ছলনা কেন করচো সখী, তুমি নাকি এ জান না!

আবার নীল শূন্যপথে, আবার বাধাহীন তড়িৎ-অভিযান। যতীন ও পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৌঁছে গেল।

১২

যদিও তৃতীয় স্বর্গে দিন নেই রাত নেই, সময় অবিভাজ্য ও মাত্রাস্পর্শহীন তবুও যতীনের সুবিধার জন্যে পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৃথিবীর মতই দিনরাত্রি সৃষ্টি করতো। ঘুমের আবশ্যক না থাকলেও নিজের সৃষ্ট রাতে ঘুমাতো।

দিন কয়েক পরে।

পুষ্প ঘুম ভেঙে উঠেচে। ওর শয়নকক্ষের বাইরের প্রকাণ্ড মুচুকুন্দ চাঁপার গাছটাতে পাখিরা কিচ্ কিচ্ করচে। ও দেখলে জানালা দিয়ে নতুন-ওঠা প্রভাত-সূর্যের আলোর রং কেমন অদ্ভুত ধরনের সবুজ ও গোলাপী। আরও বিস্মিত হোল দেখে যে সেই রঙিন আলোর মৃদু জ্যোতিটা বাষ্পাকারে তার খাটটা ঘিরে রয়েচে যেন। যতীন বুঝতে পারতো না ব্যাপারটা। পুষ্প বুঝলে ওপরের স্বর্গ থেকে কোনো উচ্চতর আত্মা তাকে স্মরণ করেচেন।

যতীনকে কথাটা বলতেই সে বল্লে—চল আমিও যাই।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—পারবে না যতুদা, নইলে তোমায় ফেলে যেতে কি আমার সাধ? আমার মনে হচ্চে ইনি সেদিনকার সেই দেবী, করুণাদেবী যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সে স্বর্গে যাওয়া তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তুমি থাকো আমি যাই, কাজ শেষ হলেই চলে আসবো।

গোলাপী আলোর সরল জ্যোতিরেখা অনুসরণ করে সে মহাশূন্যপথে উঠলো। পুষ্প চতুর্থস্তরের আত্মা, তার শক্তি গতিবেগ যতীনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু যতীন সঙ্গে থাকলে পুষ্প নিজেকে সংযত করে চলে ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে। নইলে লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের নিমিষে অতিক্রম করবার শক্তি ধরে সে।

পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছুলো, পৃথিবীর ভাষায় তার হয়তো বাইরের রূপের অনেকখানিই বর্ণনা করা যায়, কেবল করা যায় না তার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর শান্তি ও বহুগুণে বর্ধিত সুখদুঃখের অনুভূতির স্পন্দনমান তীব্রতার। সে কি ভয়ানক জীবনছন্দ! সেখানকার মাটিতে পা দিলেই মনের সুখ, দুঃখ, শোক, স্নেহ, প্রেম, কল্পনা সব শতগুণ বেড়ে যায়। অনুভূতির তীব্রতা যারা সহ্য না করতে পারে, তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই। বলহীন মন স্বর্গলাভ করতে পারে না!

পুষ্প শক্তিময়ী, পুষ্প চতুর্থ স্তরের উচ্চ থাকের আত্মা—তাকেও রীতিমত চেষ্টা করতে হোল প্রাণপণে সংজ্ঞা বজায় রাখবার জন্যে।

চারিপাশের অদৃশ্য ইথারের তরঙ্গ যেন তার দেহের কোন্ অজানা ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে তাকে সক্রিয় করে তুলেচে। সে অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কাজ যে-অনুভূতিরাজিকে মনেরমুকুরে প্রতিভাত করা—পৃথিবীতে এমন কি নিম্নতর স্বর্গগুলিতেও, সে সব অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে না।

অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তারা থাকতে পারে এবং আছেও, কেবল আস্বাদ করবার ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে আছে। উচ্চ জগতের তীব্রতর স্পন্দন-তরঙ্গ তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে—কিন্তু যেমন গঙ্গা যখন মর্তে অবতরণ করেন, তখন কেউ তার তাল সামলাতে পারেনি, ঐরাবত পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল—উচ্চ স্বর্গের দেবতা মহাদেব নেমে এসে জটাজাল বিস্তার করে না দাঁড়ালে কারো সাধ্য ছিল না সে বেগবতী স্রোতোধারার মুখে দাঁড়ায়—ঐ সব অনুভূতির বেগ তেমনি সহ্য করতে পারে একমাত্র উচ্চস্তরের দেবতারাই। চারিদিকে ফুল ফুটে আছে, সে সব ফুলের রঙই বা কতরকম, কিন্তু আলোর মত কি একটা অজানা পদার্থে সেসব গাছ, সে সব ফুল তৈরি—একটাছিঁড়ে নিলে তার

জায়গায় তখনি আর একটা ঐ রকম ফুল গজাবে। বড় বড় জলাশয় আছে, তার নীলাভ নিস্তরঙ্গ বক্ষের উপর দিয়ে লোকেরা হেঁটে যাতায়াত করচে, যেমন মাটির ওপর দিয়ে পৃথিবীর লোক যায়। অথচ সেখানে নৌকাও আছে—যাদের ইচ্ছে, নৌকো করেও বেড়াতে পারে।

এক জায়গার স্ফটিক প্রস্তরের মত স্বচ্ছ কোনো পদার্থে তৈরি একটা বাড়ির সামনে গিয়ে ঐ রঙিন জ্যোতিরেখা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েচে। পুষ্প সেখানে ঢুকে দেখলে প্রণয়দেবী একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচেন।

পুষ্প ঘরে ঢুকতেই ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমায় ডেকেচি বড় বিপদে পড়ে। আমায় একটু সাহায্য করো।

পুষ্প বল্লে—বলুন কি করতে হবে!

দেবী বল্লেন—বোসো। পৃথিবীতে গিয়ে কাজ করতে পারে, এমন লোকই চাইছিলাম। তুমি ভিন্ন আর কারো কথা মনে উঠলো না। যতীনকোথায়, তাকে আনলে না কেন?

পুষ্প সলজ্জসুরে বল্লে—যতুদা এখানে আসতে পারবে না। আসতে চেয়েছিল, আমি আনিনি।

দেবীপ্রসন্ন সহাস্য মুখে বল্লেন—আচ্ছা, এবার থেকে আমি তাকে নিয়ে আসবো।

—আপনি পারেন—আমার শক্তি কতটুকু, আমার কাজ নয়। একবার পঞ্চম স্বর্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, চতুর্থস্তরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আর আমি চেষ্টাকরিনি।

পুষ্প একটা জিনিস লক্ষ্য করলে।

প্রথমদিন সে প্রণয়দেবীকে যে মূর্তিতে দেখেছিল এ ঠিক সে মূর্তি নয়। প্রণয়দেবীকে আরও তরুণী দেখাচ্ছে, মুখশ্রী আরও সুন্দর।শরীর স্বচ্ছ সুন্দর, নীলাভ শুভ্র।

দেবী বল্লেন—কি ভাবচ?

—আপনি জানেন কি ভাবচি।

—আমার চেহারা এখন যে রকম দেখচো, তখন অন্যরকম দেখেছিলে—এই তো?

পুষ্প কথাটা জানতো। সে শুনেছিল বহু উচ্চ স্বর্গে অধিবাসীদের কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা একটা ডিম্বাকৃতি সোনালী আলোর মত—যখন কারো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় না বা মূর্তি গ্রহণ করবার বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকে না—তখন তাঁরা শুধু একটা চৈতন্য-বিন্দুতে পর্যবসিত হয়ে এই ডিম্বাকৃতি আলোর মূর্তিতে অবস্থান করেন। কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হোলে তাঁরা যে কোন মূর্তি ইচ্ছামত ধারণ করতে পারেন—অতি সুন্দর তরুণের রূপ বা মহিমময় গম্ভীর বয়স্ক লোকের রূপ বা পৃথিবী-প্রচলিত নানা শাস্ত্র ও ধর্ম-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত দেব, দেবী দেবদূত প্রভৃতির রূপ—যাতে মানুষেরা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী মূর্তিতে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে, প্রাণে বল ও উৎসাহ পেতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবুও ভাল করে দেবীর মুখে শোনবার জন্যে তার কৌতূহল হোল। প্রণয়দেবী বল্লেন—দেখ, পৃথিবীতেও এই একই ব্যাপার হয়। আত্মার অবস্থার সঙ্গে বাইরের আকৃতি বদলায়। সাধুর একরকম চেহারা, নিম্নস্তরের লোকের আর একরকম। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল পদার্থের ওপর আত্মার প্রভাব তত কার্যকর হয় না। এখানে তা নয়। এমন কি এবেলা ওবেলা রূপের পরিবর্তন হয় এখানে। খুব প্রেম বা সহানুভূতির সময় এখানে মুখশ্রী দেখতে দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক পৃথিবীর খুব ভাবপ্রবণ, কল্পনাময়ী, অপরূপ রূপসী কিশোরীর মত। আবার অন্য অবস্থায় অন্য রূপ ফুটে ওঠে মুখে। ইচ্ছামত পৃথিবীতে পোশাক বদলায়, এখানে তেমনি মূর্তি বদলানো যায়—

পুষ্প সকৌতুকে ভাবলে—অর্থাৎ কিনা আটপৌরে গেরস্থালী মূর্তি, পোশাকী মূর্তি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করার মূর্তি, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের মূর্তি, ভক্তের কাছে পুজো নেওয়ার মূর্তি—এরা আছে বেশ মজায়!

প্রণয়দেবী, পৃথিবীর এই প্রগল্‌ভা বালিকার চিন্তা বুঝতে পেরে স্নেহের হাসি হাসলেন। বল্লেন—আমি পৃথিবীতে এখন যেতে পারচি নে। তুমি যাও, যতীনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এখানে সরে এসো,যে ব্যাপারের জন্যে পাঠাচ্চি এখানে এসে দেখ দাঁড়িয়ে।

ওদিকের যে প্রকাণ্ড বড় ফরাসী বে-উইন্ডোর মত জানালার ধারে তিনি পুষ্প আসবার আগে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলেন, পুষ্প গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

দাঁড়াবামাত্র তার দৃষ্টিশক্তি যেন সহস্রগুণে বেড়ে গেল। লক্ষ কোটি যোজন দূরবর্তী এক অতি ক্ষুদ্র গ্রহ—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম ওর নয়নপথে পতিত হোল। দেখেই বুঝলে, বাংলাদেশ। সন্ধ্যা নেমে আসচে।

নারিকেল সুপারি গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা একতালা কোঠাবাড়ি। বাড়িতে বিবাহহচ্চে। উঠোনে ক্ষুদ্র শামিয়ানা টাঙানো, বাইরের বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো, বরযাত্রীরা এখনো আসে নি, কন্যাপক্ষ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করচে। সকলের একটা ব্যস্ততা ও উৎসাহের ভাব। কিন্তু সরুপাড় ধুতি পরনে একটি সতেরো আঠারো বছরের কিশোরী নিরানন্দ মুখে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে। যেন আজকের উৎসবের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—মাঝে মাঝে চোখের উদ্‌গত অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে ভয়ে ভয়ে চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইচে, কেউ দেখতে না পায়।

দেবী বল্লেন—ওই যে মেয়েটা দেখচো, ওর নাম সুধা, বিয়ে ওর ছোট বোনের। ওই মেয়েটার দুঃখে আমি এত কষ্ট পাচ্চি যে স্বর্গে থাকা আমার দায় হয়ে উঠেচে। ও অত্যন্ত প্রেমিকা মেয়ে—অত অল্প বয়সে অত ভাবপ্রবণ প্রেম-পাগলিনী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ও আজ বছর-দুই বিধবা হয়েচে—তের বছরে বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বেঁচে ছিল বছর দুই। এই দু-বছরে স্বামীকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। রোজ রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আজ ওর ছোটবোনের বিয়ে। ওর কেবলই মনে হচ্ছে ওর বিয়ের দিনটির কথা। আজ সারাদিন লুকিয়ে কাঁদচে পাছে মা বাবা মনে কষ্ট পায়। আমার আর সহ্য হয় না ওর দুঃখ—কি যে করি। তার চেয়েও করুণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মেয়েটিকে আমি তিনজন্ম ধরে লক্ষ্য করচি, তিন জন্মই ওর এই অবস্থা, বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হচ্চে। অথচ কি ভালবাসার পিপাসা ওর! কি প্রেমপ্রবণ হৃদয়! ...আর দেখচো তো, গরিব ঘরের মেয়ে!

পুষ্পের হৃদয় গলে গেল অভাগী বালিকার জীবনের ইতিহাস শুনে। চোখে জল এল। সে বল্লে—কিন্তু আপনার তো অসীম শক্তি, আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওর উপায়হয়।

দেবী বিষণ্ণ মুখে বল্লেন—তা হয় না, পুষ্প। কেন হয় না, চল তোমায় দেখাবো। তুমি আগে যাও—আমি কিছু পরেই যাবো। যতীনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।

লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের পলকে অতিক্রম করে পুষ্প এল ওদের বুড়োশিবতলার বাড়িতে। যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তারপর সে চলে এল সুধাদের বাড়ি। সুধাদের বাড়ি তখন বর এসেচে। মেয়েরা হুলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে বরকে এগিয়ে নিয়ে এল। সুধার সেখানে যাবার উপায় নেই। বাড়ির বিধবা মেয়ে, মাঙ্গলিক কোনো অনুষ্ঠানে আজ তার সামনে থাকবার জো নেই। তবুও সে কৌতূহলদৃষ্টিতে ঘরের জানালার গরাদে ধরে উঠোনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বর দেখচে। কৌতূহল অল্পক্ষণের জন্য তার শোককে জয় করেচে।

পুষ্প এসে সুধার পাশে দাঁড়ালো। সুধা যে আত্মা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর তা তখনি বুঝলে পুষ্প, কারণ পুষ্পের প্রভাব সে তখনি নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলে—তার ভারী মনটা তখনি হালকা হয়ে গেল। জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যায় নি, আরও অনেক কিছু আছে, জীবনের তো সবে শুরু, বহুদূরের পথে কোথায় কোন্ বাঁকে নক্ষত্রের মত সারারাত জেগে আছে বনফুলের দল, চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নাময় হয়ে আছে সে জায়গা—আবার আশা ফুটে ওঠে মনে—অতীত বাসররাত্রির স্মৃতির আনন্দেরমত পবিত্র অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

যতীন দেখলে একটি আত্মা অনেকক্ষণ থেকে বিবাহসভার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করচে। যতীনকে দেখে সে কাছে এল। বল্লে...আপনি কে? আপনি এখানে কেন?

যতীন বল্লে—আপনি কে?

—আমি এই বিধবা মেয়েটির স্বামী।

—ওকে একটু সান্ত্বনা দিন আজ।

আমি চেষ্টা করচি কিন্তু পারচি নে। আপনাকে দেখে বুঝেচি আপনি উচ্চ স্বর্গের মানুষ, আপনি যা পারবেন, তা আমি পারবো না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি এখানে কেন।

—এই মেয়েটির দুঃখে একটি দেবীর মন গলে গিয়েছে। তিনি পাঠিয়েচেন এখানে আমাদের।

—কই, আর কেউ তো নেই এখানে? আপনি তো একা—

যতীন পুষ্পের পাশেই ছিল, সুধার স্বামী খুব উঁচুদরের আত্মা নয়, ওরা দেখেই বুঝেছিল, সে দেখতে পেলে না পুষ্পকে।

যতীন বল্লে কথাটা। সুধার স্বামী বিনীতভাবে তাকে এবং উদ্দেশে পুষ্পকে প্রণাম করলে। বল্লে—আমি বড় কষ্ট পাচ্চি ওর জন্যে। কিন্তু কিছু করবার নেই, ও যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু আমার চেয়ে ওর অবস্থা উন্নত, আমার ক্ষমতা নেই কিছু করবার—

যতীন বল্লে—উচ্চস্বর্গের একজন দেবী আপনার স্ত্রীর ওপর কৃপাদৃষ্টি রেখেচেন—তিনি আমাদের এখানে পাঠিয়েচেন। তিনি নিজে এখুনি আসবেন—

পুষ্প বল্লে—তিনি এসেচেন, এই তো এলেন—

সুধার স্বামী পুষ্পের কথা শুনতে পেলে না, যতীন প্রণয়দেবীকে দেখতে পেলে না। কিন্তু প্রণয়দেবীর শান্ত কোমল প্রভাব সে মনের মধ্যে অনুভব করতে পারলে। প্রণয়দেবী নিজে সব সময় সুধার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল্লেন—এদের ফেলে আমার কোথাও থেকে সুখ নেই। এবারও এদের ওই রকম ভুগতে হবে, সুধার স্বামী তত উচ্চ অবস্থার নয়—তা ছাড়া কেন এরা এ রকম ভুগচে তা আমি ঠিক জানি না। জগতে এইসব ঘটে যে অদৃশ্য বিরাট শক্তির নির্দেশ অনুসারে, সে শক্তি বড় রহস্যময়। তার কর্মপ্রণালী বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, জানিও না।

পুষ্প বল্লে—তিনিই তো ভগবান?

প্রণয়দেবী চমকে উঠে বল্লেন—ও নাম কানে গেলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। যখন তখন ও নাম নিও না। ভগবান যে কি, তা আমরা জানিনে এখনো। যে শক্তির কথা বলচি, হয়তো তাকেই তোমরা ওই নামে ডাকো।

সুধার বোনের বিয়ে হয়ে গেল, বরকনে বাসরঘরে চলে গিয়েচে এই মাত্র। গরিবের ঘরের বিয়ে, তবুও উঠানে ছোট্ট শামিয়ানা টাঙানো হয়েচে প্রতিবেশীর বাড়িথেকে চেয়ে এনে, আধমণটাক ময়দার লুচি ভাজা হয়েচে বরযাত্রী ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর জন্যে, তারা খেতেও বসেচে। গ্রামেরবৌ-ঝির দল সেজেগুজে বাসরঘরে ঢুকে বরের চারিপাশে ভিড় জমিয়ে তুলেচে। প্রণয়দেবী ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইলেন, যেন মনে মনে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। আজকার দিন এবং সময় তাঁর চরণপাতের শুভ সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।

কিন্তু যতীন বিষণ্ণ মনে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল—আজকার বিবাহ-উৎসবের দৃশ্যে তার মনে হচ্ছিল, আশার সঙ্গে এমন এক উৎসবের মধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আজ কোথায় সে আর কোথায় আশা! সুধারমত আজ সে বিধবা, জীবনের সব সাধ তারও আজ ফুরিয়ে গিয়েচে—পরের সংসারে পরের হাততোলা খেয়ে—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লেন—যতীন-দা!

এই সময় প্রণয়দেবী বল্লেন—সুধা রান্নাঘরের কোণে বসে কাঁদচে, একটু ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও পুষ্প।

পুষ্প এসে দেখলে সুধার স্বামীও সেখানে উপস্থিত। তারও চোখে জল।মরণের যবনিকার আড়ালে প্রেমের এই লীলা পুষ্পকে মুগ্ধ করলে।প্রেম মরণজয়ী, এই সত্যটা এই দৃশ্যে যেন পুষ্পের মনে ভাল করে অঙ্কিত হয়ে গেল।

একটু পরে প্রণয়দেবী নিজে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সুধার মাথায় তাঁর হাত রেখে বল্লেন—কোনো দুঃখ কোরো না। আমি মিলন করিয়ে দেবো। তোমার মত মেয়ে লক্ষ লক্ষ রয়েচে আমার পৃথিবীতে তাদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারি নে।

পুষ্প বল্লে—আপনার মত দেবী ইচ্ছে করলে সুধার কোনো উপকার হয় না?

—আমি সেবা করতে পারি,বিশ্বের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবার আমি কে? আমার মত হাজার হাজার আছেন দেবদেবী। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আমার কারবার। অগণ্য জীবলোক রয়েচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—তাদের জন্যে অন্য সব দেবদেবী আছেন।

তাঁদের আপনি জানেন—?

—জানি তাঁরা আছেন—পরিচয় সকলের সঙ্গে নেই। আমাদের শক্তি মানুষের চেয়ে হয়তো বেশি, তবুও সীমাবদ্ধ। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সেদিন যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটে একা বসে অন্যমনস্কভাবে আশালতার কথা ভাবলে অনেকক্ষণ। পুষ্প ওকে সব কথা বলেচে, প্রণয়দেবীর মুখে যা কিছু শুনেছিল। তিনিই যখন অদৃষ্টকে উল্টে দিতে পারেন না, সে তো অতি তুচ্ছ ওঁরকাছে—কি করতে পারে সে? আশাকে তার নিজের ভাগ্যের পথে চলতে হবে।

পশ্চিমাকাশে অস্তসূর্যের রাঙা আভা। গঙ্গার বুকে পাল তুলে ছোট বড় নৌকার দল চলেচে। দু-একটা মাছরাঙা পাখি ছোঁ মেরে মাছ ধরচে ডাঙা থেকে অনতিদূরে। নৈহাটির গঙ্গা, কেওটা-সাগঞ্জের গঙ্গা।

কতক্ষণ সে এরকম বসে ছিল জানে না, হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখলে একজনজ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। যতীন শশব্যস্তে উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

আগন্তুক বল্লেন—বেশ করে রেখেচ হে তুমি! পৃথিবী থেকে অল্পদিন এসেচ?

আজ্ঞে হাঁ।

—তাই দেখচি। হুগলী জেলায় বাড়ি ছিল? তাই গঙ্গার ধার-টার ঠিক এই রকম করেচ। এ সব মায়া। জগৎ বা বিশ্বটাও তেমন মায়া—সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়াসব মায়া। কোন কিছুর মধ্যে বাস্তবতা নেই।

যতীন মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো। এই ধরনের একটা মতের কথা সে শুনেছিল, একবার একটা বইয়েও পড়েছিল যেন। মনে মনে বল্লে—অদ্বৈতমত বলচেন?

মহাপুরুষ যেন একটু বিস্ময়ের ভাবে বল্লেন—অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে তুমি জানো? তবে বই পড়লে কি হয়? প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি চাই। তুমি মরে এখানে এসেচ, কিন্তু জ্ঞান জন্মায়নিভেতরে। এখানে হুগলী জেলার গঙ্গার ঘাট তৈরি করে রেখেচ। এমনি করেচেঅনেকেই এখানে। সব মায়া। আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে গিয়ে—অদ্যবাব্দশতান্তেবা—আজই হোক, দুশো বছর কি হাজার বছর পরেই হোক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ভিন্ন মুক্তি নেই।

যতীন ভয়ে ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, মুক্তি মানে কি?

—ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ। যোগসাধনা ভিন্ন তা সম্ভব নয়। উপনিষদে দুটিপাখির রূপক বর্ণনা আছে। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখি বসেরয়েচে। নীচের পাখিটা মিষ্ট ফল খাচ্চে,কটু ফল খাচ্চে,—

ওপরের পাখি নির্বিকারঅবস্থায় বসে আছে, সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন। একটি পরমাত্মা, অপর পাখিটি ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন জীবাত্মা। নীচের পাখিটি যখন ওপরে উঠে ওপরের পাখিটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে—তখনই তার মুক্তি।

তদাবিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃপরমং সাম্যমূপৈতি—

যতীনএমন কথা কখনো শোনেনি। বিস্ময়মুগ্ধের মত চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। সে ভেবেছিল মরণের পর যখন বেঁচে আছে তখন তার আর ভাবনা কি? কিন্তু এখন ওর মনে হোল কোথায় যেন কি গলদ রয়ে গিয়েচে। সে বিনীতভাবে বল্লে—আজ্ঞে তবে আমাদের উপায়? আমাদের কে যোগ-শিক্ষা দেবে, কি হবে—শুনেচি সে বড় খটমট ব্যাপার—ওসব কি আমাদের জন্যে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—খুব সোজা নয়, শক্তও নয়। আমিও পৃথিবীতে তোমারই মত মানুষ ছিলাম।যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ হোল, সংসার মিথ্যা মনে হোল। তবুও পাঁচ বছর সংসারেই রয়ে গেলাম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলাম। আসামের এক জঙ্গলে পনের বছর যোগ অভ্যাস করবার পর একদিনগুরুর কৃপায় নির্বিকল্প সমাধিহোল।

যতীন রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—তারপর? তারপর আর কিছুই না। মুখে সে অবস্থার কথা বলা যায় কি? সে তুমি কি বুঝবে? এখনো তুমি ছেলেমানুষ মাত্র। বড় উচ্চ অবস্থার কথা সে সব। তুমি আর নির্গুণ ব্রহ্ম এক। মায়া তোমার স্বরূপ আবরণ করে বসেচে। তুমি কেন, পৃথিবীর সব কিছু। ছোট কেউ নও। তোমরা সবাই অজর অমর, শাশ্বত আত্মা—তুমিও এ জগতের কর্তা, এ জগৎকে সৃষ্টি করেচ—তবে ছোট হয়ে আছ কেন? এই লোকে এসেচ—এও উপাধির লোক। এর আরও ওপরে উচ্চতর লোক আছে—মহা জ্যোতির্ময় লোক, দেবদেবীরা সেখানে বাস করেন। তোমার মত লোক তার ধারণা করতে পারবে না। জগৎকে সৃষ্টি ও লয় করতে তাঁরা সমর্থ। কিন্তু সেও অনিত্য। সেও উপাধি ও স্বগুণস্তরের জগৎ। তারও ওপরে নিরুপাধি নির্গুণ ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেখানে পৌঁছুনো মানুষের আগ্রহ থাকলেই হয়। আসলে তোমার সঙ্গে তার অভিন্নতা কোথায়? এ জগতে দুঃখ নেই, পাপ নেই, শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই সে তো দেখেই নিলে, ক্ষুদ্রত্ব নেই, এসব কিছু নেই—আছে শুধু আনন্দ, অমরত্ব, বিরাটত্ব। আর তুমিই তার অধিকারী। অতএব ওঠো, জাগো—তৎ ত্বমসি—তুমিই সেই।

সন্ন্যাসীর সর্বদেহ দিয়ে একপ্রকার নীল বিদ্যুতের মত জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্চে, তাঁর দিকে চাওয়া যায় না। যতীন তাঁর পদস্পর্শ করবার জন্যে মাথা নীচু করতেই তিনি বল্লেন—উঁহু—ছোট ভেবে আমার পা ছুঁয়ে তোমার কি হবে? ছোট তুমি নও। তুমিই দেব, তুমিই দেবী, তুমিই সগুণ ঈশ্বর—তুমিই জগৎকারণ নিরুপাধি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—একই আছে, আর কিছু নেই জগতে—একম্ এব, অদ্বিতীয়—পৃথিবী বা পরলোক সব দুদিনের খেলা, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—বার বার আসাযাওয়া—সব অনিত্য—জেগে ওঠো—ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো।

সন্ন্যাসী এত জোরে জোরে কথাগুলো বললেন—যতীনের মনে হোল তার সমস্ত শরীরে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল—সন্ন্যাসীর দেহ থেকেই যেন সে বিদ্যুৎতরঙ্গ ছুটে এল তার দেহে। সে চোখের সামনে কতকগুলো গোল গোল জড়ানো জড়ানো গোলকধাঁধা খেলার মত কি দেখলে—তারপর আর তার জ্ঞান রইল না। যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সে যেন কোথায় চলেচে!

নীলআকাশ,সোম-সূর্য-তারকাচিহ্নিত—তার আশেপাশে, ঊর্ধ্বে,নামোতে। বহু দূরে নীল সমুদ্রে ডুবে একটা কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা পাক খাচ্চে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্য—কুয়াশার ঢেউ-এর মত উল্কাপিণ্ডদল বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের বহির্দেশে ভ্রাম্যমাণ—লক্ষ লক্ষ জীবজগৎ, কোটি কোটি জীবজগৎ, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি আত্মিক লোক—কত লীলা, কত খেলা, কত সুখদুঃখের অনন্ত প্রবাহ—অনন্ত জীবজগৎ...

এ সবও ছাড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় রাজ্যের প্রান্তে গিয়ে একটি অপূর্ব শান্তির অনুভূতি সে অনুভব করলে...সুগভীর আনন্দ ও শান্তি, আর যেন মন কোনো আশা নেই, কোনো তৃষ্ণা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, পাপের ভয় নেই, পুণ্যের স্পৃহা নেই,স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই, পুষ্পের প্রতি প্রেম নেই, আশালতার প্রতি অনুকম্পা নেই—মনই নেই—যেন শুধু আছে 'আমি আছি' এই অনুভূতি, আর আছে তার সঙ্গে মিশে এক অতি উচ্চস্তরের আনন্দ, শান্তি, মহা উচ্চ জ্ঞান স্বয়ম্ভূ স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের গভীর অনির্বচনীয় আনন্দ।

যতীনের মনে হোল সেই সন্ন্যাসী যেন কোথায় তার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেচেন...কখনো তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ দেখা যায়, কখনো যায় না।

তারপর সেই জ্যোতির্ময় দেশের অপূর্ব শান্তি ও আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রবেশ করলে...সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগভীর পুলকে তার মন আবার ভরে উঠলো—উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেহধারী দেবদেবীরা সে রাজ্যের মণ্ডলে বিচরণ করচেন, তাঁরা যে আসনপীঠে ঠাকুর সেজে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন তা নয়, তাঁরা যেন সে জগতের সাধারণ অধিবাসী, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই কেউ আকাশপথে বায়ুভরে চলেচেন, সমতল ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল পৃথিবীর মানুষের মত নন তাঁরা—উর্ধ্বে, নিম্নে—সবদিকে সমান গতি তাঁদের...দু'একজনকে কাছে থেকে দেখবারও অবসর সে পেলে...পৃথিবীর মানুষের মত দেহ বটে, কিন্তু যেন বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, দেবীদের মুখের সৌন্দর্য অতুলনীয়, তাদেরপৃথিবীর বাড়িতে ছেলেবেলায় একটি প্রাচীন পটুয়ার আঁকা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি ছিল দেওয়ালে টাঙানো, তার বৃদ্ধা ঠাকুরমা রোজ স্নান সেরে সেই পটের পুজো করতেন, খানিকক্ষণের জন্যে যেন পটের মুখ হাসতো—এতদিনের মধ্যে জীবনে সে সেই পটে আঁকা রাজরাজেশ্বরীর মুখশ্রীর মত সুন্দর ও কমনীয় মুখশ্রী আর দেখেনি...এখানে সে দু-একটি দেবীর মুখ যা দেখবার সুযোগ পেলে, পটের সে ছবির মুখের চেয়ে অনেক, অনেকগুণে সুশ্রী, আরও মহিমময়ী, বক্র চাহনির মধ্যে ত্রিভুবন-বিজয়ী শক্তি...অথচ মুখে অনন্ত করুণার বাণীমূর্তি...

কোথায় যেন রাশি রাশি বনপুষ্প ফুটেচে, নির্বাত ব্যোম তাদের সম্মিলিত সুবাসে ভরপুর...

এসবও ছাড়িয়ে চললো সে...মহাবিদ্যুতের মত তার গতি, কোথাও অনন্ত ব্যোমে, মহাশূন্যের সুদূরতম প্রান্তে, অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন সেখানে চারিদিকে উন্মুক্ত...দেবদেবীর বাসস্থান এ সব মহাদেশও যেন আপেক্ষিক চৈতন্যের রাজ্য; বাসনার রাজ্য...এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেখানে এক হয়ে মিলিয়ে গিয়েচে—সোম সূর্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পৌঁছেচে...এদেশ আকারধারী জীব বা দেবদেবীর রাজ্য নয়, সর্ববিধ আকার এখানে জ্যোতিতে লোপ পেয়েচে, অথচ এ জ্যোতিও দৃশ্যমান আলোকের জ্যোতি নয়, আগুন নয়, বিদ্যুৎ নয়—কি তা সে জানে না...তার সবদিকে, তাকে চারিধার থেকে ঘিরে এই জ্যোতি...আর কি একটা বিচিত্র, অনির্বচনীয় অনুভূতি...ওর মন লোপ পেয়েচে অনেকক্ষণ, চৈতন্যও যেন লোপ পেতে বসেচে...অথচ যতীনের মনে হোল এই তার আপন স্থান, এতদিনে আপন স্থানে সেফিরে এসেচে...এই তার বহুপরিচিত স্বদেশ...যুগ-যুগান্ত, কত মহাযুগ ধরে সে এখানে আবার ফেরবার অপেক্ষায় ছিল। মহাব্যোমে আর কেউ নেই, আশালতানা,পুষ্পনা, তার যতীনও না; সন্ন্যাসী না; তাদের এ লোকে বাঁধাকত সাধের ঘর বা বুড়োশিবতলার ঘাট না, দেব না, দেবী না, পরলোক না, এমন কি ঈশ্বরও না...

মহাব্যোমের মহাশূন্যঅনাদি, অনন্ত স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নির্বিকার, নির্বিকল্প সে শুধু আছে—পাপহীন, পুণ্যহীন, মঙ্গলহীন, অমঙ্গলহীন, সুখহীন,দুঃখহীন সর্বপ্রকার উপাধিহীন...

সে-ই আছে মাত্র একা।

নিঃসঙ্গ মহাব্যোমে আর কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই।

সে-ই সব।

এমন কি, এ মহাব্যোমও তার সৃষ্টি—সৃষ্টি নয়—সে নিজেই

যতীন আর কিছু জানে না।

যখন ওর চৈতন্য হোল তখন সে দেখলে সেই মহাসন্ন্যাসী পাশেই বুড়োশিবতলায় ঘাটের রাণাতে বসে আছেন— সে তাঁর এপাশে বসে।যেন সে ঘুম ভেঙে উঠেচে এইমাত্র।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—কি হোল? দেখলে?

যতীন মূঢ় ও অভিভূতের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি দেখলাম বলুন দিকি?

—আমি চললাম। যা দেখলে, দেখলে। মুখে কি বোঝাবো?মন নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয় মাত্র, ওর চেয়ে বড় অনুভূতির দরজা যেদিন খুলবে, সেদিন আমায় বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে। তোমার সে অবস্থার এখনো বহু বিলম্ব। দু-চার জন্ম হবে না। অনেকবার এখনো পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হবে।

তিনি যাবার উদ্যোগ করচেন দেখে যতীন ব্যাকুলভাবে বল্লে—প্রভু, যাবেন না, যাবেন না। পুষ্প বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন দয়া করে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—সময় হোলে দুজনেই দেখা পাবে আবার। তবে স্ত্রীলোকের পথ ভক্তির, জ্ঞানের নয়। আমি তোমাদের দুজনকেই জানি, গত তিন জন্মতোমরা আমার দেখা পেয়েচ, তোমাদের ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি হবে? সময় হয়নি। চক্রপথে ঘুরতে হবে অনেকদিন। আমি আছি তোমাদের পেছনে। নতুবা আমার দেখা পেতে না।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হোলেন।

১৩

একটু পরে পুষ্প এলবল্লে—কি করছিলে?

যতীন তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—পুষ্প, তুমি মায়া?মিথ্যে?

—সে কি যতীন-দা? ব্যাপার কি?

—এ সব ভেল্কি?তুমি বুঝিয়েচ পরলোক-টরলোক। আমরা মরে ভূত হয়ে আছি। চক্রপথে এখনো আমাদের অনেক ঘুরতেহবে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বল্লে—এ তত্ত্ব তুমি জানলে কোথায়?নতুন কথা তোমার মুখে!

—হাসি নয়। আমার মনে শান্তি নেই। এক মহাপুরুষ এসে অদ্ভুত দর্শন করিয়ে গেলেন আমার গা ছুঁয়ে। এখন বুঝেচি সব মিথ্যে।

—কিছুই বোঝোনি। বুঝতে অনেক দেরি! ভগবানের দয়া যেদিন হবে সেদিন বুঝবে এ আমি অনেকদিন জানি। কিন্তু তাতে কি? এতেই আনন্দ। যুগে যুগে আসবো যাবো, এর শোক-দুঃখেও আনন্দ খুঁজে নেবো। লীলাসঙ্গী হয়ে থাকবো তাঁর। তিনিই খেলা করচেন, খেলুড়ে না পেলে খেলা করবেন কাকে নিয়ে? সবাই ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকলে সব শূন্য, নিরাকার। তুমি নেই, আমি নেই, জগৎ নেই—ইহলোক নেই, পরলোক নেই। সত্যি কথা। কিছুই নেই—আবার সবই আছে। খেলা করো না দুদিন, যতদিন তিনি খেলাবেন।

—তারপর?

—তারপর সকলের যা গতি, তোমারও তাই। তাঁতে ভক্তি রাখো, সব হবে। তুমি তো তুমি, আমি তো আমি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি উচ্চ স্তরের আত্মা, যাঁরা দেবদেবী হয়ে গেছেন—তাঁরাও তাই। ...সব অনিত্য।

—তুমি এসব কি করে জানলে?

—করুণাদেবী সেদিন বলেচেন। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ও শেষ অবস্থার কথা। যখন সে অবস্থা আসবে, তখন আর বসে ভাবতে হবে না। তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন। এখন চলো, আশাবৌদির বড় বিপদ, কিছু করতে পারি কিনা দেখা যাক্—

যতীন ব্যস্ত হয়ে বল্লে—কি-কি-কি বিপদ? আশার? কি হয়েছে?

পুষ্প কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়লো যেন। বল্লে—ঐ! এত বাসনা এত মায়া যার মধ্যে এখনো, তিনি জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে ভগবানে মিশে যেতে চান! সন্নিসি ভেল্কি দেখালে কি হবে, ও অবস্থা তোমার-আমার জন্যে নয়। পৃথিবী ছেড়ে এসে এখনো তার বাঁধন কাটাতে পারেন না, উনি বড় বড় বুলি ঝাড়েন!

—সন্ন্যাসী তাই বলছিলেন, সময় হয়নি।

—সময় শুধু হয়নি যে তা নয়—হোতে ঢের দেরি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবে নাবলে দিচ্চি। তার লীলাসঙ্গী হয়ে থাকো, মনে মনে সর্বদা তাঁকে ভক্তি করে ডাকো। তিনিই আলো জ্বালবার কর্তা। করুণাদেবী কি কম উঁচু স্তরের জীব? কিন্তু উনি বলেন, আমি মনেপ্রাণে মেয়েমানুষ—সুখদুঃখ স্নেহ ভালবাসা নিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে চাই নে, লীলাসহচরী হয়ে থাকি তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁকে ভালবাসি মনেপ্রাণে, তাঁর জীবদের সেবা করি যুগে যুগে। এই আমার তপস্যা। মুক্তি চাইনে।

—সত্যি, এমন না হলে আর দেবী! দেবী কি—সাক্ষাৎ মা! জগতের করুণাময়ী মা। আমাকে একবার দেখা দিতে বোলো, পায়ের ধুলো নেবো—না ভুল হোলো, ধুলো আর এখানে কোথায়? তা ছাড়া ওঁদের পায়ে কি ধুলো লাগে! এত উচ্চ জ্ঞান তাঁর এ আমি জানতাম না।

—আচ্ছা আর অত বিচার করতে হবে না তোমায়। আমি বলবো তোমায় দেখা দিতে। ওঁরাই তো দেবী। পৃথিবীতে ওঁদেরই তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা হয়। ওঁরাই দুর্গা, ওঁরাই কালী, ওঁরাই সরস্বতী। নামে কি আসে যায়। অন্য দেশে হয়তো অন্য নামে পুজো করে।

—এখন কিছু কিছু বুঝচি। আগে এ সব কথাই শুনিনি কখনো পুষ্প—সত্যি বলচি।

—সময় না হোলে শুনতে পায় না কেউ। অবধূত তোমায় কি দেখালেন বলো না।

যতীন বর্ণনা করলে। বর্ণনা করবার সময় তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই অপূর্ব অনুভূতি ও পুলকের স্মৃতি এখনো ওর মনে খুব জাগ্রত—তাই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনো তার কিছুটা যেন আবার সজাগ হয়ে উঠলো মনে।

আবার সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, যেখানে সংকল্পও নেই, বিকল্পও নেই, মনের পারের সেই অনির্দেশ্য রাজ্য, ক্ষণকালের জন্যও যার মধ্যে প্রবেশের অধিকার সে পেয়েছিল মহাপুরুষ অবধূতের কৃপায়—সে জগতের বর্ণনা মুখে সে কি করে দেবে? কথা তার জড়িয়ে যেতে লাগলো, ঘনঘন রোমাঞ্চ হতে লাগলো সে অবস্থার স্মরণে। পুষ্প সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

পরে হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—তাঁর চরণে প্রণাম করো যতীনদা। বড় ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েচ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমান ওঁরা। কি পুণ্য না জানি ছিল তোমার!

দুজনে পৃথিবীতে নেমে এসেচে।

সন্ধ্যার কিছু পরে। যতীন কবি নয়, কিন্তু, পৃথিবীর এ সন্ধ্যা, কি যে ভাল লাগলো ওর! পৃথিবীতে বৈশাখ মাসের প্রথম, আম্রনিকুঞ্জের নিভৃত অন্তরালে কোকিলের ডাক, সন্ধ্যা হওয়ায় প্রস্ফুটিত বিল্বপুষ্পের ঘন সুবাস, একটি জামগাছে কচি সবুজ থোলো থোলো জাম ধরেচে, রাঘবপুরের হাট সেরে হাটুরে গোরুর গাড়ির সারি চুয়াডাঙ্গারকাঁচা সড়ক ধরে চলচে আম-কাঁঠাল বাগানের তলায় তলায়, মাঠে মাঠে আউশ ধানের ক্ষেতে সবুজ ধানের জাওলা।

আশাদের পুকুরের ধারের তেঁতুল গাছের তলায় ওরা বসলো। যতীনের মনে হোল, কি সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত! সেই বহুপরিচিত প্রিয় পৃথিবী, কত দুঃখ-সুখ, আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ভরা। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল আছে কি মন্দ আছে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এলেই মন সরে না এখান থেকে যেতে। এই বৈশাখে কচি আমের ঝোল, বেলের পানা, ঐ অদূরবর্তী চূর্ণী নদীতে এই গরমের দিনে অবগাহন স্নান, হাট থেকে পাকা তরমুজ কিনে আনা...নাঃ, পৃথিবীই ভাল। কোথায় এ সব সুখ? মাটির পথে চলার ছোটখাটো কত আনন্দ, কত স্মৃতি...হাসি অশ্রু...

পুষ্প হঠাৎ বল্লে—কি ভাবচো যতীন-দা? ব্রহ্মজ্ঞান পেতে গিয়েছিলে না?

—না পুষ্প, বড় ভাল লাগছে। অনেক দিন পরে এসে—

—পৃথিবীর বাতাসে বাসনা-কামনা ভাসচে, এজন্য বড় বড় আত্মারা পৃথিবীতে আসতে চান না। ছেলেবেলায় যাত্রা হয়েছিল, একটা গান শুনেছিলে নৈহাটিতে? ‘এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে’—পৃথিবীতে ফিরে এসে বেশিক্ষণ এই জন্যে থাকতে নেই। ঐ ছোটখাটো সুখদুঃখের সোনার শেকলে বাঁধা পড়তে সাধ যায়। ‘পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে’—তুমি তো তুমি!

—যা বলেচ পুষ্প, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো—

—সত্যি যতীন-দা। আমার কি ইচ্ছে হয় না? এখনই হচ্চে। বড় বড় আত্মা পর্যন্ত অনেক সময় পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে পুনর্জন্ম গ্রহণের কামনা করেন। নিম্নস্তরের দুর্বল আত্মার তো কথাই নেই। খুঁৎ খুঁৎ করে পৃথিবীর কাছাকাছি ঘোরে। নয়তো ফট করে আবার জন্ম নিয়ে বসে। তাদের ঘন ঘন পৃথিবীতে আসা বারণ!

যতীন হেসে বল্লে—যেমন আমি—

—তুমি কেন, অনেক মহারথীর এই দশা হয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে মানুষ এগিয়ে চলবে কবে? ভগবানের তা ইচ্ছে নয়, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকলে চলবে না। পথ অফুরন্ত, পথের পাশে ফুলের সুগন্ধে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়তে ভাল লাগে বটে কিন্তু তা আমাদের গতি আটকে দেবে। অভীঃ, ভয় নেই—এগিয়ে চলো, অভীঃ—

—ওঃ, তুমি এত কথা জানলে কবে পুষ্প?

—করুণাদেবীর সঙ্গে কি এমনি এমনি বেড়াই! তা ছাড়া আমি তোমার কত আগে এখানে এসেচি জানো তো? দয়া করে ওঁরা আমায় শিখিয়েছেন। ভগবানের মহাশক্তিই এগিয়ে নিয়ে চলেচে সবাইকে—

হঠাৎ পুষ্প পুকুরপাড়ের ওদিকে চেয়ে বল্লে—ঐ দ্যাখো যতীন-দা—

যতীন চেয়ে দেখলে পুকুরপাড়ের আমবাগানের তলায় চুপি চুপি চোরের মত একটি লোক এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই ওদের বাড়ির খিড়কিদোর খুলে আশা বের হয়ে এল এবং গাছতলায় লোকটির সঙ্গে যোগ দিলে। যতীন সর্বশরীরে কেমন একটা জ্বালা অনুভব করলে। সংস্কারের প্রভাব, জ্বালা তো দেহের নয়, আসলে মনের।

সে আপন মনে বলে উঠলো—যদু মুখুয্যের ছেলে নেত্যনারায়ণ—

পুষ্প বল্লে—চেন ওকে?

—কেন চিনবো না? শ্বশুরবাড়ির এ পাড়াতেই ওদের বাড়ি, ও কলকাতায় কি চাকরি করতো জানি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল তাও জানি। আশা বলতো প্রায়ই, আমাদের গাঁয়ের নেত্যদা। এবার বি-এ পাশ দেবে। উঃ, আশা যে এতদূর নেমে যাবে—! এখনো আমি দুবছর মরিনি—এর মধ্যেই—পাপীয়সী!

—যাত্রাদলের ভীমের মত কথা শুরু করে দিলে যে যতীন-দা! আশা-বৌদির বয়সের কথা ভেবো। জড়দেহ থাকলেই তার কামনা বাসনা আছে। বড় বড় হাতি তলিয়ে যাচ্ছে তো মূর্খ আশা-বৌদি!

যতীন বিরক্ত হয়ে বল্লে—লেকচার রাখো। এই দেখাতে নিয়ে এলে! উঃ, ইচ্ছে হচ্ছে ছোকরার ঘাড়টা মট্‌কাই—পারি কই? হাত পা যে হাওয়া!

অত অধৈর্য হয়ো না। খুন করবার প্রবৃত্তি জাগলো কেন? একটা কিছু করতে হবে। সে কিন্তু ওভাবে নয়। একটা ছোকরাকে মারলে আরও অনেক ছোকরা জুটবে। মন নীচু দিকে নামলে জলের মত গড়িয়েই চলে। আশা-বৌদির অদৃষ্ট ভাল না। এখনো অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে ওর ভাগ্যে, তুমি আমি কি করবো? কর্মফল ওর। বেচারী! এখন ওরা যা করচে, তাতে বাধা দিতে তুমি আমি কেউ নই! মানুষ স্বাধীন, সে পুতুলখেলার পুতুল নয়। বাসনানদী পাপের পথেও বয়, পুণ্যের পথেও বয়। চলো, এক কাজ করি।

যতীন কিন্তু এগিয়ে গেল পুকুরের ওপাড়ের দিকে। আশার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, হাতে ক'গাছা সোনার চুড়ি, যতীন চিনতে পারলে তাদের গ্রামের মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে বিয়ের পরের বছর গড়া। আশা বসে পড়েচে গাছের গুঁড়ির আড়ালে, নেত্যনারাণ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

আশা বলচে—বাড়ি করে দিলে গাঁয়ের লোক যদি কিছু বলে?

নেত্য হাত নেড়ে বল্লে—থোড়াই কেয়ার। এ শর্মা আর কাউকে ভয় করে না। তুমি ঠিক থাকলেই হোল। তুমি বলবে, বাপের বাড়ির সংসার আর দুদিন পরে ভাই-এদের সংসার হবে। আমার শ্বশুরবাড়ির টাকায় আমি বাড়ি করচি। মিটে গেল, কার কি বলবার আছে?

—ও জমিটা তা হোলে কিনতে হবে তো?

—সে লেখাপড়া আমি করে দেবো। বেশ হবে, ইটের দেওয়াল আর খড়ের চালা করে দিই। তুমি ওখানে চলে যাও।পাড়ার বাইরে ঘর হবে, একটু বেশি রাত করে চলে যাবো, শেষ রাতে উঠে চলে আসবো।এমন বনে-জঙ্গলে ভয়ে ভয়ে আর দেখা করতে হবে না। সারারাত্রি মজা করো, কি বলো?

—তুমি যা বোঝো। আমার কিন্তু হাতে মাত্র পঞ্চাশটি জমানো টাকা আছে, আর কিছু নেই বলে দিচ্চি—দু-এক কুঁচো গহনা-ভাঙা সোনা হয়তো আছে। বাড়ি করবার খরচ কিন্তু তোমায় দিতে হবে।

নেত্য হাসিমুখে বল্লে—দেখি মুখখানা? ও মুখ দেখে বাড়ি তো বাড়ি, পয়সা থাকলে মটোর গাড়ি কিনে দিতে পারতাম। কিন্তু বলে দিচ্চি, ও শম্ভু চক্কত্তিটার সঙ্গে আর কথা বলতেও পাবে না কোনো দিন।

আশা হেসে বল্লে—আহা! শম্ভুদা'র ওপর তোমার অত হিংসে কেন? আমি কবে কি করচি তার সঙ্গে? সে আসে যায়, পাশের বাড়ির ছেলে, তাড়িয়ে তো দিতে পারিনে?

—আচ্ছা, ভাল কথা। নিজের বাড়ি হোলে সে তো আর পাশের বাড়ির ছেলে থাকবে না, তখন নতুন বাড়িতে না ঢোকে যেন।

আশা একটু ভেবে বল্লে—হ্যাঁগো, এতে গাঁয়ে কোনো কথা উঠবে না তো? আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি বলো। তুমি রাগ কোরো না—আমার ভয় করে।

—কোনো ভয় নেই। নেত্য মুখুয্যে যে কাজে হাত দেবে, তাতে কিছু গোলমাল হবে না। কিছু ভেবো না।

কথা শেষ করে নেত্য আশার পাশে বসে পড়ে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—আমায় ভালবাসো আশা?

আশা এদিক ওদিক চেয়ে মৃদুস্বরে বললে—নিশ্চয়ই।

—সত্যি বলচো?

—কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

—তোমাদের যে মতিস্থির নেই কিনা, তাই বলচি। কাল সারাদুপুর শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে গল্প করেচ।

—আহা! মা সেখানে সব সময়ে বসে। শম্ভুদা একটা কবিতার বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

—কি কবিতা?

—তা জানি নে। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভাবো কেন? আমার একটা উপায় যেখানে হয়, সেখানেই আমি থাকবো। মা বুড়ো হয়েছেন, আমার নিজের হাতে সম্বল নেই। ভাইবৌরা এসে যদি জ্বালা দেয়, দুকথা শোনায়, সে সংসারে থাকা আমার পোষাবে না। যদি অদৃষ্টই মন্দ না হবে, তবে এত শীগ্‌গির কপাল পুড়বে কেন আমার?

আশা মুখ নীচু করে আঁচলে চোখের জল মুছলে। যতীনের মন করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠলো ওর ওপরে—তাহলে জীবনের এসব সঙ্কটময় মুহূর্তেও আশা তার কথা মনে করে! এখনো তাকে সে ভোলেনি! পুষ্প ওর পাশে এসে মৃদুস্বরে বল্লে—চলে এসো যতীনদা, এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না।

গভীর রাত্রি।

আশা তাদের বাড়ির ছোট্ট ঘরে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়ে মেজেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরমের দরুন শিয়রের জানালাটা খোলা। পুকুরপাড়ের অভিসার থেকে ফিরে সে দুটি মুড়ি খেয়ে শয্যা আশ্রয় করেচে। গরিবের ঘরের বিধবা, রাত্রে লুচি পরোটা জোটে না।

যতীন বল্লে—আহা, কি খেলে দেখলে তো পুষ্প? পেট পুরে খেতেও পায় না।

—তা তো হোল, কিন্তু এখনো ঘুমোয়নি ভাল। গরমে ঘুমুতে পারচে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন সামনে যেও না। এই রকম আধ-তন্দ্রা অবস্থায় তোমাকে ও দেখতে পেতে পারে। তোমার দেহও এখনো তেমন সূক্ষ্ম হয়নি। তাতে ফল হবে উল্টো। ও আঁক-পাঁক করে উঠবে ভূত দেখচে বলে, সেবারে সেই জানো তো?

যতীন বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালো। যতীনের বৃদ্ধা শাশুড়ি পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। যতীনের মনে পড়লো, আশার সঙ্গে প্রথম বিয়ের পরে এই ঘরে তাদের বাসর হয়। তারপরে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়িতে এসে সে এই ঘরে নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেচে। কোথায় গেল সে সব দিন! তার ইচ্ছে নেই অন্য কোথাও যাবার। আশা বিপন্না, সে এখানে আশার কাছেই থাকবে। স্বর্গ-টর্গ তার জন্যে নয়। ঐ সেই কুলুঙ্গি, আশার জন্যে এক শিশি গন্ধতেল কিনে এনেছিল একবার, ঐ কুলুঙ্গিটাতে থাকত, দুজনে মাখতো। তার মাথায় জোর করে বেশি তেল ঢেলে দিয়ে আশা নিজের হাতে মাখিয়ে দিত। কাড়াকাড়ি করে মাখতো দুজনে।

সেই আশা কেন এমন হয়ে গেল?

পুষ্প এসে বল্লে—এসো যতীন-দা। আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়েচে।

আশা খানিকক্ষণ আগে ঘুমিয়েচে। ময়লা বালিশটা মাথায় দিয়ে ছেড়া মাদুরে শরীর এলিয়ে দিয়েচে। যতীনের মন করুণায় ভরে উঠলো। মেয়েমানুষ অসহায়, ওদের কি দোষ। সংসারে বহুলোক ওৎ পেতে আছে ওদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে। একটু আশ্রয়ের আশায় ওরা না বুঝে না ভেবে দেখে সে পথে ছোটে। যতীন কাছে গিয়ে ডাকলে—আশা?

পুষ্প বল্লে—দাঁড়াও, শুধু ডাকলে হবে না, লেক্‌চারের কাজ নয়। ওর মনে তোমাদেরকোনো একটা সুখের রাত্রির ছবি আঁকো। যেমন ধরো তোমাদের ফুলশয্যার রাত্রি, তোমাদের গাঁয়ের ভিটেতে।

—সে কি করে করব?

—সেদিনের কথা একমনে চিন্তা করো—

একটু পরে আশার সূক্ষ্ম শরীর ওর দেহ থেকে বের হয়ে মূঢ়, অভিভূতের মত চারিদিকে চাইলে। কিন্তু পুষ্প দেখেই বুঝলে সে দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের ঊর্ধ্বের অতি নিম্নস্তরেও নিজের চৈতন্য পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ।

পুষ্প বল্লে—ওকে ছবি দেখাও যতীন-দা—

—ছবি দেখবে কে? ওর তো এ লোকে জ্ঞান নেই দেখচি—

—ছবি দেখাও, তা হোলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে—

—ফুলশয্যার রাত্তিরের!

—বা যে কোনো একটা সুখের দিনের। পারবে তো? আমার দ্বারা তো হবে না। তোমার নিজের ছবি তোমাকে দেখাতে হবে।

যতীন একমনে ভেবে সত্যিই একটা ছবি তৈরি করতে সমর্থ হোল। এ স্তরে চিন্তার শক্তি ক্ষণস্থায়ী আকার নির্মাণ করতে সমর্থ—একটা পুরোনো কোঠার ঘর আশাকে এবং ওদের সকলকেই যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। কাঁঠাল-কাঠের পুরোনো তক্তপোশে লেপ তোশক পাতা বিছানা যতীনের পৈতৃক, জানালার বাইরে মনসাতলার আমগাছটা, ঘরে জলচৌকির ওপর ঝক্‌ঝকে পুরোনো পেতল কাঁসা, যতীনের মায়ের হাতে মাজা। যতীনের শোবার সেই ঘরটি এমন বাস্তব হয়ে উঠলো যে আশার ঘরবাড়ি মিলিয়ে গেল। যতীনও যেন অবাক হয়ে গেল তার চিন্তাশক্তির কার্য দেখে। আশা তার শ্বশুরবাড়ির ঘরটাতে শুয়ে আছ—প্রায় নিখুঁত শ্বশুরবাড়ির ঘর, দেওয়ালে টাঙানো কাঠের আর্শিটা পর্যন্ত। আশার সূক্ষ্ম দেহ তখনো অর্ধ-অচেতন। যতীন স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যেন ঘুম ভেঙে উঠে চারিদিকে চাইলে এবং কি দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। যতীন আবার ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যতীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

—আশা, ভাল আছ?

পুষ্প বল্লে—অমন ধরনের কথা বোলো না। ছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুরোনো দিনের মত কথা বলো।

যতীন বল্লে—আশা, কাল সকালেই উঠে কাপাসডাঙায় যাবো কাজে। ভোরে একটু চা করে দিতে পারবে?

আশা উত্তর দিলে—খুব ভোরে যাবে? কত ভোরে?

—সাতটার মধ্যে।

আশার চোখের মূঢ় দৃষ্টি তখনো কাটেনি। সে বল্লে—আমি কোথায়?

যতীন বল্লে—কেন, তোমার শ্বশুরবাড়িতে—চিনতে পারছো না? কি হয়েচে তোমার? চা দেবে করে?

—হ্যাঁ।

—খাবার দেবে না?

—কি খাবে? চিঁড়ে দিয়ে ঘোল দিয়ে খেও এখন।

একদিন আশা সত্যিই এই কথা বলেছিল। যতীনের চোখে জল এল আবেগে। সে আবার তার পুরোনো পৈতৃক বাড়ির বিস্মৃত দিনে ফিরে গিয়েচে নববিবাহিতা আশারপাশে। যতীনের অনুভূতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তার তৈরি ছবি আরও স্পষ্ট নিখুঁত হয়ে উঠলো। আশা এবার আরও সজাগ হয়ে উঠে চারিদিকে চাইলে, কিন্তু তার বিস্ময়ের দৃষ্টি এখনো কাটেনি।

যতীন বল্লে—তাহলে তাই। আমায় তুমি ভালবাসো আশা?

কথা বলেই নেত্য মুখুয্যের মত সে আশার হাতখানা নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রাখলে। তারপর পেছনে চেয়ে দেখলে পুষ্প সেখানে নেই। মেয়েমানুষ, যত উচ্চস্তরের হোক না কেন, প্রেমাস্পদ অন্যকে ভালবাসচে, এতে মন স্থির রাখতে পারে না।

আশা বল্লে—হ্যাঁগা, তুমি কখন এলে?

—কোথা থেকে আসবো?

—যেন তুমি অনেকদিন বাড়ি ছিলে না!

—নিশ্চয়ই ছিলাম। কোথায় আমি যাবো? খেপলে নাকি আশা?

আশা প্রবোধপ্রাপ্ত ছোট মেয়ের সুরে বল্লে—যাওনি তাহলে।

—না আশা—কোথায় যাবো?

—আমার জন্যে একজোড়া শাড়ি এনে দিও কাল। আটপৌড়ে শাড়ি নেই।

—ক'হাত?

—এগারো হাত দিও, দশহাতে ঘোমটা দিতে পারিনে মার সামনে, লজ্জা করে।

—বেশ।

তারপর আশা ভেবে ভেবে বল্লে—আচ্ছা, আমার কি একটা হয়েছিল বলো তো, কিছুতেই যেন মনে নিয়ে আসতে পারচি নে।

—কি আবার হবে, কিছুই না।

—ও! তবে বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। না?

—তাই হবে। লক্ষ্মীটি, ও সব ভাবতে নেই। তুমি আমায় ভালবাসো?

আশা সলজ্জ সুরে বল্লে—হুঁ-উ—

যতীন ভাবলে, কোন্ জগৎ সত্য? এই ছবিতে গড়া স্বপ্নের জগৎ, না বাস্তব জগৎ? না কি সবই স্বপ্ন?সেদিন সেই অবধূত যা বলে গিয়েছিল। জগৎটাই জাগ্রত স্বপ্ন ছাড়া আর কি? কোথাকার আশা, কি সে দেখচে, কে তাকে কি ভাবাচ্চে। অথচ আশা ভাবচে এই বুঝি সত্য। ভগবান কি জীবকে ছবি দেখাচ্ছেন না তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে দিয়ে, যেমন সে এখন দেখাচ্ছে আশাকে?

সে সস্নেহ সুরে বল্লে—তা হলে তুমি ঘুমিয়ে পড় আশা, রাত হয়েচে—

—আজ বড্ড গরম, না? ঘুম হচ্ছে না। একটা মশারি এনে দিও—বড্ড মশা—

—তা হবে। সকালে সকালে উঠে চা করে দিও তাহলে?

—আচ্ছা।

পুষ্প বাইরে থেকে বল্লে—চলো, যতীন-দা একদিনে ওর বেশি আর কিছু তুমি করতে পার না।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে আশার ঘুমও ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে দেখলে। এ কোথায় সে আছে? এমন স্পষ্ট স্বপ্ন সে আর কখনো দেখেনি। কতদিন পরে সে তার স্বামীকে এত স্পষ্ট ভাবে দেখেচে, এইমাত্র যেন তিনি পাশে বসে ছিলেন। কতক্ষণ স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। সব কথা তার মনে নেই, এইটুকু মনে আছে, তিনি যেন বলচেন—একটু চা করে দিতে পারো? চা খাবো—

সেই পুরোনো হাসি, পুরোনো আমলের স্নেহদৃষ্টি স্বামীর চোখে। আশা উদ্‌ভ্রান্তের মত জানালার বাইরে চেয়ে রইল। কোথায় আজ সেই স্বামী, কোথায় তার সেই শ্বশুরবাড়ি! নিজের প্রতি করুণায় তার মন ভরে গেল, চোখে জল এল।

১৪

সেদিন পুষ্প বল্লে—যতীন-দা, মন খারাপ করে বসে আছ নাকি? চলো করুণাদেবীর কাছে যাবে।

—আমি সেখানে যেতে পারবো না। অত উঁচুতে উঠলে আমার চৈতন্য থাকে না জানো—সব সময় তাঁকে দেখতেও পাইনে। কি করবো বলো। তা ছাড়া, আমার অন্য অনেক রকম ভাবনা—

—ভাবনা তো জানি। ও ভেবে কোনো লাভ আছে? যার যেমন অদৃষ্টে আছে, তেমনি হবে। চেষ্টা তো করলে অনেক। ওর কর্ম্মফল ওকে ওই পথে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি আমি কি করবো বলো।

আরও কয়েক মাস কেটে গিয়েচে। আশালতার মনের অবস্থা দিনকয়েকের জন্যে একটু ভাল হয়েছিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল তাতে হয়নি। নেত্য তাকে গ্রামের প্রান্তে আলাদা বাড়ি করেও দেয়নি। ভুলিয়ে তার কতকগুলো সোনার গহনা হাত করে সেই টাকায় ওকে কলকাতায় এনে রেখেচে। যতীন রোজ সেখানে যায় রাত্রে, একটা লম্বা ব্যারাকমত পুরোনো বাড়ির একটা ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে আশা বসে রাঁধে, এখানে সে পাশের ভাড়াটেদের সামনে সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্যে বিধবার বেশ ঘুচিয়ে নেত্যর স্ত্রী সেজেচে, হাতে চুড়ি পরে, কপালে সিঁদুর দেয়। প্রথমে যেদিন নেত্যই তার কাছে এ প্রস্তাব করে যতীন সেখানে উপস্থিত ছিল।

নেত্য বল্লে—রাস্তা থেকেই তোমাকে এটি করতে হবে আশা। যেখানে যাবে, সেখানে আশপাশের ঘরে অনেক ফ্যামিলি বাস করে। তাদের সামনে কি বলে দাঁড়াবে, কি পরিচয় দেবে? বাড়িওয়ালাই বা জায়গা দেবে কেন?

আশা বল্লে—সে আমি পারবো না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে আবার পেড়ে কাপড় পরবো, সিঁদুর পরবো—এ হবে না আমায় দিয়ে নেত্য-দা—

নেত্য শ্লেষের সুরে বল্লে—নাও নাও আর ন্যাকামি করতে হবে না! ব্রাহ্মণেরবিধবার তো সব রাখলে, এখন যার সঙ্গে বেরিয়ে এলে তার কথামত চলো।

আশা বিস্ময়ের সুরে বল্লে—বেরিয়ে এলাম!

—আহা-হা নেকু! বেরিয়ে আসার কি হাতিঘোড়া আছে না কি? আবার তুমি ঘরে ফিরে যাও তো মানিক। এতক্ষণ গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েচে দ্যাখো গে যাও—

—বা-রে, তুমি বল্লে আমাকে কলকাতায় আলাদা বাসা করে দেবে। আমি আমার গহনা বিক্রি করে চালাবো—তারপর মাকে সেখানে নিয়ে এসে রাখা হবে। বলো নি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এখনো তো তাই বলচি, বলচি নে? আমার হাত ধরে যে-মাত্তর বাড়ির বাইরে পা দিয়েচ, সেই মাত্তরেই তুমি বেরিয়ে এসেচ। ওকেই বলে বেরিয়ে আসা। এখন আর ফেরবার পথ নেই—যা বলি, সেই রকমই করো। তোমার ভালরজন্যেই তো বলচি। দেখো কত সুবিধে হবে, কলকাতায় বড় বড় লোকের সঙ্গেআলাপ হবে। আখেরে ভাল হয় কিনা দেখে নিও।

যতীন সেদিন ফিরে এসে পুষ্পকে সব বলেছিল। পুষ্প বলে—আশাদি বড় নির্বোধ, নেত্য লোকটা ওকে ভুলিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাচ্চে। কিন্তু কিছু করবার নেই।

—কেন পুষ্প? এক অবলা মেয়েকে সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাতে পারো না তোমরা।

—কই পারি। যে যার কর্মফলের পথে চলে, কে কাকে সামলায়?

এরপর প্রায় তিন মাস কেটেচে। আশা ও নেত্য বাসাবাড়িতে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসে স্বামী-স্ত্রীর মত সংসার করেচে। নেত্য বাজার করে নিয়ে আসে, আশার সামনে বসে গল্প করে, দুবার সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েচে, একবার পাশের ঘরের ভাড়াটেদের সঙ্গে আশা কালীঘাটেও ঘুরে এসেচে।

পুষ্প কত চেষ্টা করেচে যতীনকে ওখান থেকে আনবার। কিন্তু যতীন শোনে না, পুষ্পকে লুকিয়ে সে আজকাল প্রায়ই আশার বাসায় যায়। একদিন রাত্রে একটা স্বপ্নও দেখিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পের সাহায্য না পাওয়ায় সে স্বপ্ন হয় বড় অস্পষ্ট, তাতে ঘুম ভেঙে উঠে আশা সারা সকালটা মন ভার করে থেকে নেত্যর কাছে বকুনি খায়।

পুষ্প বল্লে—চলো আজ করুণাদেবীর কাছে গিয়ে বলি—

—এইখানেই তাঁকে আনো। আমি কোথাও যাবো না।

—পৃথিবীর মধ্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এই রকম?

—কি করি বলো। আমরা তো খুব উঁচুদরের মানুষ নই তোমাদের মত, এই আমাদের পরিণাম। কর্মফল!

যতীনের ঠেস দেওয়া কথায় পুষ্প মনে আঘাত পেলেও মুখে কিছু বল্লে না। সে বেশ বুঝেছে যতীনদাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত না করলে ওর উন্নতি হবে না। যতদিন আশা বাঁচবে, তার পেছনে অস্থানে কুস্থানে ও ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো সুবিধে হবে না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আশাদের বাসায়। আশার গ্রামের শম্ভুচক্কত্তি বলে সেই ছেলেটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আশার সন্ধান পেয়ে সেখানে এল। আশা তখন রান্না করচে। শম্ভুকে ঢুকতে দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। শম্ভু এসে বল্লে—কি আশাদি, চিনতে পারো?

আশা শুক্‌নো মুখে ভয়ের সুরে বল্লে—এসো বোসো শম্ভুদা—কি করে চিনলে ঠিকানা?

—নেত্য স্কাউন্ড্রেলটা কোথায়? আমি একবার তাকে দেখে নিতাম। তারপর, কি মনে করে এখানে এসে আছ?

—কারু দোষ নেই শম্ভুদা, আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেচি।

—গাঁয়ে কি রকম হৈ চৈ পড়ে গিয়েচে তুমি জানো না। কেন তুমি এরকম করে এলে? কতদূর খারাপ করেচ তা তুমি বুঝেচ?

—গাঁয়ে থেকেই বা কি করতাম শম্ভুদা। এ বেশ আছি। আমাদের মত মানুষের আবার গাঁ আর অগাঁ কি?কি ছিল জীবনে? মা মরলে কোথায় দাঁড়াতাম? এখানে খারাপ নেই কিছু। ফিরে যখন যেতে পারবো না, তখন সেকথা ভেবে আর কি হবে!

—আমি তোমাকে বোনের মত ভালবাসি আশা, চল্ তোকে এখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেবো।

আশা কি একটা জবাব দিতে যাচ্চে এমন সময়ে নেত্য এসে হাজির। শম্ভুকে ওখানে দেখে সে খুব চটে গেল মনে মনে, তখন কিছু বল্লে না, কিন্তু তারপর আশাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও অপমান করলে। তার ধারণা আশাই শম্ভুকে লুকিয়ে খবর দিয়ে এনেছিল।

যতীন সব দেখলে দাঁড়িয়ে। আজকাল সে সন্দেহ করে এই নেত্যর জন্যেই আশা শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইত না।পুষ্প সব জানে কিন্তু তাকে কখনো কিছু বলেনি। তবুও রাগ হয় না আশার ওপর—গভীর একটা অনুকম্পা, সে দ্বিতীয় স্তরের প্রেত যদি হোত, তবে নেত্যকে একদিন এমন বিভীষিকা দেখাতো যে মরে কাঠ হয়ে যেতো নেত্য, কেমন নেত্য সে দেখে নিত!

করুণাদেবীর কাছে এইজন্যেই সে গেল পুষ্পকে নিয়ে। একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মত স্থান অসীম ব্যোমসমুদ্রে, চারিদিকে উপবন, কুসুমিত বন্যলতা, কিছুদূরে একটা ঝরণা পড়চে পাহাড়ের মাথা থেকে। বনানীর জন্য সৌন্দর্য ও উপবনের শোভা এক হয়ে মিলেচে। একটা প্রাচীন বৃক্ষতলে ঝরা পাতার রাশির ওপর দেবী এলিয়ে শুয়ে পড়েচেন। কেউ কোথাও নেই, শূন্য দ্বীপ, শুন্য ব্যোমতল। দেবীর অপরূপ রূপে সেই প্রাচীন বনস্থলী উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। যতীন ভাবলে, এই তো স্বর্গ। এই সৌন্দর্য দিয়ে গড়া যে ছবি তা স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন বনবনানীর সমাবেশ কই, যদি বা থাকে এমন রূপসী মেয়ে কই, তাও যদি থাকে, এত নির্জনতা কই—যদি বা থাকে, এ-তিনের অদ্ভুত সমাবেশ কোথায়? দেবীর মাথায় কি এই তৈরি হয়েচে? হয়তো তাই। এতটুকু একটা গ্রহ বা উপগ্রহ, শুধু বনবনানীতে ঘেরা, সেখানে আবার অন্য কেউনেই উনি ছাড়া, আবার দিব্যি পাখির ডাকও আছে। করুণাদেবীর মুখশ্রী কি সুন্দর! আর কি সহানুভূতি ও করুণায় ঈষৎ বিষাদমাখা! মাতৃমূর্তির এমন অপূর্ব মহিমময় জীবন্ত আলেখ্য তার সামনে থাকতেও যদি সে ঈশ্বরের দয়ায় কি দেবদেবীতে বিশ্বাস না করে, তবে সে নিতান্ত নির্বোধ। শুধু পুষ্পের জন্যই সে এখানে আসতে পারচে বা দেবীকে দেখতে পাচ্চে—নইলে ওঁর দর্শন পাওয়া তার পক্ষে কি সহজ হোত?

যতীনের বক্তব্য পুষ্পই বল্লে। আশাবৌদি কলকাতার বাসাবাড়িতে কাল রাত্রে মার পর্যন্ত খেয়েচে—সারারাত কেঁদেচে, যতীনের মনে বড় কষ্ট। এই আকর্ষণ তাকে সর্বদা পৃথিবীতে টানচে, এখন কি করা যায়?

করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—এতে কিছু করবার নেই। কন্যা যতদিন ঠেকে না শিখবে, তার জ্ঞান হবে না।

যতীন ভাবলে—এ কি হোল! এত বড় দেবীর মুখে এ কি সাধারণ পৃথিবীর মানুষের মত কথাবার্তা! এ কথা তো পৃথিবীতে যে কোন জমিদারগিন্নি কি দারোগা ইন্সপেক্টরের বৌ শুনেই বলতো।

সে বল্লে—আপনি মনে করলে কি ওকে দয়া করতে পারেন না?

করুণাদেবী হেসে বল্লে—আমি খেটেই মরি, ভেবেই মরি। দয়া কি করতে পারি সে ভাবে বাছা? এদের যেদিন ভাল হবে, সেদিন আমারও ছুটি। এ সব অতি নিম্নদরের আত্মা, কেউ ওদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্চে না, নিজের কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান প্রত্যেক লোককে বড় দেখতে চান, সৎ, সুন্দর, নির্মল দেখতে চান, উচ্চ প্রকৃতি জাগলো কিনা দেখতে চান—যেমন ধরো সেবা, স্বার্থত্যাগ, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা। এ যাদের মধ্যে নেই বা জাগেনি, তাদের সেগুলো জাগিয়ে দেবার কৌশল তার জানা আছে। কষ্ট দিয়ে, শোকের বোঝা রোগের বোঝা দিয়ে যে করেই হোক ও-লোকে কি এ-লোকে তার চোখ ফোটানোর চেষ্টা হয়ই, তাও যাদের না হয়, অন্য গ্রহে তাদের জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যে গ্রহ পৃথিবীর চেয়েও ধীর গতিতে চলে। যেখানে লোকে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে সব জিনিস শেখে। জড়বুদ্ধি জীবেরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে না—সেটা তাদের উপযুক্ত পাঠশালা। এ লোকেও নরকের মত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আছে, অতি নিম্নস্তরের পাপী জীবেরা সেখানে ঠেকে শিখে মানুষ হচ্চে। এ একটা মস্ত বড় বিদ্যালয়। দেখতে চাও? একবার নিয়ে যাবো—

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আশা বৌদির কি হবে বলুন—

—আমিও দেখি একটু ভেবে, দাঁড়াও।

পরে তিনি চোখ বুজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। চোখ চেয়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এখনো তিন জন্ম। ওর হৃদয়ে প্রেম নেই। সব স্বার্থ। যে কোনো লোককে ভালবাসলেও তো বুঝতাম। এখন যার সঙ্গে আছে,

তাকেও তেমন ভালবাসে না। সাংসারিক স্বার্থ। বুড়ো মার সেবা না করে ছেড়ে এসেচে। যতীনের মনে ভালবাসা আছে, তাই সেখানে যায়। কিন্তু ওর স্ত্রীর কোনো উপকার আপাতত কিছু হবে না।

যতীন বল্লে—ওর জন্যে মন বড় খারাপ, ওর কষ্ট দেখে—

—তুমি যাকে ভাবচো কষ্ট বা পাপ, ও তাকে ভাবচে সুখ, সাংসারিক সুবিধা। ও যেদিন পাপ ভেবে ত্যাগ করবে, সেদিনই না ওর উন্নতি। তোমার ভাবনায় কি হবে?

—আমি কি ওর কোনো উপকার করতে পারিনে? আপনি যদি দয়া করে ওকে পাপী ভেবে ওকে সাহায্য করেন—

—পাপ বলে যে না বুঝেচে, অনুতাপ যার না হয়েচে, পাপকেই যে আনন্দের পথ বলে ভাবচে, যার মনে ত্যাগ নেই, কর্তব্যবুদ্ধি নেই, কোনো উঁচু ভাব নেই—আনবার চেষ্টাও নেই—তাকে শুধু দয়া করলেই ভাল করা যাবে না। ওর ভার আছে যাঁদের হাতে তাঁরা অসীম জ্ঞানের প্রভাবে জানেন, এইসব নিম্নশ্রেণীর মনকে কি ভাবে সংশোধন করতে হয়। সেই পথ দিয়ে ওরা উঠবে। কোনো আত্মার প্রভাব ওর মনে রেখাপাত করবে না।

পুষ্প বল্লে—যদি আমরা রোজ ওর মনে ভাল ভাব দেবার চেষ্টা করি?

—ঊষর মরুভূমিতে বীজ বুনলে কি হয়?যে চায়, সে পায়। যে কেঁদে বলে, ভগবান আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথ দেখিয়ে দাও, সে পাপপুণ্য বুঝেচে। তখন তাকে আমরা সাহায্য করতে ছুটে যাই। যে যা চায়, সে তা পায়। যে জ্ঞান চায় তাকে জ্ঞানের পথ দেওয়া হয়। যে ভগবানের প্রতি ভক্তি চায়, তাকে সাধুজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার করে দেওয়া হয়।

—যে বলে আমি ভগবানকে দেখবো।

—ভগবান তাঁকে দেখা দেন।

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—তিনি দেখা দেন?

—অবিশ্বাস করবার কি আছে বলো। সে যে-ভাবে চায় সেই রূপ ধরে তাকে দেখা দেন। ভগবানের বিরাট রূপের ধারণা কে করতে পারে। ইষ্ট মূর্তিতে দেখতে চায়, যার যা ইষ্ট, যে রূপ যে ভালবাসে, তাকে তিনি সেইরূপেই দেখা দেন। তিনি করুণার সাগর, কত বড় করুণা তাঁর—তা তুমি জানো না, বুঝতেও পারবে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য হয়ে ক্ষুদ্র সম্বন্ধ পাতিয়ে মা, ভাই, বোন, সন্তান, বন্ধু সেজে দেখা দেন।

—আমার প্রতি একটা আদেশ করুন দেবী, আপনার কাছে এসেচি অনেক আশা নিয়ে, শুধু হাতে ফিরে যাবো?

—আমি যা করতে পারি, এখন তা করবো না। সময় বুঝলে পৃথিবীর যে কোনো ভ্রান্ত ছেলেমেয়ের সাহায্যে আমিই সকলের আগে ছুটে যাবো, বাছা। আশালতার কথা আমার মনে রইল। কিন্তু এখনো অনেক বাকি, অনেক দেরি, যতদূর বুঝচি। তুমি পৃথিবীতে বেশি যাতায়াত কোরো না। পৃথিবীতে গেলে এমন সব বাসনা কামনা জাগবে যা তোমাকে কষ্ট দেবে শুধু—কারণ পৃথিবীর মানুষের মত দেহ না থাকলে সে সব বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন হয়তো তোমার ইচ্ছে হবে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিই। প্রবল ইচ্ছাই তোমাকে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করাবে। অথচ এখন পুনর্জন্ম নিয়ে কিকরবে? গত জন্মে যা করে এসেচ তাই আবার করবে। সেই একই খেলা আবার খেলবে। তাতে তোমার উন্নতি হবে না। অথচ যার জন্যে করতে যাচ্চ, তারও কিছু করতে পারবে না। কারণ ওসব ভালমন্দ করবার কর্তা তুমি নও। যে যার পথে চলেচে, তোমার পথ তোমার, তার পথ তার। পর্বতকে টলাতে পারবে না, বিশ্বজগতের নিয়ম বড় কড়া, একচুল এদিক-ওদিক করবার শক্তি নেই কারো।

—আপনারও না?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তুমি এখনো ছেলেমানুষ। আমি তো আমি, পৃথিবীর গ্রহদেব স্বয়ং পারেন না। তিনি তো অসাধারণ শক্তিধর দেবতা, ভগবানের ঐশ্বর্য রয়েচে তাঁর মধ্যে। তবে আমরা যেখানে যাই, সময় হয়েচে বুঝে যাই। যেখানে সাহায্য করলে সত্যকার উপকার হবে আত্মার, এ আমি মনে মনে বুঝতে পারি। সে ক্ষমতা আছে আমাদের। সেখানেই যাই শুধু। ঐ যে বল্লাম, পাপ বুঝে যে সে পথ থেকে ফিরতে চায়, ভগবানকে মনেপ্রাণে ডাকে, বলে, আমি বুঝেচি, আমায় ক্ষমা করো, দয়া করে পথ দেখিয়ে দাও—ভগবান সেখানে আগে ছুটে যান—তাঁর কত বড় করুণা, কত প্রেম জীবের প্রতি—তা ক'জন মানুষে বোঝে? সবাই পৃথিবীতে টাকা নিয়ে যশ নিয়ে মান নিয়ে উন্মত্ত—

যতীন ও পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতে উদ্যত হোলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হেসে বালিকার মত ছেলেমানুষী সুরে বল্লেন—আমার এ জায়গাটা তোমাদের কেমন লাগে?

দুজনেই বল্লে, ভারি চমৎকার স্থান, এমন আর কখনো দেখেনি।

দেবী বালিকার মত খুশি হোলেন ওদের কথা শুনে। বল্লেন—মাঝে মাঝে এখানটাতে বিশ্রাম করি। তোমরা মাঝে মাঝে এসো। একাই থাকি।

যতীন বিনীত সুরে বল্লে—গ্রহদেব বৈশ্রবণকে দেখাবেন একবার?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তোমার দেখচি বড় বড় সাধ।

যতীন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফেরবার পথে সে পুষ্পকে বল্লে—এমন না হোলে দেবী! কি সরলতা! জায়গাটা সম্বন্ধে আমাদের সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন!

উচ্চ স্বর্গে আজ পুষ্পকে নিয়ে গেলেন প্রেমের দেবী। বহু বিচিত্র বর্ণের মেঘের মধ্য দিয়ে সে অপূর্ব যাত্রা। অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন খুলে গিয়েচে যেন, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে সে আলো।

দেবী বল্লেন—সারা পৃথিবীতে প্রেমের জন্য এত দুঃখও পাচ্ছে মানুষে! ইচ্ছে হয় সব মিলিয়ে দিই।

—দেন না কেন দেবী?

—দিই তো। কাজই ওই। আমার যা ক্ষমতা তা করি। তবে আমাদের ক্ষমতারও সীমা আছে—দেখচো তো সুধার কিছুই করতে পারচিনি। সুধার মত লক্ষ লক্ষ নর-নারীপৃথিবীতে—তবে আমরা আঁকুপাঁকু করি নে তোমাদের মত। সময় অনন্ত, সুযোগ অনন্ত—তোমরা ভাব অমুক দিন মরে যাবো কবে আর কাজ করবো? আমরা জগৎটাকে দেখি অন্য চোখে—

পুষ্প হেসে বল্লে—মরেচি তো অনেকদিন, তবে আর কেন এ অনুযোগ দেবী?

প্রণয়দেবী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন—আহা! আজ একাদশী। সুধা শুয়ে আছে ঘরে দোর দিয়ে—দেখো এখানে এসে।

একটা আলোকের পথ যেন তৈরি হয়ে গিয়েচে এই অসীম ব্যোমের বুক চিরে। পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভাঙা কোঠার ভাঙা ঘরকে তার নোনাধরা চুন-বালিখসা দেওয়ালের ব্যবধান ঘুচিয়ে যুক্ত করচে অনন্ত তারালোক-খচিত মহাকাশের সঙ্গে, দেবযানের পথে।

পুষ্পের সারাদেহ আনন্দে ও সত্যের অনুভূতিতে শিউরে উঠলো—যেখানে প্রেম, যেখানে সত্য, যেখানে গভীর রসানুভূতি বা দুঃখবোধ, সেখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগ ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় হয়ে ওঠে—অথচ সে অদৃশ্য যোগের বার্তা পৃথিবীর মানুষে জানেও না, বিশ্বাসও করে না।

কোকিল ডাকে বৈশাখের অপরাহ্নে, ছায়াভরা মাঠে, নদীতীরে। সে সুরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বনঝোপ যুক্ত হয় সুরলোকের আনন্দবীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে। কে জানেসে কথা।

—আর একটি দেখবে? এদিকে চেয়ে দেখ—

পুষ্প কিন্তু সে দেশ চিনতে পারলে না। খুব ফর্সা মেয়েটি, বয়স নিতান্ত কম নয়—দেখেই বোধ হয় আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার মেয়ে। একটা পুরোনো সোফায় বসে বসে কিপরিষ্কার করচে। জিনিসটা পুষ্প কখনো দেখেনি, বুঝতে পারলে না।

দেবী বল্লেন—ওর স্বামী ছিল শিকারী, কার্পেথিয়ান পর্বতে শিকার করতে গিয়ে বুনো শূওরের হাতে মারা পড়ে। সে আজ সতেরো আঠারো বছরের কথা—স্বামীর তামাক খাবার নলটা যত্ন করে রোজ পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজায়। সুন্দরী ছিল, বিধবা বিবাহ করবার জন্যে কত লোক ঝুঁকেছিল—কারো দিকে ফিরেও চায়নি। দুঃখকষ্ট কত পেয়ে আসচে, খেতে পায় না—তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।

পুষ্প কি ভেবে বল্লে—বিবাহিত স্বামী যদি না হয়, তবে কি আপনাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না?

প্রণয়দেবী হেসে বল্লেন—পুষ্প!

পুষ্প সলজ্জ ভাবে চোখ নিচু করলে।

—আমাদের অবিশ্বাস ক'রো না, ছিঃ—আমি তোমাকে কতদিন থেকে দেখছি জানো, যতদিন তুমি পৃথিবী থেকে প্রথম এখানে এলে। যতীনের সঙ্গে আমিই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েচি—নইলে তুমি ওর দেখা পেতে না। প্রেমের আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী ছেড়ে এসে সকলের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

—এমন হয়?

—কেন হবে না? সেই তো বেশি হয়। একটি মেয়েকে জানি, সে পৃথিবী থেকে এসেচে আজ তিনশো বছর। তার স্বামী এসেচে তার আসবার পঁচিশ বছর পরেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি আজও। এই তিনশো বছর। কারণ প্রেম নেই। প্রেম না থাকলে আমরা মিলিয়ে দিই না। তাতে পরস্পরের আত্মার ক্ষতি বই লাভ হবে না কিছু।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—উঃ! তিনশো বছর স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয়নি?

দেবী বল্লেন—মানে, আর হবেও না। তারা কেউ নয় পরস্পরের। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সত্যিকার প্রেম দুই আত্মাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যে-প্রেম যত কামনাবাসনাশূন্য সে প্রেম তত উঁচু। এই ধরনের প্রেমের জন্য আমাদের কত খাটুনি।

পুষ্প ফিরে এসে দেখলে যতীন নেই, আবার পৃথিবীতে চলে গিয়েচে আশার কাছে। পুষ্পের মনে কেমন একটা ব্যথা জাগলো—এত করেও যতীনদা আপনার হোল না।পরক্ষণেই সে নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলে। পৃথিবীর সম্পর্কে আশা বৌদিদির অধিকার তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ন্যায্য! ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

যতীন কলকাতার সেই ছোট্ট বাসাবাড়িতে আবার এসে দাঁড়িয়েচে। নেত্য বাসাতে উপস্থিত আছে বটে কিন্তু ঘুমুচ্চে। আশা বসে বসে পরদিন রান্নার জন্যে মোচা কুটচে। যতীনের মনে হোল এমনি একদিন সে কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ির রোয়াকে বসে আশাকে মোচা কুটতে দেখেছিল, যতীনের মা তখন বেঁচে, পাশেই তিনিও ছিলেন বসে সেদিন। যতীন কোথা থেকে এসে হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিল। পল্লীসংসারের সেই শান্ত পরিচিত পরিবেশ! এখনো তাই, সেই ছবিটিই অবিকল, কিন্তু কি অবস্থায়! কোথায় মা, কোথায় কুড়ুলে বিনোদপুরের সেই যত্নে পাতানো সংসার—কোথায় সে।

কোথায় যেন কি অবাস্তবতা লুকিয়ে ছিল আপাতপ্রতীয়মান বাস্তবতার পেছনে। আসল রূপটি চিনতে দেয়নি সংসারের। ছেলেবেলায় শোনা যাত্রার পালার সেই গান মনে পড়লো—

কেবা কার পর, কে কার আপন,

কালশয্যা 'পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে,

দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

সব মিথ্যে। সেই সন্ন্যাসীর দেখানো নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে পড়লো। কেউ কারো নয়। সব স্বপন, সব মায়া, সব অনিত্য।

পুষ্প এসে পাশে দাঁড়াতেই যতীনের চমক ভাঙলো। এ তো এসেচে, একে কিন্তু মিথ্যা বলে মনে হয় না তো? 'নৈহাটির ঘাটে বসে পৈঠার পাটে'—সেই পুষ্প কি অখণ্ড সত্যরূপে বিরাজ করচে চিরদিন এই খণ্ডিতসত্য খণ্ডিতসত্তা জীবনের আপাতপ্রতীয়মানস্থায়িত্বের মধ্যে?

আশা মোচা কুটে উঠে নেত্যকে ডাকতে লাগলো—ওগো, ওঠো-ভাত বাড়ি?

নেত্য জড়িতস্বরে কি বল্লে, তারপর চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসলো বিছানায়। বল্লে—কি? বাবাঃ, এতক্ষণ বসে বসে মোচা কুটলে? রাত কত?

—তা কি করে জানবো?

—দেখে এসো চৌধুরী মশায়ের ঘরে।

—হ্যাঁ, এখন বুড়ো খেটেখুটে এসে শুয়েচে, আমি গিয়ে ওঠাই—

—শম্ভু চক্কত্তি আজ এসেছিল?

—আমি জানিনে অতশত খোঁজ। এখন উঠে দয়া করে খেয়ে আমার হাত অবসর করে দাও—

এ কথার উত্তরে নেত্য আবার সটান্ বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে চোখ বুজলে।

পুষ্প বল্লে—যতীন-দা, তুমি চলে এসো, এখানে থেকো না।

—পুষ্প তুমি চলে যাও, আমি আর একটু থাকি।

যতীনের মুখের ও চোখের ভাব যেন কেমন। ও মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেচে পৃথিবীর স্থূল আবহাওয়ায়। এ সব জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ওর পক্ষে ভাল না। চুম্বকের মত আকর্ষণ করে পৃথিবীর যত বাসনা কামনা আত্মিক লোকের জীবকে। টেনে এনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে—ওপরে উঠতে দেয় না। অবিশ্যি যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েচে, সে কামচর, স্বাধীন, মুক্ত। শত পৃথিবী তাকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু যতীনের মত আত্মার পক্ষে এমন ঘনঘন যাতায়াত বড় বিপজ্জনক।

পুষ্প কিছু বলবার আগেই যতীন আবার বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে, করুণাদেবীকে আর একবার আশার বিষয় বলি। তোমার কি মত?

—যতীনদা,—তাতে ফল হবে না। আশা বৌদির কর্ম ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। কেউ কিছু করতে পারবে না। নইলে চেষ্টা তুমি আমি কম করিনি। ওর মন ওকে টানচে নিচের দিকে—অধঃপতনের পথে। বাধা দেবার সাধ্য কার! এক যদি ভগবান সাহায্য করেন, কৃপা করেন—

কথাটা যতীনেরমনঃপূত হোল না। সে বল্লে—ভগবান সাহায্য করলে এই অবস্থায় এসে ও দাঁড়ায় আজ? তিনি চোখ বুজে আছেন।

পুষ্প বল্লে—ভুলে যাচ্চ যতীন-দা, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করচে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যেচে তিনি সাহায্য করতে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না বলেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আসে না।

—কেন?

—যে ভগবানকে চেনে না, তাঁকে স্বীকার করে না, তার হোল আচ্ছাদিত চেতন। তার চেয়ে যে ভাল, তাকে বলে সঙ্কুচিত চেতন। এই দুই ধরনের লোককে ভগবৎকথাশোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়। আশা বৌদির আচ্ছাদিত চেতন। আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সেঁধোবে না। ওদের ওপরে মুকুলিত চেতন, তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে শুরু করেচে। তারও ওপরে বিকচিত চেতন, সবার ওপরে পূর্ণ বিকচিত চেতন—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা? কত নিচে পড়ে আছে আশা বৌদিআর নেত্যর দল ভাবো!

যতীন কৌতুকের সুরে বল্লে—ও বাবা, তোমার পেটে এত! নবদ্বীপের ভট্‌চায্যিদের মত শাস্তর কথা শুরু করলে যে। তোমার কী চেতন পুষ্প, বিকচিত না পূর্ণ বিকচিত? আর আমিও বোধ হয় আচ্ছাদিত চেতন—না, কি বলো?

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বল্লে—আলবৎ। নইলে তুমি কি ভাবো তুমি খুব উন্নতি করেচো?

—না, তাই জেনে নিচ্চি তোমার কাছে।

—জেনে নিতে হবে কেন, নিজে বুঝতে পারচো না, না? কখনো ভগবানকে ডেকেচ?তাঁর দিকে মন দিয়েচ জীবনে? তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা তো দূরের কথা। আমার কথা বাদ দাও যতীনদা, আমি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী লোকের মধ্যেও অনেকে মুকুলিত চেতনও নয়। পূর্ণ বিকচিত তো ছেড়ে দাও, বিকচিত চেতনই বা ক'জন? পৃথিবীতে বা এই লোকে কোথাও জিনিসটা পথেঘাটে মেলে না। তবে নেই তা নয়, আছে।

—একজন তেমন লোকের কাছে একদিন নিয়ে যাবে?

—আমার কি সাধ্যি যতীনদা? তাঁদের দেখা পাওয়া কঠিন, ধরা দিতে চায় না সহজে। আচ্ছা, একজন মানুষকে আমি জানি—যাবে সেখানে? চলো, একটুখানি দেখিয়ে দিই, সেখানে গিয়ে দেখে চলে আসবে, কোনো কথাবার্তা বোলো না। আশা বৌদিকে ছেড়ে একটু চলো দিকি। পৃথিবীর এসব আবহাওয়া তোমার পক্ষে যে কত খারাপ তা তুমি বুঝতে পারবে না।

যতীন হেসে বল্লে—কেন, ম্যালেরিয়া ধরবে?

—আত্মারও ম্যালেরিয়া আছে। দেহ থেকে মুক্ত হয়েচে বলে গুমর কোরো না। এমন ম্যালেরিয়া ধরে যাবে মনের আত্মার যে কেঁদে কূল পাবে না যতীনদা। তখন ডাক্তার দেখাতে হোলে এই ছাই-ফেলতে ভাঙা-কুলো পুষ্প হতভাগীকেই দরকার হবে।

পৃথিবী দেখতে দেখতে নীচে মিলিয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। সাদা সাদা মেঘ, অনন্ত আকাশ। সূর্যের আলোর রং আরও সাদা। মানুষের স্থূল চোখ হোলে ধাঁধিয়ে যেতো। যতীন ভাবলে, এই তো রাত দেখে এলাম কলকাতা শহরে, এখানে চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো! জগতে সব ভেল্‌কিবাজি অথচ পৃথিবীতে বসে কিছু বোঝবার জো নেই।

ভুবর্লোকের বিশাল আলোর সরণী দিক থেকে দিগন্তরে বিসর্পিত তাদের সামনে!বহু লোক যাতায়াত করচে, কেউ ধূসর বর্ণের, কেউ লাল মেটে সিঁদুরের রং, ক্বচিৎ কেউ নীল রঙের। পুষ্পকে যতীন বল্লে—দ্যাখো বেশির ভাগ আত্মাই কিন্তু ছাই রঙের আর লাল রঙের। নীলবর্ণের আত্মা পথেঘাটে কত কম।

পুষ্প হেসে বল্লে—তুমিও ওদের দলে। ভেবো না তুমি নীলবর্ণের দেহধারী আত্মা। অনেক উঁচু জীব তাঁরা। পথে-ঘাটে তাঁদের কি ভাবে দেখবে? ও যা দেখচো, ওরাও তেমন উঁচুস্তরের নয়। পঞ্চম স্বর্গের লোকের দেহ উজ্জ্বল নীল, দামী নীল রঙের হীরের মত। সে বড় একটা দেখতে পাবে না।

—তারও ওপরে?

—উজ্জ্বল সাদা। ষষ্ঠ সপ্তম স্বর্গের আত্মারা দেবদেবী, তাঁদের দিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

—তোমার মত?

হঠাৎ যতীন লক্ষ্য করলে সে এমন এক স্থানে এসে পড়েচে যেখানকার বায়ুমণ্ডলে একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা আত্মার চিরযৌবন নির্দেশ করচে যেন। কিসের সুগন্ধ সর্বত্র, সেই গন্ধভরা বনপথের আবছায়া অন্ধকারে শত শত চিরযৌবনা অভিসারিকা যেন চলেচে তাদের পরমপ্রিয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষায়, কত যুগের কত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অতীত কাহিনীর দুঃখবেদনা যেন এর পরিবেশকে কোমল করুণ করে রেখেচে—মুখে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু যতীন যেন হঠাৎ বুঝলে মনে সে অনন্তকালের শাশ্বত অধিবাসী, চিরযৌবন, অমর আত্মা—অনাদ্যন্ত বিশ্বের লীলাসহচর, সে ছোট নয়, পাপী নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়—ভগবানের চিহ্নিত শিশু, অন্য হতভাগ্য আত্মাকে টেনে তোলবার জন্যে তার জন্মমৃত্যুর আবর্ত-পথে সুখ-দুঃখময় পরিভ্রমণ।

অদূরে একটি সাদা পাথরের মন্দির, মন্দিরের চুড়োটা তার গম্বুজের তুলনায় একটু যেন বেশি লম্বা বলে মনে হোল যতীনের। কিন্তু আশ্চর্য রকমের দুগ্ধ-ধবল কী পাথরের তৈরি, না মার্বেল, না এলাবেস্টাস্‌ যেন স্বয়ংপ্রভ পালিশ করা স্ফটিক প্রস্তরে ওর বিমান ও জঙ্ঘা গাঁথা।

পুষ্প বল্লে—খুব বড় একজন ভক্ত সাধকের আশ্রমে তোমায় এনেচি।

মন্দিরের চারিপাশে খুব বড় বাগান। প্রায় সবই ফুলের গাছ, কিন্তু অত সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল এ পর্যন্ত যতীনের চোখে পড়ে নি। খুব বড় উদ্যানশিল্পীর রচনার পরিচয় সেখানকার প্রতিটি ফুলগাছের সারিতে, লতাবিতানের সমাবেশে। যতীন ভাবলে—এ স্তরেও বাগান থাকে? এসব করে কে? কে গাছ পোঁতে না জানি। পৃথিবীর মত কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে হয় নাকি?

পুষ্প একটি নিভৃত লতাবিতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যতীনকে সঙ্গে করে।

ভেতর থেকে কে বল্লে—এসো মা, তোমার অপেক্ষা করচি—

পুষ্প ও যতীন দুজনে লতাকুঞ্জের মধ্যে ঢুকে দেখলে একজন জ্যোতির্ময়দেহ সুশ্রী বৃদ্ধ পাথরের বেদীতে বসে। দুজনে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

ভুর ভুর করচে চন্দন ও ফুলের সুবাস লতাবিতানে, অথচ শৌখিন বিলাসলালসার কথা মনে হয় না সে সুগন্ধে, মনে জাগে অতীতকালের ভক্তদের প্রেমোচ্ছল অনুভূতি, মনে জাগে ভগবানের নৈকট্য, শান্ত পবিত্রতার আনন্দময় মর্মকেন্দ্র। দিগন্তে বিলীন প্রেমভক্তির মধুর বেণুরব কান পেতে শোনো এখানে বসে বসে, শুনে নবজন্ম লাভ করো।

বৃদ্ধ বল্লেন—আগে গোপাল দর্শন করে এসো—

মন্দিরের কাছে গিয়ে ওরা দেখলে নীল রঙের পাথরের অতি সুশ্রী একটি গোপালমূর্তি, যেন হাসচে—এত জীবন্ত। নানা রঙের ফুল দিয়ে বিগ্রহের পাদপীঠ সাজানো, গলায় বনফুলের মালা। পুষ্প করজোড়ে কতক্ষণ ভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতীন ভক্ত-টক্ত নয়, সে একটু অধীর ভাবেই পুষ্পের ভাব ভাঙবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

যতীন অবশেষে পুষ্পকে বল্লে—ইনি কে?

—ইনি কে আমি জানিনে। সেকালের একজন বড় বৈষ্ণব আচার্য—পৃথিবীতে নাকি এখনো এঁর আবির্ভাবের তিরোভাবের উৎসব হয়। বহুদিন পৃথিবী ছেড়ে এসেচেন।

বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞেস করলেন—বিগ্রহদর্শন করলে?

যতীন বল্লে—দেখেচি, অতি চমৎকার। প্রভু, আপনি কতদিন পৃথিবী থেকে এসেচেন?

—অনেককাল। এখানে ওসব হিসেব রাখবার মন হয় নি, কি হবেই বা পৃথিবীর হিসেব রেখে?

যতীনের মনে অনেক সংশয় উঁকি মারছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—প্রভু, এখানেও বিগ্রহ?

—কেন বল তো? কি আপত্তি তোমার?

—এ তো স্বর্গ। ভগবানের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে। কাঠ পাথরের মূর্তি পৃথিবীতে দরকার হতে পারে, এখানে কেন?

বৈষ্ণব ভক্তটি হেসে বল্লেন—ভগবানের সাক্ষাৎ তুমি যেভাবে বলচো ওভাবে পাওয়া যায় কিনা জানিনে। আমি পৃথিবীতে এই বিগ্রহের পূজারী ছিলাম, বড় ভালবাসি ওঁকে, ছেড়ে থাকতে পারিনে—তাই এখানে এসে এই মন্দির স্থাপন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেচি, ওঁরই সেবা-আরাধনায় দিন কাটে বড় আনন্দে। মন্দির আর বাগান সবই মানসী কল্পনায় সৃষ্টি করেচি, এ স্বর্গে তা করা যায় তা নিশ্চয়ই জানো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এর নিচের স্বর্গেও দেখেচি।

—আমার দেবতা শুধু পাথরের নয়, জীবন্তও বটে। কিন্তু তোমাকে তো দেখাতে পারবো না। আমার মা দেখতে পারেন। দেখেচেনও একবার।

পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে —আপনি দয়া করলে ইনিও দেখতে পারেন, বাবা।

সাধু হেসে বল্লেন—ইনি দেখতে পারেন না। ইনি ভাবেন, ভগবানকে নিয়ে আমিএভাবে পুতুলখেলা করচি। বালগোপাল বড় লাজুক, এঁর সামনে বার হবেন না। যে তাঁকে মন অর্পণ করে ভাল না বেসেচে, বিশ্বাস না করেচে—তিনি যেচে অপমান কুড়ুতে যাবেন সেখানে? ভগবান যখন ইষ্টদেবের বেশে লীলা করেন কৃষ্ণ সেজে, কালী সেজে—তখন তিনি মানুষের বা দেবদেবীদের মনোভাব—যেমন রাগ, লজ্জা, মান অভিমান, এমন কি ভয় পর্যন্ত পান। এই তো লীলা—এরই নাম লীলা। বিরাট ঐশী শক্তি যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করচে, তাকে কে ভালবাসতে পারে আপনার ভেবে? শত শত নক্ষত্র, শত শত সূর্য যার ইঙ্গিতে লয় হয়, যে পলকে সৃষ্টি, পলকে স্থিতি, পলকে প্রণয় করতে পারে—তাকে কে ভক্তি করতে পারে, যদি তিনি—

মন্দির থেকে চঞ্চল, মধুর, সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠলো—ওখানে বসে বক্‌বক্ না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু? তেষ্টায় মলুম—

সাধু চমকে উঠলেন, পুষ্প ও যতীন চমকে উঠলো।

পুষ্প হেসে বল্লে—যান, যান, জল খাইয়ে আসুন—

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—কে ছেলেটি?

সাধু যতীনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—বুঝতে পারলে না? ঐ তো বালগোপাল। তোমার খুব ভাগ্য তোমাকে গলার স্বর শুনিয়ে দিলেন। আমার পুষ্প মায়ের ভাগ্য। যাই আমি—

সাধুর মুখে স্নেহ-বাৎসল্যের রেখা ফুটে উঠলো, তৃষ্ণার্ত সন্তানকে পানীয় জল দেবার ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে অদৃশ্য হোলেন।

যতীন ভাবলে, এও পুতুলখেলা, নয় আবার!

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। সাধু অন্তর্যামী, সবার মনের কথা বুঝতে পারেন, অন্তত তার তো মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে বার করেচেন। এখানে কিছু ভাবা হবে না।

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—মনে পড়েচে, ইনি বৈষ্ণব আচার্য রঘুনাথ দাস।

বেলা পড়ে যেন অপরাহ্ণ হয়ে এসেচে। অপূর্ব পুষ্প-সুবাসে আশ্রম আমোদিত। বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—বিকেল বড় ভাল লাগে, তাই সৃষ্টি করি। নইলে এখানে আর সকাল বিকেল কি? সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, অন্ধকারও নেই। হ্যাঁ, কি সংশয় তোমার, যতীন? এখনো যায়নি, অন্ধকার বড় একগুঁয়ে। তাড়ানো যায় না।

—প্রভু কি করি বলুন। আপনি বৈষ্ণব আচার্য, কতদিনের লোক আপনি!

—মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামের নাম শুনেছিলে? সেই সপ্তগ্রামে বাড়ি ছিল আমার।

—আপনি এখানে কেন?আর সব কোথায় আপনার দলের? সাড়ে তিনশো বছর ধরে এ পুতুলখেলা নিয়ে—

—তোমার মন এখনো কাঁচা। আমি তোমাকে তো বলেচি মুক্তি চাইনি। সপ্তগ্রামেহরিদাস শিক্ষা দিয়েছিল ভক্ত চায় ভগবানের প্রতি ভক্তি, তাঁর প্রতি যেন মন থাকে। আমাদের তাতেই আনন্দ। তাঁর ভজন আরাধনা নিয়েই আছি। খুব সুখে আছি। মহাপ্রভু ভগবানে মিলিয়ে গিয়েচেন, তিনি নারায়ণের অংশ, মাঝে মাঝে আমাদের আহ্বানে প্রকট হন, এই আশ্রমে আসেন। তাঁর পৃথিবী থেকে এখানে আসার দিনে আশ্রম উৎসব হয়, সে উপলক্ষে বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য এমন কি জীবগোস্বামী মীরাবাঈ পর্যন্ত আসেন। ওঁরা আরও উচ্চলোকে আছেন। অনেকে জীবকে শিক্ষা দিতে দু-একবার ইতিমধ্যে পৃথিবীতে নেমেছিলেনও।

—আর একটা কথা আপনাকে—

—বুঝেছি। তুমি যা জিজ্ঞেস্ করবে তার মুখে উত্তর চাও, না সে জগৎ দেখতে চাও? অর্থাৎ তুমি জানতে চাইচ, পৃথিবী ছাড়া অন্য জীবলোক আছে কি না—কেমন তো? বহু বহু আছে। বিশ্বের অধিদেবতার ভাণ্ডার অনন্ত। কোনো কোনো জগৎ পৃথিবী থেকেও তরুণ, সজীব। সেখানে সব মানুষ অত্যন্ত বেশি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মরে যায়। আবার বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জগৎ আছে—সেখানে মানুষ পৃথিবীর চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী, ধীরেসুস্থে জীবনের কাজ করে। পৃথিবীর হিসেবে যার বয়স পঁচিশ বছর, সেও বালক। ষাট বছর যার বয়স, সে নব্যযুবক। যাদের উন্নতি হতে দেরি হবে জানা যাচ্চে পৃথিবীতে, এমন সব আত্মাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়াহয় না, দিলে সে পূর্ব জন্মের জীবদেরই পুনরাবৃত্তি করবে মাত্র। সুতরাং তাদের এই সব ধীর সানন্দ প্রৌঢ় পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অনেকদিন সময় পায় বলে শেখবার ও শোধরাবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। বিশ্বের দেবতার এমন আইন, সকলকেই অনন্ত মঙ্গলের পথে যেতে হবে—যে সহজে না যাবে, তাকে দুঃখ দিয়ে পীড়ন করে চোখ ফোটাবেনই। সেসব পৃথিবীতেও জীবশিক্ষার জন্যে উচ্চস্তরের আত্মারা নেমে যান দেহ গ্রহণ করে। পৃথিবী থেকেও বেশি কষ্ট পেতে হয় তাঁদের সে সবখানে। কিন্তু ভগবানের কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন, দুদিনের দেহ, দুদিনের কষ্ট, দুদিনের অপমান। শাশ্বত-আত্মায় কোনো বিকার স্পর্শ করে না, তার জরা নেই, মৃত্যু নেই।

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মহাপুরুষের কথা, এর মধ্যে অবিশ্বাস এনে লাভ নেই। আজ তার অত্যন্ত সুদিন, এমন একজন লোকের দর্শনলাভ করেচে সে।

বৈষ্ণব সাধু আবৃত্তি করচেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্!

যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে যা কিছু বলেচি, সব তাঁর কৃপা। শ্রীধর স্বামীর ঐ শ্লোক তো শুনলে? তিনি, মূক যে, তাকে করেন বাচাল। গোপালের এমনি কৃপা, এমনি শক্তি। তাঁর বিশ্ব, তিনি যা কিছু করতে পারেন।

যতীন বল্লে—এ ভাবে কত কাল থাকবেন আর?

—অনন্ত কাল থাকতে পারি, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ তিনি উৎকর্ণ হয়ে বল্লেন—বৃন্দাবনে গোবিন্দ বিগ্রহের আরতি হচ্চে, চলো দেখে আসি—

পুষ্প খুশি হয়ে বল্লে—আমাদের নিয়ে যাবেন! আপনার বড় কৃপা—

বৈষ্ণব সাধুর জ্যোতির্ময় ঈষৎ নীলাভ দেহ ব্যোমপথে ওদের আগে আগে উড়ে চলেচে, ওরা তাঁর পেছন পেছন চলেচে। নভোচারী দু-একটি আরও অন্য আত্মাকে ওরা পরে দেখতে পেলে। যতীন কখনো বৃন্দাবন

দেখেনি, তাই বৈষ্ণব সাধু ওকে চার-পাঁচটি বড় বড় গাছের ক্ষুদ্র বাগান দেখিয়ে বল্লেন—ওই দেখ চীরঘাট, ওখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্নান করে উঠে গোপালের দেখা পেয়েছিলেন। বড় পুণ্যস্থান, প্রণাম করো।

তার পরেই একটা বড় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেকালের ঝুলোনো প্রদীপের আলোয় একটি সুন্দর বিগ্রহের সামনে ওরা গিয়ে দাঁড়ালে। অনেক লোক আরতি দর্শন করচে। একটি আশ্চর্য দৃশ্য যতীন এখানে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ-মর্তের অপূর্ব সম্বন্ধ দেখে অবাক হয়ে গেল। দেহধারী দর্শকদের মধ্যে বহু অশরীরী দর্শক এসে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের আরতি দর্শন করচেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি আত্মার দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ দেখে যতীন বুঝলে, ওঁরা উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত সাধক।

যতীনের সঙ্গী বৈষ্ণব সাধু একজনকে দেখিয়ে বল্লেন—কবি ক্ষেমদাস। উনি বৃন্দাবনের বড় ভক্ত, এর মন্দির, এর কুঞ্জবন ছেড়ে থাকতে পারেন না।

যতীন বল্লে—একটা কথা শুনেছিলাম, আত্মিক লোক থেকে বার বার এলে নাকি আত্মার অনিষ্ট হয়?

সাধু বল্লেন—এসো, কবিকে প্রশ্নটা করি।

সাধু ও ক্ষেমদাস পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সাধুর প্রশ্ন শুনে কবি ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণিতে গোপীদের বিরহের দশদশার বর্ণনা আছে—চিন্তা, উদ্যোগ, প্রলাপ, এমন কি মৃত্যুদশা, উন্মাদ রোগ পর্যন্ত। আমার এমন এক সময় ছিল বৃন্দাবনের যমুনাতট না দেখলে প্রায় তেমনি অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটতো। বৃন্দাবনের মত স্থানে এলে অনিষ্ট হয় না, কৃষ্ণে আসক্তি তো আমার ইষ্টই করে, ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়।

বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—কৃষ্ণে আসক্তি কৃষ্ণপদে মতি এনে দেয়। হরিদাস স্বামী কি বলেছিলেন সপ্তগ্রামে মনে নেই?

ক্ষেমদাস বল্লেন—শুনেচি বটে। তবে মনে রাখবেন, আমি কবি ছিলাম, ভক্ত ছিলাম না আপনাদের মত। আপনারা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর, আপনাদের মত ভাগ্য আমি করি নি। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ান, বালকস্বভাব—উদাস; কেউ যদি ডাকে তার কাছে যান, না ডাকলে আপন মনেই একা একা থাকেন। অনাদিকাল থেকে এমনি। তাঁকে যদি ভালবেসে কেউ ডাকে, তবে তিনি সঙ্গী পেয়ে খুশি হন—তিনি করুণস্বভাব, ভালবাসার বশ।

পুষ্প বলে—কেন একা থাকেন? রাধা কোথায়?

—ও সব কল্পনা। এই সব ভক্তপ্রভুরা বানিয়েছেন। কে রাধা? যে নারী ভালবাসে তাঁকে, সে-ই রাধা। সে-ই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী। মীরাবাঈ যেমন।

—মীরাবাঈ আছেন?

—আছেন। তাঁরা নিত্যলীলার সহচরী ভগবানের—যাবেন কোথায়? বহু পুণ্যে তাঁদের দর্শন মেলে। বহু ঊর্ধ্বলোকে ওঁদের অবস্থিতি। আবার বিশ্ব ব্যেপে ওঁদের অবস্থান, তাও বলতে পারো। পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েচে বহুকাল, ও তো স্থূল দেহ ধরে লীলা করবার জন্যে যাওয়া। ওটা কিছু নয়। পৃথিবীর সেই মীরাবাঈকে কোথাও পাবে না। আছেন খাঁটি তিনি—অর্থাৎ যে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা মীরাবাঈ সেজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুদিনের জন্যে, তিনি আছেন।

যতীন বলে উঠলো—তাই আপনাদের মত একজন কবি বলেচেন—All the world's a stage, and the men and women merely players—অর্থাৎ—

ক্ষেমদাস মৃদু হেসে বল্লেন—বুঝেচি। গভীর সত্যবাণী। নানাদিক থেকে সত্য—নানাভাবে।

যতীন একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি কি ইংরিজি জানেন?

—ভাষার সাহায্যে বুঝি নি, তোমার মনের চিন্তা থেকে ও উক্তির অর্থ বুঝেচি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। পঞ্চম স্তরে কবি-সম্মেলন হয়, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় কবি আসেন—

যতীন ব্যাকুল আগ্রহের সুরে বল্লে, আপনি কালিদাসকে দেখেছেন? ভবভূতি?

—সে সৌভাগ্য আমার হয়েচে। পৃথিবীর সে কালিদাস নয়—যে নিত্য মুক্ত কবি-আত্মা কালিদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই আত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়। একবার নয়, অনেক বার নানা দেশে নানা প্রাকৃত দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি অপ্রাকৃত দেহধারী চিদানন্দময় আত্মা; আজ নাম কালিদাস কাল নাম চণ্ডীদাস, পরে ক্ষেমদাস—তাতে কি?

—কবি-সম্মেলন হয় কোন্ সময়?

ক্ষেমদাস জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বুঝি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে? তোমার কথাতে মনে হচ্চে। এখন সময়ের কি মাপ? কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ—অনন্তকাল বায়ুর মত শন্ শন্ বইচে। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপগোস্বামী বলেচেন তাই—অনর্পিতচরীং চিরাৎ—রূপগোস্বামীও কবি, তিনিও আসেন। আর তুমি জানো না, যাঁর সঙ্গে এসেচ এই আচার্য রঘুনাথ দাসও কবি? এঁর রচিত চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ কি পড়ে থাকবে? পড়েচ বলে মনে হচ্চে না। শোনো তবে—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ

শ্লথাৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধতি দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।

কেমন ছন্দ? কেমন লাগচে ওঁর শ্লোক?

যতীন বিষণ্ণমুখে বল্লে—আজ্ঞে বেশ!

বৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরের আরতি বহুক্ষণ থেমে গিয়েচে। পাশের রাজপথ দিয়ে দু একখানা গাড়ি যাতায়াত করচে, মন্দিরের বড় বড় দরজায় আলো জ্বলচে, কোথা থেকে উগ্র বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে, মন্দিরের সামনে একটা হিন্দুস্থানী টাঙ্গাওয়ালা যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কি বকাবকি করচে। যতীন ভাবলে, স্বর্গ-মর্তের কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! অথচ বেঁচে থাকতে পৃথিবীর লোকে কেউ এরহস্য জানে না। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, এত বড় জীবনের খবর যদি কেউ রাখতো, প্রেম-ভক্তির এ সম্পর্ক যদি রাখতে জানতো ভগবানের সঙ্গে—তবে কি তুচ্ছ বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত থাকে? এই মাত্র যে লোকটা সামনের রাস্তা দিয়ে মোটর চড়ে গেল ও হয়তো একজন মাড়োয়ারি মহাজন, সারাজীবন ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করে এসেচে—জীবনের অন্য কোনো অর্থ ওর জানা নেই, কেবল তেজীমন্দী, লাভ-লোকসান এই বুঝেচে। জয়পুর শহরে হয়তো ওর সাততলা অট্টালিকা। কিন্তু হয়তো ছেলেগুলো অবাধ্য, বেশ্যাসক্ত, স্ত্রী কুচরিত্রা। মনে সুখ নেই—অথচ ও কি জানে, এই পাশেই মদনমোহনের মন্দিরে এই গভীর রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কবি সাধুরা আজ সমবেত হয়েচেন, সেখানে পুষ্পের মত নারীর স্নেহ, কত শতাব্দীর পার থেকে ভেসে আসা অমর মহাপুরুষদের বাণী, বকুলপুষ্পের সুবাস, ভগবানে অর্পিত মধুর প্রেমভক্তির পরিবেশ—এইখানেই স্বর্গমর্তের বিশাল ব্যবধান রচনা করেচে। হায় অন্ধ পৃথিবীর মানুষ!

১৫

পৃথিবীর হিসেবে দীর্ঘ দু বছর কেটে গেল।

সেদিন পুষ্প ও যতীন বসে কথা বলচে বুড়োশিবতলার ঘাটে, এমন সময় পুষ্প হঠাৎ চিৎকার করে বল্লে—এই! থামো—থামো—খবরদার—

পরক্ষণেই সে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন মুখে বহুদূর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লে—যতীনদা, যতীনদা—

যতীন বিস্মিত সুরে বল্লে—কি হোল? পুষ্প বল্লে—কিছু না। যতীন নাছোড়বান্দা, সে বার বার বলতে লাগলো—কি হোল বল না পুষ্প? বলবে না?

অবশেষে পুষ্প বল্লে—আশা বৌদিকে খুন করতে যাচ্চে তার সেই উপপতি নেত্য—

—সে কি!

—ঐ যে, দেখতে পাচ্চ না?

যতীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে—চলো চলো ছুটে যাই, সামলাই গিয়ে—আমি তো কোনো দিকে কিছু দেখচি নে—ওঠো।

বিস্মিত যতীন পুষ্পের দিকে চেয়ে দেখলে যে তার যাবার কোন ব্যস্ততা নেই। সে চুপ করে বসেই রইল, কিছুক্ষণ পরে পুষ্পের বিশাল আয়ত চোখ দুটি বেয়ে জলগড়িয়ে পড়লো।

যতীন বল্লে—কি হয়েচে, চলো চলো—

—গিয়ে কি হবে। এ যাত্রা রক্ষা হোল গিয়ে—

—বেঁচে গিয়েচে?

—আপাতত বটে। আহা, কি দুঃখ আশা বৌদির!

—আমি সেখানে যাবো পুষ্প। চলো দেখা যাক—

—না।

—তোমার ওই সব কথা আমার ভাল লাগে না পুষ্প, সত্যি বলচি। আমি আলবৎ যাবো সেখানে। আমার মন কেমন হচ্চে বল তো?

—সেজন্যেই তোমার আরও যাওয়া উচিত নয়। দেখে কষ্ট পাবে খুব।

—চলো পুষ্প, তোমার পায়ে পড়ি, আচ্ছা তুমি বোঝ সব, অথচ মাঝে মাঝে—

অগত্যা পুষ্প ওকে নিয়ে কলকাতায় আশার বাসায় এসে উপস্থিত হোল। তখন যতীন বুঝতে পারলে কেন পুষ্প এখানে তাকে আনতে চায় নি। নেত্য আজকাল মদ খায়, মাতাল অবস্থায় এসে দিন-দুপুরে সে আশাকে এমন মার দিয়েচে যে, সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ভয়ার্ত চোখে দুর্দান্ত মাতালটার দিকে চেয়ে আছে। দরজার চৌকাঠের এপারে একখানা নেপালী কুকরি পড়ে, সম্ভবত নেত্যর হাত থেকে ঠিকরে পড়ে থাকবে। ওদের দোরের বাইরে আশপাশের ঘরের ভাড়াটেরা জড়ো হয়ে উঁকি মেরে মজা দেখচে। নেত্য মত্ত অবস্থায় টলচে ও হাত নেড়ে নড়ে জোর গলায় আস্ফালন করচে—ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো—আচ্ছা পাল মশায়, আপনি বিচার করুন, ওকে কে খেতে দিচ্চে, পরতে দিচ্চে? ও দেশে না খেয়ে মরছিল কিনা ওকে জিজ্ঞেস করুন না? আমি মশাই হক্ কথা হক্ কাজ বড় ভালবাসি। আমি আনলাম ওকে এখানে, খাওয়াই পরাই, অথচ সেই শম্ভু ব্যাটা এসে তলায় তলায় ফুর্তি মারে। কত দিন পই পই করে বারণ করিচি—করি নি? তেমন পুরুষ বাপে নেত্যনারাণের জন্ম দেয় নি—আজ তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো, সেও থোড়াই কেয়ার করে এই শর্মা। এত বড় তোর বদমাইসি! কম করেচি আমি তোর জন্যে? তোর নিজের বিয়ে করা ভাতার কোনো দিন তোকে খেতে দেয়নি, আর আমি কিনা...দিয়েচে কোনো দিন সেই যতীন?

এই সময় আশা আধ-বসা অবস্থায় উঠে ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে—খবরদার! তিনি স্বগ্‌গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কিছু বোলো না—

নেত্য বিদ্রূপের সুরে বল্লে—ওরে আমার স্বামী-সোহাগী সতী রে! মারো মুখে ঝাঁটা, বলতে লজ্জাও করে না? আমি বলচি, না তুই বলতিস্ সেই যত্‌নেটা বেঁচে থাকতে? আবার স্বামী-সোহাগ দেখাতে এসেচেন, মরণ নেই?

ভারি স্বামী ছিল মুরোদের, সব জানি, বিয়ে করে একখানা কাপড় কিনে দেবার, এক মুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা হয় নি—

আশা আবার উঠে বল্লে—আবার ওই কথা! তিনি মরে স্বগ্‌গে গিয়েচেন, তাঁরনামে কেন বলবে তুমি?

নেত্য হঠাৎ তেড়ে এসে আশার কাঁধে এক লাথি মেরে বল্লে—স্বামী সোহাগ উথলে উঠলো বদমায়েশ মাগীর, যে বেরিয়ে এসেচে তার মুখে আবার—গলায় দড়ি দিগে যা—

আশার চেহারা আগের চেয়ে খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে, গায়ের রঙেও আগের মত জলুস নেই, লাথি খেয়ে সে কিন্তু এবার ঠেলে উঠলো। বল্লে—তাই দেবো, গলায় দড়ি দিয়ে তোমায় পুলিশের হাতে যদি তুলে না দিই—

—চুপ—পুলিশ তোর বাবা হয়!

—আবার মুখে ওই সব কথা?

এইবার একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—এসব আপনাদের কি কাণ্ড? আপনারা না ভদ্দরলোক? আশপাশের বাড়িতে গেরস্তর ঝি-বউ সব রয়েচে, এখানে মদ খেয়ে চেঁচামেচি চলবে না। হ্যাংগামা করতে হয়, ন্যাক্‌রা করতে হয়, সরকারি রাস্তা পড়ে রয়েছে। আমার বাড়ি ওসব করলে পুলিশে খবর দিতে হবে—

পালমশায় এবার বোধ হয় সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন—আমিও তাই বন্নু। বলি এখানে ওসব কোরোনি—তা মাতালের সামনে এগোতে কি সাহস হয়!

প্রৌঢ়া স্ত্রীলাকটি আশাকে ধরে ঘরের বাইরে আনতে আনতে বল্লে—মাতালের সামনে তক্‌কো কত্তে আছে, ছিঃ মা—দেখচো না ওর এখন কি ঘটে জ্ঞান আছে? এসো আমার ঘরে—

আশা চলে যায় দেখে নেত্য জড়িত কণ্ঠে বাজখাঁই আওয়াজে বল্লে—এই, কোথাও যাবিনি বলে দিচ্চি—হাড় ভাঙবো মেরে—খবরদার! এই! আমি এখন চা আর ডিম ভাজা খাবো—করে না দিয়ে যদি নড়বি—নিয়ে যেও না মাসি—

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যেতে যেতেই বল্লে—আচ্ছা, চা করে ডিম ভেজে আমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা—আপনি একটু শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন—

পালমশায় উপস্থিত লোকজনদের দিকে চেয়ে বল্লে—চলো সব, চলো, কি দেখতে এসেচো সব? দুটো হাতপা বেরিয়েচে কারো, না ঠাকুর উঠেচে? বন্নু তখন ওখানে যেওনি, যে যার ঘরে যা খুশি করুক না, তোমার কি? আসুক দিকি আমার নিজের ঘরে। দেখি কত বড় কে বাপের ব্যাটা!

শেষের কথা ক'টি পৌরুষগর্বের উচ্চারণ করবার সময় তিনি নেত্যনারায়ণদের ঘর থেকে বেশ একটু দূরে বারান্দার প্রায় ওপাশে চলে গিয়েচেন যদিও, তবুও চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে দেখে নিলেন, দুর্দান্ত মাতালটা তার কথা শুনলো কিনা।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—এতদূর নেমেচে ওর অবস্থা! এ আমি ভাবিনি—

পুষ্প বল্লে—ভাবা উচিত ছিল, এ সব জিনিসের এই কিন্তু পরিণাম—এখান থেকে চলে যাই—

যতীন চুপ করে বসে ছিল, আশার দুর্দশা তার মনে গভীর রেখাপাত করেচে। সে দুঃখিত ভাবে বল্লে—তুমি কেবলই এসে চলে যেতে চাও, কিন্তু আমি কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো পুষ্প? আমার কর্তব্য পালন করিনি বলেই আজ ওর এই দুর্দশা। আমি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতাম, যদি আশার জন্যে তেমন টাকাকড়ি রেখে যেতে পারতাম, তাহোলে—

—তোমার ভুল এখনো গেল না।

—কেন, ঠিক কথা বলচি কি না? ভুলটা কোথায়?

পুষ্প মৃদু হেসে ওর পাশে এসে বল্লে—তোমাকে এত ভাল ভাল জায়গায় নিয়ে গেলাম, তোমার বুদ্ধিটা যেমন স্থূল তেমনই রইল—

—কেন?

—আশা বৌদি নিজের কর্মফলে এখনো অনেকদিন এই রকম ভুগবে। তুমি ওর কর্মের বন্ধন কাটাতে পারো সাধ্যি কি? টাকা রেখে যেতে, টাকা সুদ্ধ চলে যেতো। বড় লোকের ছেলেদের তো অনেক টাকা দিয়ে বাপ-মা মরে যায়—তারা উচ্ছন্ন যায় কেন?

—আমি এখানে থাকবো পুষ্প। ওকে ফেলে যেতে পারবো না এ ভাবে—

—তুমি কেন, দরকার হোলে আমিও থাকবো। এখানে থাকতে আমার রীতিমত কষ্ট হয়—তবুও আমি তোমার জন্যে, যদি আশা বৌদির এতটুকুও উপকার করতে পারতাম তবে এখানে থাকতে কিছু আপত্তি করতাম না। কিন্তু তুমি এখনো অনেক জিনিস বোঝো নি। এসব নিষ্ফল চেষ্টা। করুণাদেবীর মুখে শুনেচি করুণার পাত্র মেলানো বড় দুর্ঘট। নয়তো করুণাদেবীর মত শক্তিশালিনী দেবী আশা বৌদিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন না? এক্ষুনি পারেন—কিন্তু তাঁরা জানেন, তা হয় না। জীব নিজের চেষ্টায় উন্নতি করবে, বাঁশ দিয়ে ঠেলে উঁচু করে দিলে জীব উন্নতি করে না! নয়তো ভগবান এক পলকে সব পাপী উদ্ধার করতে পারতেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করতে হয়। সে তুমি আমি বুঝিনে, কিন্তু করুণাদেবী, প্রেমদেবীর মত দেবদেবীরাঅনেকখানি বোঝেন—তাই তাঁরা অপাত্রে—

—আমি না বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি ঠিক বোঝো। তোমার দেখবার ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তোমার সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়ে আমার অনেক উন্নতি হয়েচে আগেকার চেয়ে—এখন বুঝিয়ে বল্লে বুঝি। তোমার সেই সন্ন্যাসীর মতে এখন বোধ হয় আমার মুকুলিত চেতন—নয়তো বুঝিয়ে বল্লে—ও বুঝতাম না, মনে সংশয় জাগতো, অবিশ্বাস জন্মাতো, তা হোলে সে সব তত্ত্ব আমার কোনো কাজে লাগতো না।

এই সময় নেত্যনারাণ ডাকতে লাগলো চেঁচিয়ে—ও আশা, শোনো এদিকে—এই আশা—

প্রৌঢ়া বাড়িওয়ালী বারান্দায় বার হয়ে বল্লে—একটু চা খাচ্চে, আপনাকেও পাঠিয়ে দিচ্চি তৈরি হোলে। আশা এখন যেতে পারবে না।

নেত্য গরম মেজাজে বল্লে—কেন যেতে পারবে না—শুনতে পাই কি? ও আমার মেয়েমানুষ, আমি যখন ডাকবো, আলবৎ আসবে—ওর বাবা আসবে—

এই কথাটা যতীনের বুকে যেন গরম শূলের মত বিঁধলো। আশা তার স্ত্রী, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যার সঙ্গে সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েচে—সেই আশা অপরের 'মেয়েমানুষ'? নেত্যর হুকুমে তাকে চলতে হবে? যতীনের মাথা যেন ঘুরে উঠলো। এক মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ, মিথ্যে, জোলো হয়ে দাঁড়ালো—মস্ত একটা ফাঁকি, মস্ত একটা ধাপ্পাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েচে সে। পুষ্প-টুষ্প, সন্নিসি-টন্নিসি সব এই মস্ত জুয়োচুরির অন্তর্গত ব্যাপার। নইলে অগ্নিসাক্ষী করে, হোম করে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যাকে সে সহধর্মিণী করেছিল—

কিংবা এই হয়তো নরক!

সে হয়তো নরক ভোগ করচে—স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করেনি, জোর করে তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে এনে কাছে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করেনি কিন্তু ক্লীবের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিল, সেও তমোগুণ। তার জন্যেই এই দারুণ নরক তাকে স্বচক্ষে দেখতে হচ্চে, কে যেন টেনে নিয়ে আসচে এখানে, এই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে কে যেন তাকে বাধ্য করচে, নিয়তির মত নিষ্ঠুর সে আকর্ষণ, রেহাই দেবে না তাকে।

পুষ্প বল্লে—চলো যতীনদা, আর এখানে থেকে কষ্ট পেয়ো না—

যতীন দুঃখমিশ্রিত হতাশার সুরে বল্লে—তুমি অতি করুণাময়ী। তুমি জানো যে এ আমার কর্মফলের ভোগ, এ নরক। তুমি দয়া করে তাই কেবল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইচ, আমি সব বুঝতে পেরেচি

এবার। কিন্তু পুষ্প দয়াময়ী, আমার সাধ্যি কি, আমি যাই? চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আশার ভাগ্য ও আমার কর্মফল পরস্পরকে তেমনি টানচে। টেনে আনচে কোথায় তোমাদের সেই তৃতীয় স্তর থেকে—আমায় সে টানে আসতেই হবে এবং আমি কোথাও যেতেও পারবো না।

পুষ্প দৃঢ়স্বরে বল্লে—তুমি দুর্বল হয়ে হাল ছেড়ে বসে থেকো না, সেও কি পুরুষের কাজ, বীরের কাজ? তা ছাড়া তোমাকে এই বন্ধন থেকে বাঁচাবো আমি। নইলে তুমি বুঝতে পারচো না কি বিপদ তোমার সামনে—।

কিন্তু যতীন কিছুতেই না যেতে চাইতে পুষ্প কিছুক্ষণের জন্যে পৃথিবীতে থেকে চলে গেল, বল্লে—পৃথিবীর ভোরের দিকে সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু রাত দুটোর পর নেত্য মদ্যপানের অবসাদে ঘুমিয়ে পড়াতে যতীন ভাবলে এবার সে স্বস্থানে ফিরতে পারে। আশা বাড়িওয়ালীর ঘরেই ঘুমুচ্চে, সুতরাং এখন আর কোনো ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। যেন ভয় উদ্বেগ থাকলেই সে ভয়ানক কিছু সাহায্য করতে পারতো!

পৃথিবী ছেড়ে বাইরের আকাশের তলায় এসে সে দেখলে শূন্যপথের সাধারণ চলাচলের মার্গগুলি একেবারে জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। যতীন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। পৃথিবীর লোক না দেখতে পাক কিন্তু অসীম ব্যোমের নানা স্থান দিয়ে বিশেষতভূপৃষ্ঠ থেকে একশো দেড়শো গজের ওপর থেকেই মেঘপদবীর সমান্তরালে বা তদূর্ধ্বে বহু পথ সীমা-সংখ্যাহীন অনন্তের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে। এই সব পথ কোনো বাঁধাধরা সুরকি সিমেন্টের তৈরি রাস্তা নয়—আত্মিক জীব, দেব-দেবী, উচ্চ জীবগণের গমনাগমন দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটা অদৃশ্য জ্যোতিরেখা মাত্র।

সাধারণত বিশ্বের এই রাজমার্গগুলিতে আত্মিক পুরুষেরা সর্বদা যাতায়াত করেন, কিন্তু আজ সেখানে একেবারে কেউ নেই—আরও ওপরে এসে যে স্থান ধূসরবর্ণআত্মাদিগের অধিষ্ঠানভূমি, সেও জনহীন।

যতীন বুঝতে পারলে না, এরকম ব্যাপারের কারণ কি। আজ এত বছর সে এসেচে আত্মিকলোকের তৃতীয়স্তরে—কিন্তু এমন অবস্থা সে দেখেনি কখনো। তার মনে যেন কেমন ভয়ের সঞ্চার হোল। অথচ কিসের ভয় সে নিজেই জানে না। যে একবার মরেচে, সে আর মরবে না, তবে ভয়টা কিসের?

হঠাৎ যতীন দেখলে একটি লোক যেন আতঙ্কে চারিদিকে চাইতে চাইতে ঝড়ের বেগে উড়ে দ্বিতীয়স্তরের আত্মিক লোক থেকে আরও ঊর্ধ্বলোকের দিকে পালাচ্চে। পৃথিবী হোলে বলা চলতো লোকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্চে। ব্যাপার কি? এর নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে।

যতীন তাকে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই লোকটা অন্তর্হিত হোল—মনে হোল পলায়মান ব্যক্তি যেন হাতের ইঙ্গিতে তাকে কি বল্লে—কি বিষয়ে সাবধান করতে গেল।

লোকটি অদৃশ্য হবার কিছু পরেই যতীনের মনে হোল কী এক ভীষণ টানে তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চে। অতি ভীষণ সে টানের বেগ, তিমির-প্রসারক যেন কোন্ বিশাল চৌম্বক শক্তি জগৎব্রহ্মাণ্ড চুর্ণ-বিচূর্ণ করে তার জাল বিস্তার করেচে—যতীনের সামনে, পাশে, দূরে, চারিদিকে ঝড়ের মত কোথা থেকে সেই ভীষণ শক্তির লীলা এক মুহূর্তে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। যতীন যেন ভীম আবর্তে তলাতল পাতালের অভিমুখে কোথায় চলেচে...তার জ্ঞান লোপ পেয়ে আসচে...কেবল এইটুকু সে লক্ষ্য করলে, শুধু সে নয়, ঝড়ের মুখে তার মত বহু জীবাত্মা কুটোর মত কোথায় চলেচে বিষম ঘূর্ণিপাকের টানে!...তারপর একটা আর্ত চিৎকার স্বর, এক কি বহু সম্মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ, যতীন ঠিক বুঝতে পারচে না, তার সংজ্ঞা নেই, অতিপ্রাকৃত কী এক বিষম শক্তির অমোঘআকর্ষণ তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করেচে...

ভয়ানক অন্ধকার তার চারিদিকে, এই কি তলাতল পাতাল? পৃথিবী কোথায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র সূর্য কোথায়, পুষ্প কোথায়? করুণাদেবী কোথায়, হতভাগিনী আশা কোথায়—সব লুপ্ত, একেবারে! কোন্ রসাতলে সে চলেচে দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে।

অনেকক্ষণ...অনেক যুগ যেন কেটে গিয়েছে...জ্ঞান নেই যতীনের। অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। বহুদিন সে কী এক গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল।সব অন্ধকার...বিস্মৃতি...

পুষ্পের ডাকে তার চৈতন্য হোল। পুষ্প তাকে ডাকচে, ও যতীনদা, যতীনদা, বেরিয়ে এসো।

পুষ্প ও আর একজন তাকে প্রাণপণে ডাক দিচ্চে, যেন কতদূর থেকে...

যতীন বলে উঠলো—অ্যাঁ!—

—শীগগির চলে এসো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ—পুষ্প, পুষ্প ডাকচে!

যতীনের জ্ঞান একটু একটু ফিরে এসেচে—এ কোন্ স্থান!

কে যেন ওর হাত ধরলে এসে। পুষ্পের কণ্ঠস্বর ওর কানে গেল আবার। পুষ্প যেন কাকে বলচে—এবার যতীনদা বেঁচে গেল। তবে এখনো ঠিক জ্ঞান হয়নি—

আবার আত্মিকলোকের নির্মল বায়ুস্তরে ওর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সহজ ও আনন্দময় হয়ে আসচে। যতীন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলে, সামনে পুষ্প ও পুষ্পের মা। সে বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লে—কি হয়েছিল বল তো? এ কি কাণ্ড ! এমন তোকখনো—

তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। সে পৃথিবীর এক গরিব গৃহস্থের পুরোনো কোঠাঘরের মধ্যে। পৃথিবীতে রাত্রিকাল, সম্ভবত গভীর রাত্রি। বর্ষাকাল। বাইরে ঘোর অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়চে বাড়ির পেছনের বাঁশবনে। ঘরের এককোণে কিছু পেতল কাঁসার বাসন একটা জলচৌকির ওপরে, একটা পুরোনো তক্তপোশ, দুতিনটি বস্তা—একটার ওপর আর একটা সাজানো—সম্ভবত ধান। ঘরের মেঝের একপাশে একটা জলের বালতি, ওদের ঠিক সামনে মেঝের ওপর মলিন কাঁথা পাতা একটা বিছানার একপাশে ছোট ছোট বালিশ পাতা—আর একটা ছোট বিছানা, কিন্তু সে ছোট বিছানাটা খালি। আর বিছানার সামনে মেঝের ওপরেই মলিন শাড়ি পরনে একটি মেয়ে বসে অঝোরে কাঁদচে, মেয়েটির কোলে একটি মৃত শিশু, সম্ভবত ছ'সাত মাসের। ঘরের দরজার কাছে একটা পুরোনো হ্যারিকেন লণ্ঠনে বোধ হয় লাল তেল জ্বলছে, কারণ আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি হয়ে লণ্ঠনের কাঁচের একটা দিক কালো করে ফেলেচে। ঘরের মধ্যে আরও দুতিনটি মেয়ে ও পুরুষমানুষ সবাই ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে ঘিরে নিঃশব্দে বসে।

মেয়েটি কাঁদচে আর বিলাপ করচে—ও আমার ধনমণি, ও আমার সোনা, হাসো, দেয়ালা করো, আমার মানিক, চোখ চাও—আমার কোল খালি করে পালিও না আমার সোনা—কোথায় যাবা আমায় ফেলে?

যতীন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পুষ্পের ও পুষ্পের মার দিকে চেয়ে বল্লে—এ সব কি ব্যাপার! এরা কারা? আমি কোথায়?

মেয়েটি একমনে বিলাপ করেই চলেচে কোলের মৃত শিশুর দিকে চোখ রেখে—কাল থেকে তুমি একবারও মাই-এ মুখ দ্যাওনি যে বাবা আমার! মাই খাবা?মায়ের মাই-এ মুখ দেবা না, ও মানিক আমার? আর মুখ দেবা না? চোখ চাও দিনি—

মেয়েটির আকুল ক্রন্দনে যতীনের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের চঞ্চলতা দেখা দিল, পরের কান্না শুনে এমন কখনো তার হয়নি—সম্পূর্ণ অননুভূত কোন্ অনুভূতিতেওর চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প বল্লে—চলে এসো যতীন দা, চলো সব বল্‌চি। তুমি পুনর্জন্মের টানে পড়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলে আজ ছ'সাত মাস। ওই তোমার মা। আজ আবার দেহ থেকে মুক্তি পেলে। ওই মৃত শিশুই তুমি—কি বিপদেই ফেলেছিলে আমাদের।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—পুনর্জন্মের টান! সে কি! আমি এই বাড়িতে—

—এই ঘরেই জন্মেছিলে। এরা ব্রাহ্মণ, গ্রামের নাম কোলা বলরামপুর, জেলা যশোর। ভগবানের কাছে বহু ডাক ডেকে আর করুণাদেবীর দয়ায় আজ উদ্ধার পেলে—নতুবা দেহ ধরে এইসব অজ পাড়াগাঁয়ে এখন বহুকাল কাটাতে হোত—পুনর্জন্মের ঠ্যালা বুঝতে পারতে। বার বার পৃথিবীতে যাওয়া-আসার কুফল এখন বুঝতে পারচো তো? কতবার না বারণ করেছি?

যতীনের মন তখন কিন্তু পুষ্পের ওসব আধ্যাত্মিক তিরস্কারের দিকে ছিল না। তার সামনে বসে এই তার পৃথিবীর মা, গরিব ঘরের মা, তারই বিয়োগব্যথায় আকুলা, অশ্রুমুখী। গত ছ'মাসের শৈশবস্মৃতি কোনো দাগই কাটেনি তার শিশু-মস্তিষ্কে। কিন্তু কত বিনিদ্র রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ওই দরিদ্রা জননীর তরুণ মুখে! তারই মা, তারই নবজন্মের দুঃখিনী জননী, যাঁর বত্রিশ নাড়ি ছিঁড়ে ছ'মাস পূর্বে এই দরিদ্র গৃহে কত আশা আনন্দের ঢেউ তুলে একদিন সে পুনরায় ধরণীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কি অদ্ভুত মোহ, কি আশ্চর্য মায়ার বাঁধন, মনে হচ্চে, স্বর্গ চাইনে, করুণাদেবীকে চাইনে, পুষ্পকে চাইনে, আশাকে চাইনে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-টুন্নতি চাইনে—এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মেয়ের কোলে সুখদুঃখে সে আবার মানুষ হয়! এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিধারা, এই বর্ষার রাত্রিটি, এই গরিব মায়ের তারই জন্যে এ আকুল বুকফাটা বিলাপ—এ সব জীবনস্বপ্নের কোন্ গভীর রহস্যময় অঙ্ক অভিনয়ের দৃশ্যপট! ভগবান হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্বপ্ন।

ওর মনে পড়ল যাত্রায় শোনা গানের দুটো লাইন—

এ নাটকের এ অঙ্কে পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে,

হয়তো যাবো পর অঙ্কে পর অঙ্কে পুত্র সেজে।

ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া বল্লে—আর কেঁদো না বৌ, যা হবার হয়ে গেল, এখন উঠে বুক বাঁধো—মনে করো ও তোমার ছেলে নয়—ভারত করতে যদি ও আসতো তা হোলে কোলজোড়া হয়ে থাকতো, তা ভারত করতে তো আসে নি—কেঁদো না—

একজন আধবুড়ো গোছের লোক বল্লে—বিষ্টি মাথায় এখন আর কোথায় যাবো—সকালের আর বেশি দেরি নেই, সাধন আর হরিচরণকে নিয়ে আমি যাবোএখন—

প্রৌঢ়া বল্লে—বিষ্টিরও বাপু কামাই নেই—সেই যে আরম্ভ করেচে বিকেলবেলা, আর সারারাত—

কথা বলতে বলতে কাক কোকিল ডেকে রাত ফর্সা হয়ে গেল। পুষ্পের বার বার আহ্বানেও যতীন সেখান থেকে নড়তে পারলে না। পুত্রহারা জননীর আকুল কান্না ও আছাড়ি-বিছাড়ির মধ্যে সেই আধ-বুড়ো লোকটি আর দুজন ছোকরা মৃত শিশুদেহ নিয়ে বৃষ্টিধারা মাথায় বাঁশবনের পথে চললো। যতীন, পুষ্প ও পুষ্পের মা গেল ওদের সঙ্গে। বাড়ি থেকে দু রশি আন্দাজ দূরে ছোট্ট একটা নদী, কচুরিপানার দামে আধবোজা; ওরা শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহটা নদীর ধারে পুঁতে ফেললে। তখনো ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি, বৃষ্টিধারায় চারিধার ঝাপসা। পথে-ঘাটে লোকজন নেই কোথাও—বর্ষাকালের ধারামুখর প্রভাতকাল।

১৬

পুষ্প যতীনকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর বৃষ্টিধারা-মুখর ঝাপসা আকাশে ঊর্ধ্বে এক সু-উচ্চ পর্বতচূড়ায় এসে বসলো। পুষ্পের মা বল্লে, আমি যাই মা পুষ্প, বসো তোমরা।

নিম্নে পৃথিবীর চারিদিকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ খেলচে, দিক্‌চক্রবালে সুনীল আকাশে সূর্যোদয় হচ্চে, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ রাঙা। ওরা যেন পার্থিব বাসনা কামনার বহু ঊর্ধ্বের কোনো নির্মল দেবলোক থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। বাংলা দেশের উত্তরে এ বোধ হয় হিমালয় পর্বতের চূড়া। দূরে নিকটে তুষাররাশি সূর্যালোকে ঝক্‌মক্ করচে। যতীনের মনে হচ্ছিল এই সবই মায়া, ভেলকিবাজি, ভগবানের ভেলকিবাজি। মৃত্যুর অসত্যতা সে ভাল ভাবে বুঝেচে। মৃত্যু বলে তাহোলে কোনো জিনিস নেই; এই তো সে যশোর জেলারই কোলা-বলরামপুর গ্রামে মরে গেল শেষ রাত্রে অথচ এখানে সে পর্বতশিখরে বহাল-তবিয়তে সমাসীন। মরণ নেই, বিচ্ছেদ নেই, দুঃখ নেই, আমরা অমর—জীবনমরণের সঙ্গে, সুখদুঃখের সঙ্গে—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর আমাদের এ ক্ষণিক লীলাখেলা।...

পুষ্প যতীনের মনের ভাব বুঝতে পারলে। হাজার হোক, যতীনদা পুরুষমানুষ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল, জিনিসগুলো চট্ করে ধরতে পারে। পেটে একেবারে বিদ্যেথাকলে অন্ধকার ঘোচে? সে গম্ভীর মুখে বল্লে, এবার বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু বার বার আশা বৌদির কাছে যাতায়াতের ফলে তোমার এই বিপদ। অনেকবার তোমায় সাবধান করেছিলাম, শোনোনি। পুনর্জন্মের আবর্ত মাঝে মাঝে আত্মিক স্তরে ঝড়ের মত এসে পৌঁছয়, কোথা থেকে আসে তা জানিনে, ক'টা ব্যাপারই বা বুঝি জগতের! সেই সময় যে কেউ সামনে পড়ে, তাকে নিয়ে এসে পৃথিবীতে ফেলে ঘুরিয়ে। ও থেকে রেহাই নেই। তাই এসে জন্মেছিলে পৃথিবীতে—

—আমার মনে আছে সে ভীষণ টানের কথা—জ্ঞান ছিল না আমার।

—তোমার উচিত হয়নি আশাদের বাসায় অতক্ষণ থাকা। ও একটা ঝড়ের মত, ভূমিকম্পের মত বিপর্যয়; তবে তৃতীয় স্তরের নীচের অঞ্চলেই ও আবর্তের সৃষ্টি, চতুর্থ স্তরের আত্মারা তত বিপদগ্রস্ত হন না ওতে—যদিও পালিয়ে যান সকলেই; ও একটা অন্ধশক্তি—ওকে বিশ্বাস নেই। কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পুনর্জন্ম ঘটাবে পৃথিবীতে। অনেকেই পৃথিবীতে জন্ম নিতে চায় না, সকলেই ওটাকে ভয় করে।

—তুমি আমাকে কোনদিন এই ব্যাপারটার কথা বলোনি তো?

—ভূমিকম্পের কথা পৃথিবীতে সবাইকে সবাই বলে বেড়ায়? হয়তো জীবনেই ঘটলো না, নয় তো এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল—এও তেমনি। পৃথিবীর বাসনা কামনা আসক্তি যখন মনের মধ্যে বেশি হয় বা যখন তৃতীয় স্তরের নীচেকার আত্মিক লোকে থাকে—তখনই ওই আবর্ত বড় বিপজ্জনক। সেইজন্যেই তোমায় বার বার বারণ করতাম। একা আর তোমাকে বেরুতে দেবো না—

—তুমি জানতে পারলে কখন?

—তখুনি। আমি তখন জপে বসেচি—

লজ্জায় পুষ্প নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে, সে জপ-ধ্যান করে লুকিয়ে, যতীনদার সামনে সে মস্ত বড় কোনো যোগিনী সাজতে চায় না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর?

—তারপর তখুনি বুঝলুম, তুমি মাতৃগর্ভে ঢুকে গিয়েচ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার তো সব বিস্মৃতি এসে গেল, আমি মরি ছুটোছুটি করে। ছুটি করুণাদেবীর কাছে, আমার গুরুদেবের কাছে ছুটি। করুণাদেবী বল্লেন, মার মনে দুঃখ দিয়ে তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না—

যতীন হেসে বল্লে—পৃথিবীতে মরে গেলুম, আর তোমাদের এখানকার ভাষায় বেঁচে গেলুম, এ বেশ মজার কথা বলচো কিন্তু পুষ্প। আরও দুবার এর আগে এমনি বলেচ 'বেঁচে গেলে যতীনদা'—আরে, মরেই তো গিয়েচি আজ সকালে পৃথিবীতে?

পুষ্প হেসে বল্লে—তারপর শোননা। করুণাদেবী মাকে কাঁদাতে পারবেন না—গুরুদেব বল্লেন—তোমাকে মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন থাকতে হবে—তারপর ভূমিষ্ঠ হতে হবে তবে তিনি চেষ্টা করবেন—

—কি চেষ্টা করবেন—শিশুহত্যার?

—তোমার অজ্ঞান অন্ধকার কাটেনি দেখচি এখনো—

—না, আমার মনে খট্‌কা লেগেছে। পুষ্প, আমায়—তোমাদের ভাষায়—'বাঁচিয়ে' খুব ভাল করেচ, কিন্তু ওই মেয়েটির কান্না—আমার মায়ের ওই কান্না—

যতীনের চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প হেসে বল্লে—চলো গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই। এতদিন তোমায় বলিনি তাঁর কথা—তোমার মন আজ ভাল না, চলো আমার সঙ্গে—

—সে কতদূর?

—পঞ্চম স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে—তোমাকে আবরণ দিয়ে শক্তি দিয়ে নিয়ে যাবো, নইলে তোমার জ্ঞান থাকবে না অত ওপরে। কিছু দেখতেই পাবে না—

যতীন খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বল্লে—বোসো পুষ্প, দেখে আসি মা কি করচেন—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—কে মা? কিসের মা? বৈষ্ণবী মায়ায় ভুলো না। অনন্ত পথে কত মা, কত বাবা, কত ছেলে, কত স্ত্রী। প্রত্যেকেই অ-বিনাশী আত্মা, প্রত্যেকেই লীলা করচে। চলো—

—না পুষ্প, আমার সত্যিই এখনো তোমার মত জ্ঞান জন্মায় নি মনে। এখনো মায়া-দয়া মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারিনি। তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তোমরা থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই, সত্যি বলচি। আমাকে যেতেই হবে মাকে দেখতে। আজ সকালে মার সেই বুকফাটা কান্না আমারই জন্যে, সে আমি ছেলে হয়ে কি করে ভুলি?

পুষ্প মৃদু হেসে একটু ধীরভাবে বল্লে—উঃ, কি বাঁধন, তাই দেখচি! মায়ার শক্তি আছে বটে! এড়ানো বল্লেই কি এড়ানো যায়? মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর লীলা তা হোলে হয় কি করে!

পরে সে হঠাৎ সুস্বরে গেয়ে উঠলো দুটো মাত্র কলি—

'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে?

কারাগার ভাঙতে কি পারো, ও যে মায়ার পাঁচিল আছে ঘিরে!'

যতীন ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—থাক্, থাক্, ব্রহ্মবিদ্যে এখন তুলে রেখে দাও, ওসব, সইবে না ধাতে।

পুষ্প হেসে বল্লে—কেমন গলা, যতীনদা?

—চমৎকার!

—তা এখন মার কাছে না গিয়ে এর পরে যেও।

—আমি একবার দেখে আসি, বোসো—

আবার সেই কোলা-বলরামপুর গ্রাম। বেলা দুপুর। বৃষ্টি থেমেচে, কিন্তু আকাশ মেঘ-মেদুর। সজল বর্ষার বাতাস বইচে, সারারাত্রি বর্ষণের ফলে পথে-ঘাটে জল দাঁড়িয়েচে। বৃষ্টিসিক্ত লতাঝোপের পত্রপুঞ্জ থেকে টুপটাপ বৃষ্টির জল ঝরে পড়চে এখনো।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েটি খেতে বসেচে। কলাইয়ের দাল, মোচা ছেঁচকি আর কাঁচকলা ভাজা। সকালবেলার সেই প্রৌঢ়াও পাশে বসে খাচ্চে। সে খেতে খেতে বল্লে—একটু ডাল দেবো বৌ?

—না, আমি আর কিছু খাবো না মাসি। যা খেয়েচি সকালবেলা, পেট ভরে গিয়েচে—

—‘ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই বৌ, আবার কোলজোড়া ছেলে পাবে, হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক্।

মেয়েটি ভাত খাওয়া ছেড়ে হাত তুলে বল্লে—কি মুখ চোখের ছিরি, মাসি—ও যে বাঁচবে না সে আমি জানি—আমার কপালে কি অমন ছেলে বাঁচে। সেবার কিসে কামড়ালো রাত্তিরে, ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠলো, আমি তাড়াতাড়ি টেমি জ্বেলে দেখি ছেলের কাঁথার তলায় এতবড় কাঁকড়া বিছে! সেই রাত্তিরে কাঁটানটের শেকড় বেটে, জলপড়া এনে নাপিতবাড়ি থেকে দিই। আহা, আশ্বিন মাসে একবার এমন কাশি হোল যে বাছা দম আটকে বুঝি যায়—কি যে বল্লে শিবু ডাক্তার, হুপিং কাশি না কি—যে ক’দিন ছিল, কষ্টই পেয়ে গিয়েচে বাছা আমার!

প্রৌঢ়া বল্লে—কেঁদো না বৌ, ছিঃ,—ভাতের থালা সামনে কাঁদতে নেই দুপুর বেলা। অলক্ষণ।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আর আমার লক্ষণ অলক্ষণ সব হয়ে গিয়েচে মাসি—এখন তোমরা বলো আমিও তার সঙ্গে চলে গিয়ে হাড় জুড়ুই। আমি কি করে খোকার মুখ না দেখে থাকবো, ও মাসি!

মেয়েটি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো ডাল ভাত মাখা হাত তুলে হাঁটুর ওপর রেখে।

—ছিঃ বৌ, ওকি! খাও, খাও, আরে অমন করে না। তুমি তো অবুঝ নও, আবার হবে, এই-স্ত্রী মানুষ, ভাবনা কি? কোল জুড়ে আবার পাবে—

যতীনকে নিয়ে টেনে বার করাই কঠিন সেখান থেকে। পুষ্প অনেক কষ্টে তাকে কোলা-বলরামপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল বুড়োশিবতলায়।

বল্লে—খুব মন কেমন করচে মার জন্যে?

—সত্যিই, এত কষ্ট দিয়ে এসে অপরের মনে, আমার কোনো সুখ হবেনা এ স্বর্গে। এ যেন পানসে হয়ে গিয়েচে। জগতে যখন এত কষ্ট—তখন আমি সুখে থেকে কি করবো পুষ্প। পৃথিবীই আমার ভাল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানে জমি চাষ করি, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াই, মাকে খাওয়াই। দেখলে না মায়ের খাওয়া গেল? আমি সেই মায়াবাদী সন্নিসিকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করি, সবাই যদি সমাধি লাভ করে ব্রহ্মে লয় পাবে, তবে জগৎসংসার চলবে কাদের নিয়ে? সব নিয়েই তো সংসার। চাষা যদি লাঙল নাচষবে, তাঁতি কাপড় না বুনবে, মজুর যদি তোমার আমার হয়ে না খাটবে—তবে একদিন সংসার চলে কেমন চলুক তো? তুমি তো বলচো সব মিথ্যে, সব ভুল—

—এ কথার উত্তর আমি তোমায় এখুনি দিতে পারি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না আমার মুখ থেকে শুনলে। তাই এর জবাব দিলাম না।

—জবাবে দরকারও নেই। তুমি কেন আমাকে নিয়ে এলে পৃথিবী থেকে?

—কেন নিয়ে এলুম! শুনবে তবে? আমি আনিনি। তোমার অদৃষ্ট তোমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়েছিল, অদৃষ্টই আবার এনেচে। পৃথিবীতে পুনর্জন্মের সময়তোমার আসেনি—দৈবদুর্বিপাকে পুনর্জন্মের টানে জন্মাতে বাধ্য হয়েছিলে। ও একটা দুর্ঘটনা—যেমন ভূমিকম্প। ও থেকে তোমার কর্মফল তোমাকে মুক্ত করে আনতো—এনেওচে। আমি কে? আমি সাহায্য করেচি মাত্র। পুনর্জন্মের জন্যে অত ভেবো না—ও যখন হবে, তখন কেউ রুখতে পারবে না।

—আমার ভাল লাগে না...পৃথিবীতে এত কষ্ট! এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কোন্ প্রাণে... ওদিকে আশা, এদিকে আমার মা—

—পৃথিবীর মানুষ তুমি এখন আর নও এই কথাটা ভুলে যাচ্চ। পৃথিবীর মানুষ যখন ছিলে, তখন যে কথা বলচো তা বল্লে মানাতো। বিধাতার নিয়মই এই, পৃথিবীর জীবন থেকে এখানে আসতে হয়। সকলের জন্যে কষ্ট করবো বল্লেই তোমার শুনচে কে? নিয়মের অধীনে তোমাকে চলতে হবে। ভগবান তোমার আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। তাঁর আইন মেনে নিতেই হবে। কেন এরকম হোল, এর জবাব তিনিই দিতে পারেন। আমার সেই গুরুদেবের কাছে যাবে? তিনি তোমায় বোঝাতে পারবেন।

—না, আমার গুরু-টুরুতে দরকার নেই পুষ্প, তুমি ক্ষ্যামা দাও—ঢের হয়েচে। আমার বড় ইচ্ছে সেই মায়াবাদী সমাধিবাজ সন্নিসিটার সঙ্গে—

—মহাপুরুষদের সম্পর্কে তোমার মুখের ভাষাগুলো একটু ভদ্র করো যতীনদা—

এমন সময় বুড়োশিবতলার ঘাটে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

হঠাৎ দুজনেই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো, পশ্চিম দিকের আকাশ যেন প্রজ্বলন্ত উল্কার মত কোন্ আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেচে বহুদূর পর্যন্ত। আরও একটু পরে ওরা দেখতে পেলে, বহুদিন আগেকার দেখা সেই পথিক দেবতা শূন্যপথে চলেচেন। মনে হোল যেন তিনি ওদের দিকেই আসচেন, সেই রকম একটা নীল আলো ওদের সাগঞ্জ-কেওটার ঘাট অবধি এসে পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর পথ গেল বদলে। তিনি আরও দূরের কোন্ গ্রহলোকের দিকে যাত্রা করলেন। যতীন প্রথমটা চিনতে পারেনি। বললে—উনি কে পুষ্প?

—চিনতে পারলে না যতীনদা? উনি সেই পথিক দেবতা, এককল্প পূর্ব থেকে যাত্রা করেচেন এই বিশ্বের শেষ দেখবেন বলে কিন্তু এখনো এর একাংশও দেখে উঠতে পারেননি—কত নীহারিকা, কত নক্ষত্রলোক, কত গ্রহলোক তিনি ঘুরেচেন, এমন কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী—তবু এর কোন হদিস তিনি পাননি। মনে নেই, সেই এখানে ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছিলেন? পৃথিবী শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটা আবার কোন্ গ্রহ! সূর্য কোন্টা চিনতে পারেননি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েচে।

পুষ্প একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে বল্লে, তাই তো বলচি যতীনদা, এই সামান্য সৌরজগতের এই ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীর মায়া তুমি কাটাতে পারচো না, অথচ দেখ তুমি যে লোকে এসেচো সেখানে একটু সাধনা করলেই তুমি অমনি কত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ, তার কোটি কোটি গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে পাবে! কত দেখবার আছে, কত জানবারআছে যতীনদা, সে সব তোমার দেখতে জানতে ইচ্ছে করে না?

যতীন তখনই কোন জবাব দিতে পারলে না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর সহসা উত্তেজিত সুরে বল্লে—আমি সব দেখব, বুঝবো পুষ্প। আমার চোখ উনি অনেকখানি যেন খুলে দিয়ে গেলেন। চলো করুণাদেবীর কাছে—

—এখুনি?

—এতটুকু দেরি নয়।

আবার সেই উচ্চ আত্মিকলোকের বায়ুস্তর, চক্ষের নিমেষে পুষ্পের সাহায্যে যতীন শত শত যোজন, যোজনের পর যোজন পার হয়ে চললো। করুণাদেবীর আশ্রম সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে ওরা পৌঁছে দেখলে কেউ কোথাও নেই। সেই কুসুমিত উপবন, সেই প্রাচীন বৃক্ষতল যেখানে রাজরাজেশ্বরীর মত রূপসী দেবী সেদিন এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, আজ সে স্থান জনশূন্য।

যতীন হতাশার সুরে বলে—তাই তো! এ যে দেখচি—

—জগৎ-সংসারের কাজে সর্বদা ঘুরচেন, কি জানি কোথায় গিয়েচেন—

—কিন্তু কি সুন্দর দেশ এটা! আমার ইচ্ছে করে এখানেই থাকি। বুড়োশিবতলার ঘাট এমন করে নেওয়া যায় না?

—অনেক বেশি শক্তি দরকার এমন দেশ গড়তে, আমার তা নেই যতীনদা। এদেশ শুধু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে সুন্দর হয় নি, মনের ওপর এর প্রভাব বুঝতে পারচো নিশ্চয়ই। আমরা যেন অনেক উঁচু জীব হয়ে গিয়েচি; শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, দেহমন কত উঁচু ধরনের হয়ে গিয়েচে।

এমন সময় একটি বিস্ময়কর আবির্ভাবের মত করুণাদেবী হঠাৎ যেন জ্যোতিঃপদ্মের মত ফুটে উঠলেন সেই বনস্থলীর প্রান্তে। স্নেহ ও প্রসন্নতা দেবীর বিশাল চক্ষু দুটির ঘন নীল তারকায়। হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের দেখে এক জায়গা থেকে ফিরে এলাম—

পুষ্প লজ্জিত ও অপ্রতিভের সুরে বল্লে—আপনার কাজে বাধা দিলাম দেবী?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—না। আমিও ইচ্ছে করেছিলাম তোমরা আজ এখানে আসবে—বসো, এসো এই গাছের তলায়।

যতীন ও পুষ্প গাছের তলায় ওঁর পাশে বসে পথিক দেবতার অদ্ভুত আবির্ভাবের ব্যাপার বল্লে। করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—ভগবান বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কোনো নাস্তিক দেবতা, তবে মহাশক্তিধর বটে। আমার জানা নেই।

যতীন বল্লে—এত যিনি দেখে বেড়াচ্চেন তিনি নাস্তিক?

—ওঁরা অন্য বিবর্তনের প্রাণী।

—পৃথিবীর নয়?

—না, অন্য কল্পের। সে শুনবে এখন। চলো, যেখানকার কাজ ফেলে এখানে এসেচি, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাই।

দুজনেই চোখ বোজে। যতীনের জ্ঞান যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো সে উচ্চস্তরে গিয়েও কিছু দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। এক মুহূর্তে ওরা অনুভব করলে খুব অদ্ভুত এক জায়গায় এসেচে। ওরা এক নিমিষে যেন বিরাট আত্মা হয়ে গিয়েচে, বাধাবন্ধনহীন সর্বসংস্কারমুক্ত দেবাত্মা। দেশ ও কাল উপন্যাসের কাহিনী যেন—এই ছিল কোথায়, এই এল কোথায়। দেশ অতিক্রম করতে হোল না, কালের ব্যবধান অনুভূত হোল কই?

সেও এক বিচিত্র দেশ। বাতাসে যেন নব প্রস্ফুটিতা মৃণালিনীর সুগন্ধ। এক বিশাল সুনীল সমুদ্রের ঢেউ তটশিলায় এসে আছড়ে পড়চে; সমুদ্রের মাঝে মাঝে ম্যাজেন্টা রঙের, ধূসর কৃষ্ণ রঙের ছোট-বড় পাহাড় ইতস্তত ছড়িয়ে। সমুদ্রের তীরে একটি অরণ্যবৃক্ষের তলে এক রূপবান জ্যোতির্ময় তরুণ দেবতা বসে একমনে চিন্তা করচেন।

যতীন এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি, এমন অপূর্ব রূপবান মহাজ্যোতিষ্মান দেবমূর্তি।সে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

পুষ্প তাঁকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে গেল অন্য কারণে। এঁকে সে অনেক বছর আগে দেখেছিল, যেদিন সে যতীনকে পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে তার সংজ্ঞাহীনদেহ দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। সেই তরুণ দেবতা, যিনি সেদিন শৈলশিখরেবসেছিলেন।

দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে বল্লেন—এরা কে?

পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি আমাকে দেখেচেন এর আগে—সেই একদিন—

করুণাদেবী বল্লেন—এদের কথা তোমাকে বলেছিলাম। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। তোমার পৃথিবীরই নাম বাপু—

দেবতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—ও, বুঝেচি।

পরে যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—কিন্তু একে নিয়ে এসে ভাল করলে না। এর এখনো অনেক দেরি। পার্থিব তৃষ্ণা এর এখনো যায়নি। এত উঁচু স্বর্গে একে আনলে এর ফল হবে এই, আগামী জন্মে এর স্মৃতি ওকে কষ্ট দেবে—কোন কিছুতে মন বসাতে পারবে না। তুমি তো জানো, তৃতীয় স্তরের কোনো লোককে এখানে আনা সেই ব্যক্তির পক্ষেই ক্ষতিকর।

করুণাদেবী ঝগড়া করার সুরে বল্লেন—বেশ করেচি, যাও। তুমি ওর সব স্মৃতি মুছে নিও, নয়তো আমি দেবো। দেখাতে নিয়ে আসিনি শুধু, ওর অনেক প্রশ্ন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়েচে।

যতীন ভাবছিল তার কি মহাপুণ্য ছিল, আজই এমন দুটি জ্যোতির্ময় দেবতার দর্শন লাভের সৌভাগ্য তার ঘটলো! কি অদ্ভুত রূপ!

সে বিনীত সুরে বল্লে—যদি দেখার সৌভাগ্যই ঘটলো, তবে দেবতা, আমায় এমন করে দিন, যাতে এখানে বার বার আসতে পারি বা আপনার দেখা পেতে পারি তারব্যবস্থা করে দিন।

তরুণ দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—ওই দেখলে তো কি বলচে? এদের অজ্ঞানতা ঘুচতে অনেক বিলম্ব।

পুষ্প হাত জোড় করে বল্লে—আপনি ওঁকে দয়া করে ক্ষমা করুন। উনি নতুন এ স্তরে এসেচেন, এখানকার কিছুই জানেন না।

যতীন অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে—আপনি দয়া করলেই সব হবে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওদিকে একজন কে এসেছিলেন, তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েচি। আমার সব জানবার ইচ্ছে হয়েচে, তিনি কত গ্রহনক্ষত্র বেড়িয়ে এসেচেন—আমায় এর আগে বলেছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—

দেবতা বল্লেন—কে?

করুণাদেবী বল্লেন—পথিক কেউ হবে। দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানোই তাঁর কাজ বলে মনে হোল। নাস্তিক দেবতা।

তরুণ দেবতা একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লেন—নাস্তিক কি? মনে হয় না। ওদের উপাসনাই ওই। বিশ্বে-ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক আবিষ্কারক আছে, এদের শক্তি যথেষ্ট, তেজ অসীম। তাদের মধ্যে কেউ হবে। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে চলো আর একটা জায়গা দেখিয়ে আনি—

যতীন বল্লে—দেবতা, আপনার কথা আমি ওই মেয়েটির মুখে আগে শুনেচি। তবে আপনাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

—না, কি করে দেখবে। পুষ্প আর তুমি এক স্তরের লোক নও—

পুষ্প বল্লে—উনি এক বিপদে পড়েছিলেন—চুম্বকের ঢেউ-এ পড়ে পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—সবে এসেচেন সেখান থেকে।

দেবতা ধীরভাবে বল্লেন—তা সম্পূর্ণ সম্ভব। খুব সাবধানে চলাফেরা কোরো। ওই যে পথিক দেবতার কথা বলছিলে, ওঁরা এ কল্পের জীব নন। পূর্ব কল্পে ওঁদের দেবত্বপ্রাপ্তি হয়েচে—মুক্ত আত্মা হয়ে বহু উর্দ্ধে উঠে বহু তেজ সঞ্চয় করেচেন, কিন্তু ওঁরাও পুনর্জন্মের আকর্ষণকে ভয় করে চলেন। তবে এই লোকটির এখনো অনেক জন্ম বাকি—একে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে অনেকবার।

যতীন বার বার ওই কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বিরক্তি না চাপতে পেরে বলে উঠলো—দেব, তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কষ্টটা কি?

—আমি জানি। যে জানে সে ও বিশ্বের সব কিছু এবং বিশ্বদেব একবস্তু এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তার পক্ষে পৃথিবী বা স্বর্গ সমান হয়ে গিয়েচে। যে জানে পৃথিবীর সবকিছুই তিনি, তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ একই সুরে বাঁধা মোহন সঙ্গীতে। তোমাদের জ্ঞানী লোকেরা তাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধারী কল্পনা করেচেন। কিন্তু এ চোখে পৃথিবীর সবাই দেখে কি?সাধারণ মানুষ কর্ম অনুসারে প্রথম তিন স্তরেগতাগতি করে, ম'রে ভূলোক থেকে ভুবর্লোকে আসে, সেখানে থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে আসে—আবার সেখান থেকে জন্মায় পৃথিবীতে, আবার মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। একে বলে মানব-আবর্ত। চাকার মত ঘুরচে এই আবর্ত—চলো, একটা ব্যাপার তোমায় দেখাই, পৃথিবীতেই চলো, সেখানে তোমরা সহজ ও স্বচ্ছন্দঅবস্থায় থাকবে। চলো তোমাদের দেশেই নিয়ে যাই—

মহাশূন্যের পথহীন পথে করুণাদেবী ওদের নিয়ে আগে আগে চল্লেন। দূরে একটা কি বিশাল গ্রহ নিরন্ধ্র অন্ধকার সমুদ্রে পাক খেয়ে ঘুরচে। হু-হু করে নেমে এল—একটু পরে পৃথিবীর এক তুষারাবৃত পর্বতশিখর ডিঙিয়ে ওরা এক নদীর ওপরকার শূন্যে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দেবতা পিছনে পিছনেই আসছিলেন। বল্লেন—এটা চিনতে পারচো কী নদী?

যতীন বল্লে—না দেব, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে—কিছু দেখতে পাচ্চিনে—এখন বোধ হয় রাতদুপুর।

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—এত বড় নদী বাংলাদেশে কটা আছে। আন্দাজ করে বলো।

—আজ্ঞে, হয় গঙ্গা, নয় পদ্মা।

—ওই রকমই, এটা গঙ্গা।

দেবতা হেসে বল্লেন—তুমিও ঠিক ভাল বলতে পারলে না, গঙ্গা তো বটে। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা—

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি বাংলাদেশের খবর সব জানেন দেখচি।

করুণাদেবী মৃদু সস্নেহ হাস্যে ওকে নেপথ্যে বল্লেন—ও রকম বোলো না। উনি কে তা তোমরা জানো না। পরে বলবো।

একটা ছোট্ট খাল। একটা আমবাগান। মুর্শিদাবাদ জেলা, সুতরাং বনবাগান বেশি নেই, মস্ত বড় মাঠ একদিকে, একদিকে ছোট্ট একটি গ্রাম। যতীন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই গ্রামের ঘরের আনাচে-কানাচে অনেকগুলিনিম্নস্তরের ধূসর ও মেটে সিঁদুরের রঙের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্চে—কেউ এ-বাড়ি, কেউ ও-বাড়ি। তারা যদি মানুষ হতো তবে আনাচে-কানাচে এদের এমনতর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হোত এরা নিশ্চয়ই চোর বা ডাকাত।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—তাই তো, এরা কি করচে এখানে?

পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আমি বুঝতে পেরেচি অনেকটা, যদি তাই হয়, যা ভেবেচি—

যতীন বল্লে—কি পুষ্প?

তরুণ দেবতা বল্লেন—পুষ্প বুঝেচে। ওরা পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। প্রতি রাত্রেই এমনি লোকের বাড়ির আশে-পাশে ঘোরে। কিন্তু ভিড় বেশি—সবাই সুবিধে পায় না। তৃষ্ণাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়। ভুবর্লোকে ওদের ভাললাগচে না, সেখানে পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনার পরিতৃপ্তি হয় না—সুতরাং ওরা চাইচে আবার দেহ ধরতে। কিন্তু তার প্রার্থী অনেক। ওদেরই মত। সুতরাং জন্ম নিতে চাইলেও জন্ম নেওয়া হয় না। উচ্চতর আত্মারা বংশ দেখে, পিতামাতা দেখে জন্ম নেওয়ার সময়ে। এদের সে সব নেই, যে কোনো বংশ, জাত, কুল হোলেই হোল। দেহ ধারণ নিয়ে কথা।

যতীন বল্লে—দেব, এরা কতদিন ধরে এমন ঘোরে?

—পৃথিবীর হিসেবে কেউ কেউ দশ বছর পর্যন্ত ঘোরে। এই এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা—এই অবস্থাকে প্রেতত্ব বলো তোমরা। কারো স্বাধীন কাজে আমরা কোনো বাধা দিই না—জীব যখন নিজের ভ্রম বুঝবে তখন সে নিবৃত্ত হবে। যতদিন তৃষ্ণা, ততদিন তাকে বাধা দিয়ে ফল হবে না। সে ভুবর্লোকে ঘোর অসুখী অবস্থায় থাকবে—তার চেয়ে, যাও বাপু, পৃথিবীতেই গিয়ে সুখী হও। চলো, এখানে কষ্ট হচ্চে—আর নয়—

ওরা যেখানে এসে বসলো, সেটা একটা পর্বতশিখর, বড় চমৎকার পাইন এবং দেওদার গাছের নির্জন অরণ্যানী। গাছের ডালে ডালে অগণিত পরগাছায় রঙ-বেরঙের ফুল। পায়ের নীচে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে, গভীর রাত্রি। আকাশের মাঝখানে চওড়া জ্বলজ্বলে ছায়াপথ, অসংখ্য ঝক্‌ঝকে তারকারাজি। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সঙ্কেত।

তরুণ দেবতা বল্লেন—এই হোল হিমালয়। বাংলাদেশের ওপরেই—ওই দ্যাখো দূরে একটা নদী নেমেচে পাহাড় থেকে—

যতীন বল্লেন—তা হলে বোধ হয় তিস্তা—

—তুমি দেখলে তো মানুষের অবস্থা?

—আশ্চর্য লাগলো, এমন হয় তা জানতাম না, দেব। আপনি যাকে মানব-আবর্ত বল্লেন, ওর উচ্চতর অবস্থা কি?

—উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান-পথে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়। স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক বলেচেন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-লোকেরা। এক কল্পকাল সেখানে থাকে উচ্চতর জীবাত্মা।

—কল্প কি?

—প্রত্যেকবার সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। এই কালব্যাপ্তির নাম কল্প। কল্পান্তে উচ্চতর জীবাত্মারও পতন হয়। তবে সত্যলোকেরও দূরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত যে ব্রহ্মলোক, সেখানে যাঁরা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানবআবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না।

—এরই নাম মুক্তি?

—একেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলেচেন। চলো তোমাকে একটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কবির কাছে নিয়ে যাবো। উপনিষদ বলে দার্শনিক কবিতা ভারতবর্ষের, তিনিও তার একজন রচয়িতা। ভ্রাম্যমাণ কবি, সব সময় পাহাড়ে সমুদ্রতীরে বনানীর নির্জনতায় কাল কাটান। পৃথিবীর মধ্যে এই হিমালয় এবং আরও অনেক উচ্চতর পর্বতের বনেবৃক্ষলতায় প্রায়ই মাঝে মাঝে রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আর মিশর দেশের এক উচ্চ আত্মার সঙ্গে পরিচয় করাবো।

—তা হোলে তো, দেব, পৃথিবীর আসক্তি তার এখনো যায়নি? অর্থাৎ আমি উপনিষদের সেই কবির কথা বলচি—

—তাঁর আসক্তি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান। কোনো পার্থিব তৃষ্ণা নয়। তাই জনলোকের অধিবাসী, নিজের আনন্দের জন্যে নেমে আসেন পৃথিবীতে। তাঁর আগমনে পৃথিবীর অনেক উপকার। বহু লেখক ও কবিকে অদৃশ্যভাবে প্রেরণা দান করেন, সেই জন্যেই তিনি পৃথিবীতে আসতে ভালবাসেন। পৃথিবীর হিসেবে বলতে গেলে বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে এ কাজ তিনি করেচেন—তাঁর কাজই ওই। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব। আমার নিজের কাজে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন আমায়।

এবার পুষ্প বিনীতভাবে বল্লে—দেব, একদিন আমাদের কুটিরে পদার্পণ করবেন দয়া করে? আপনার বন্ধু সেই তাঁকেও নিয়ে? পরে দেবীকে দেখিয়ে বল্লে—ইনিও যাবেন আমায় বলেছেন দয়া করে।

তরুণ দেবতা বল্লেন—যাবো।

পুষ্প তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে বল্লে—আমাদের ওপর আপনার এ করুণার জন্য ধন্যবাদ।

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার সঙ্গে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দেখা হয়েছিল, তিনি তাঁর নিজের শক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে আমায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়েছিলেন,সে এক অপূর্ব অনুভূতি। সে কথা আমি এখনো ভুলিনি—

—তিনি কোন যোগী সাধক হবেন। ব্রহ্মে লীন হওয়ার আস্বাদ ইচ্ছামত ভোগ করেন—মুক্ত পুরুষ। তাঁর ইচ্ছামত কায়াব্যূহ রচনা করে যে কোনো দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারেন। সমস্ত ঐশ্বর্য ওঁদের সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হয়—

—প্রভু, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই ব্যাপারের চর্চা ছিল?

—নিশ্চয়ই। যে কোনো দেশে যে কোনো সৎ, ঈশ্বরে ভক্তিমান লোক মানব-আবর্তকে জয় করতে পারেন। বিশ্বের যিনি কর্তা, তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতিকে কৃপা করেন না।

—আচ্ছা আমাদের দেশে যাঁরা বলেন, ভগবানের নাম জপ করলে মুক্তি, যেমন ধরুন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাঁদের মত কি সত্য?

—ভক্তি দ্বারা তাঁরা ভগবানে আত্মস্থ হয়ে দেবযান প্রাপ্ত হন। জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ জানবে। উপাধি ও নামরূপ ত্যাগ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই মুক্তি। বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মত। কিন্তু জ্ঞানী লোক ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করচেন বহু প্রাচীন যুগ থেকে। শুধু এ কল্প নয়, পূর্ব পূর্ব কল্পেও তাই হয়েছিল। পূর্ব পূর্ব কল্পের মুক্ত পুরুষেরা এ কল্পে পৃথিবীতে দেহ ধরে তাঁদের পূর্ব জীবনের সাধনলব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে নামেন। তাঁরাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য,বাল্মীকি, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ইত্যাদি—

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। হঠাৎ পূর্বদিগন্তে অরুণ সূর্যোদয় দূরদূরান্তরের তুষারাবৃত শৈলশিখর অনুরঞ্জিত করে অপূর্ব মহিমায় স্বপ্রকাশিত হোল এক মুহূর্তে। পলকে পলকে শিখর থেকে শিখরান্তরে বর্ণসমুদ্রের বিভিন্ন রঙের ঢেউ গেল ছড়িয়ে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে মহিমময় সৌন্দর্যের দিকে।

করুণাদেবী বলে উঠলেন সাগ্রহে—চলো মানস-সরোবরে—চলো, চলো—

তখনি ঠিক পটপরিবর্তনের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এই ছিল অরুণরাগে রঞ্জিত শৈলশিখর ও অরণ্যানী, তখনি যতীন ও পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে তাদের সামনে কোনো বিশাল জলাশয়ের নীল জলরাশি বিস্তৃত।

অপরকূলে তুষারাবৃত শৈলচূড়া, সবে প্রভাত হয়েচে কিন্তু সেই তুষারময় মেরুবৎ প্রদেশে কোনো বিহঙ্গকাকলী নেই কোনোদিকে। সমগ্র পার্বত্যহ্রদের গম্ভীর সৌন্দর্য যতীন ও পুষ্পকে মুগ্ধ করলে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওই দূরে রাবণহ্রদ, সামনে এটা মানস-সরোবর।

তরুণদেবতা বল্লেন—সামনের ওই পাহাড়ের চূড়া গুরলা মান্ধাতা আর ওই দূরে কৈলাস—

পুষ্পের মনে পড়ে গেল কৈলাস পর্বতে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করেন—ওঁদের কাউকে দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আছে তার। করুণাদেবীর কাছে সেকথা তুলতেই তিনি তরুণদেবতাকে পুষ্পের বাসনা জানালেন।

তিনি বল্লেন—একজন জীবন্মুক্ত সাধু ওখানে আছেন, আমি দু-একবার তাঁকে সাহায্য করেছিলাম কোনো কাজে। তবে তিনি আমাকে দেখেননি—চলো নিয়ে যাই।

কৈলাসপর্বত ও সম্মুখবর্তী গুরলা মান্ধাতা চূড়ার মধ্যে বরফের বিশাল ক্ষেত্র—যতীন কখনো গ্লেসিয়ার বা তুষারপ্রবাহ দেখেনি, ওর মনে কথাটা উঠলো, যা সামনে দেখচে, সেটাই বোধ হয় গ্লেসিয়ার। তরুণদেবতা ওর

মনের ভাব বুঝে বল্লেন—তুমি যা ভাবচো তা এ নয়। চলো এখান থেকে তোমায় শতপন্থ বরফস্রোত দেখিয়ে আনবো—

ওরা কৈলাস পর্বতে গিয়ে দেখলে কৈলাস একটি সম্পূর্ণ আলাদা পর্বত, তার তুষারমণ্ডিত পিনাকসদৃশ শিখরের নিম্নভাগে অনেকগুলি গুহা সাধু যোগীদের আবাস। একটি গুহায় একজন শীর্ণকায় সাধুকে দেখিয়ে দেবতা বল্লেন—এঁর কথা বলছিলাম। উনি এখন স্থূলদেহের স্থূলচক্ষে আমাদের দেখতে পাবেন না—নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় ইনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন আমাদেরও অনেক ওপরে চলে যান উনি। তবে স্থূল দেহে ওঁরা সাধারণ মানুষের সমান।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, এঁরা একা আছেন কেন?

—নির্জনতা আত্মার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। নিম্নজগতের কোনো প্রভাব এই উত্তুঙ্গ জনহীন পর্বতচূড়ায় এঁদের দেহমন স্পর্শ করে না। নির্জনতায় এঁরা শক্তি অর্জনকরেন—ব্রহ্মজ্যোতিঃ এঁদের মনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এ অবস্থায়।

—আমি এঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?

—কি করে? তুমি স্থূল দেহ ত্যাগ করেচ, উনি এখন দেহে অবস্থান করচেন। তা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, ওই যে একজন তিব্বতী লোক মানস-সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিল তখন, ওরা কি অবস্থায় আছে? ওদের মুক্তি বা উন্নতি—

দেবতা হেসে বল্লেন—ওদের থাক্ আলাদা। নিম্নস্তরের চৈতন্য নিয়ে জন্মেচে—সঙ্কুচিত চেতন। ওরা মরবে, অমনি অল্পদিন পরেই আবার দেহ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে, কারণ ভুবর্লোকে ওদের চৈতন্য মোটেই থাকে না। যদিও থাকে, খুব কম। দেহ না নিলে উপায় হয় না—সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের প্রায় স্থূলদেহেই বর্তমান থাকতে হয়—পৃথিবীর কামনা বাসনার উর্ধ্বে ওদের উঠতে অনেক দেরি। সভ্য সমাজের এমন অনেক আছে—খুনী, দস্যু, অলস, চোর, পরপীড়ক ইত্যাদি।

করুণাদেবী হেসে দেবতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—এ তুমি খুব ভালই জানো কারণ তোমার হাতের কাজ এটা, কে কতদিন ভুবর্লোকে বাস করবে কি নতুন জন্ম নেবে। উঃ, দু-একটা ব্যাপার এমন নিষ্ঠুর আর করুণ হয়ে ওঠে তখন আমি অনুরোধ করতে বাধ্য হই—

তরুণদেবতা হাসলেন মাত্র—সে হাসির মধ্যে অসীম দয়া, অনন্ত জ্ঞান ও গভীর শক্তির আভাস।

পুষ্প চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, উনি কে? এই অদ্ভুত দেবতা?

—উনি?

পরে হেসে দেবতার দিকে চেয়ে বল্লেন—এইবার ওদের বলি?

বলেই চুপ করে গেলেন।

পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে—আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশচেন! এত বড় উনি! অথচ—

দেবতা এবার হেসে এগিয়ে এসে বল্লেন—মানুষ কি কীট? তোমরাও তিনি। তোমাদের ঋষিরাই বলেচেন—কিঞ্চাইং ন তু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে, যোঽসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃতাবয়বঃ পুরুষঃ সোঽহং ভবামি—আমি ভৃত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎকার যাচ্ঞা করচিনে—সবিতৃমণ্ডলে যে ওঙ্কারময় পুরুষ, আমিই সেই। তুমি আমি ভিন্ন কোথায়? ছোট ভাবো কেন, তাই তো ছোট হয়ে থাকো। বড় হও, বীর্যবান হও। সচেতন হয়ে যদি তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁড়াও বিদ্রোহের পথে—সেও ভাল। তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে। যে দুর্বল, তার দ্বারা কি কাজ হবে? যে শক্তিমান, অথচ বিদ্রোহী—তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসতে আমরা জানি।

যতীন কৌতূহলের সঙ্গে বল্লে—এই যে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি,...এও কি আপনার ইচ্ছার অনুযায়ী?

—তুমি বুঝতে পারলে না। প্রত্যেক ঘটনা মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এর দ্বারা জাতি শক্তিমান হয়। কি হয় যুদ্ধে?মানুষ মারা যায়। মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। এই তো?কিন্তু মৃত্যর অসত্যতা এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝেছ। আরামের অত্যন্ত সুযোগ মানুষকে অলস, পশুবৎ করে তোলে। আমার পৃথিবী কতকগুলি আরামপ্রিয়, রোমন্থনকারী, নিজের অবস্থায় মহাপরিতুষ্ট গোরুর দলে ভরে তুলতে আমি চাইনে। শক্তিমান হয়ে উঠুক সব। কে কাকে মারচে? সব মিথ্যে। দুদিনের আরাম কিসের? অনন্ত বিশ্ব তোমাদের পায়ের তলায়। সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ,যা যখন ভাববে, মুক্ত পুরুষে তাই তখন পায়। পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনাকে জয় করো—আরামের ইচ্ছা মন থেকে তাড়াও। নয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

করুণাদেবী বল্লেন—এদের বৃহস্পতি গ্রহের দুই উপগ্রহে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও না?

—দেখাবো। সে দুটো ধীরগামী জগৎ, যারা পৃথিবীতে সুবিধেমত উন্নতি করতে পারচে না, আমরা তাদের ওই সব মন্থরগতি জগতে পাঠিয়ে দিই জন্ম নিতে। সেখানে গেলে আশ্চর্য ব্যাপার দেখবে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওদের এখুনি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—

আবার মানস-সরোবর ও হিমালয় ওদের পায়ের তলায় দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। আবার অসীম ব্যোম—অন্ধকারে ডুবে পৃথিবী দিগন্তহীন আকাশে অদৃশ্য হোল। আকাশের অদ্ভুত দৃশ্য, দিনমানে সব দিক নক্ষত্রযুক্ত।

তারপরে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় প্লাবিত আকাশপথে এক বিশাল মহাগ্রহ ওদের দিকে যেন দ্রুত ছুটে আসচে। করুণাদেবী বল্লেন—বৃহস্পতি।

কিন্তু বৃহস্পতি খুব বড় মশালের আলোর মত ওদের দক্ষিণে দূরে পড়ে রইল। ওরা অন্য একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর খুব নিকটে এসে তার বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়লো।

যতীন বল্লে—কিসে যেন পড়েছিলুম, পৃথিবী ছাড়া সোলার সিস্টেমের অন্য কোনো কিছুতে মানুষ নেই!

গ্রহদেব বল্লে—সে সব কথা এখন থাক। এই পৃথিবীটা দেখে নাও আগে—

পৃথিবীর মত অবিকল সে স্থান, খুব বেশি ফুল, ছোট বড় নদী। বসন্তের হাওয়া বইচে, বিহগের সুস্বর সর্বত্র, নির্মল জলাশয়। গ্রহটির একদিকে রাত্রির অন্ধকার, অন্য দিকে দিবসের আলো। যে অংশে ওরা গেল সেখানে মানুষের কর্মব্যস্ততা নেই, নিশ্চিন্ত মনে সকলে নিজের নিজের বাড়িতে বসে আছে। গৃহস্থাপত্য অতি সুন্দর, সব রকম শিল্পকলার অদ্ভুত উন্নতি হয়েচে সেখানে, দেখেই মনে হোল, সর্বত্র সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েরা বনে উপবনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চে পরম নিশ্চিন্ত মনে, যেন তাদের হাতে অতি সুদীর্ঘ অবকাশ, যেন সারা দিনমান শুধু কমলের বনে অলস পদচারণ জীবনের সব মুহূর্তগুলি ভরে দেবে অমৃতে। শান্ত ও অপরূপ সৌন্দর্যের রূপায়তন সে পৃথিবীর সুশ্যামল প্রান্তরে, ফুলফোটা বনে ঝোপে গন্ধে ভরা কুঞ্জতলে।বৃহস্পতির আলো পড়ে যে অংশে রাত্রির অন্ধকার, সে অংশের শোভাও চমৎকার—তবে সমগ্র পৃথিবীটি একটি নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব শান্তির গভীরতায়, ব্যস্ততাহীন জীবনমুহূর্তগুলির পুঞ্জীভূত ভারে যেন ঘুমিয়ে আছে, এলিয়ে আছে, কিসের অলীক স্বপ্নে দিনরাত্রি বিভোর।

করুণাদেবী বল্লেন—এই দেখ যে পৃথিবীর কথা তোমায় বলেছিলাম।

—স্লো—মানে ধীরগামী পৃথিবী?

করুণাদেবী হেসে ফেলতেই যতীন অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—না, ইংরিজিটা আপনি হয় তো জানেন কি না—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও ভাষা কি আপনারা—মানে ম্লেচ্ছ ভাষা—

গ্রহদেব বল্লেন—তুমি এখনো বুঝলে না। আমাদের কোনো ভাষা নেই, যখন যে পৃথিবীতে, যে মানুষের সঙ্গে কথা কই—তাদের ভাষাই আমাদের ভাষা। পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোন ভাষাই হোক—তা আমাদের আপন। ইটালী দেশের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাদের ভাষাতেই বলবো—

—আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা তাহোলে কি ভাষায়—কেন, বাংলাতেই তো আপনাদের মধ্যে বলছিলেন?

করুণাদেবী বল্লেন—মুখ দিয়ে কথা বলার দরকার হয় না কোনো স্বর্গেই—চতুর্থ স্তরের ওপরে কোথাও।মনের মধ্যে পরস্পরের কথা ফুটে ওঠে—আরও ওপরে স্বর্গে রঙিন্ আলোর বিদ্যুৎশিখার মত আলোর ভাষায় আদানপ্রদানে কথাবার্তা চলে। আমাদের ভাষা তোমাদের মত 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো'তা হয় না। মরমেই আগে পশে—কান শুনতেই পায় না—শোনবার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হচ্ছে বলেই আমরা মুখের ভাষা ব্যবহার করি।

পুষ্প বল্লে—এই পৃথিবী কিন্তু আমার বেশ লাগচে। একটু বেড়ানো গেলে মন্দ কি?

বৈশ্রবণ বল্লেন—বেশ তো, ভাল করেই দেখতে পারো।

এক হ্রদে কতকগুলি সুসজ্জিত নরনারী নৌকাতে প্রমোদবিহার করছিল। দেবতা সেখানে গিয়ে বল্লেন—ক'বছর এরা এমনিধারা জল-বিহার করচে জানো? তোমাদের পৃথিবীর মাপে তিনটি বছর। তাড়াতাড়ি নেই কিছু এদের।

যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—তিনটি বছর!

—ঐ যে বল্লাম ধীরেসুস্থে এখানে সব হয়। নৌকাতে জলবিহার চলচে তো চলচেই। ওদের গিয়ে বল যদি, বিস্মিত হবে।

যতীনের মনে পড়ে গেল বাল্যে কলেজের ক্লাসে পড়া টেনিসনের কবিতার সেই মৃণাল-ভোজীর দেশ বা Land of Lotus-eaters!...সেখানেও সব লোক—

পরে কার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্চে ভেবে সে লজ্জায় চুপ করে গেল।

দেবতা বল্লেন—চলো আরও দেখবে।

এক পাহাড়ের শ্যাম সানুতে বনপুষ্পবিকশিত নির্জন অঞ্চলে সে দেশের কবিকুলের মজলিস বসেচে। সেখানে সুদীর্ঘসময়-ব্যাপী গোধূলিতে তারা আরামে কাব্য আলোচনা করচে, পরস্পর পরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনাচ্চে নৈসর্গিক শোভা, বনপুষ্পের লাবণ্য সম্বন্ধে নানা কবিতা। নারীপ্রেম নিয়ে কত সঙ্গীত রচনা করে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতি সুকুমার মাধুর্যের সঙ্গে ললিত স্বরে গাইচে—যেন জীবন অনন্ত, সময় অনন্ত। সে সঙ্গীতের ঘুমপাড়ানি মাধুর্য সত্যিই চোখে ঘুম নিয়ে আসে, শুনে যতীনের সত্যিই মনে হচ্ছিল দিগন্তের পাণ্ডুর শোভা শৈলসানুতটে যে শান্তি ও শ্রী বিস্তার করচে তাতে সব ভুলিয়ে দেয়, জীবনের যুদ্ধ অবাস্তব কাহিনী—জীবন শুধু এমনি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গোধূলি দিয়ে ভরা—আর কোথাও ছুটোছুটি করে কি হবে, এখানেই ঘুমিয়ে পড়া যাক দিব্যি।

যতীন বল্লে—আমাদের পৃথিবীতেও এরকম নেই কি দেব?

—আছে, সে অন্য রকম। এরা এদেশের বসন্তকাল ব্যেপে এরকম উৎসব চালাচ্চেএদের বসন্তের স্থায়িত্ব কত জানো? ন'বছর পৃথিবীর হিসেবে।

যতীন হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবতার মুখের দিকে।

করুণাদেবী ওর বিস্ময় দেখে কৌতুক অনুভব করলেন। বল্লেন—নইলে তোমার ভাষায় স্লো ওয়ার্ল্ড হবে কি করে?

ও আরও অবাক হয়ে বল্লে—বা রে, আপনি যে ইংরিজি—

—সব ভাষাতেই কথা বলতে পারি আমরা, বল্লাম যে। ভাষা কিছুই নয় আমাদের কাছে। তারপর শোনো, এদের বছর কতদিনে জানো? পৃথিবীর ষাট বছরে এদের দেশের এক বছর। ঐ দেখ বৃহস্পতি গ্রহ ঘুরচে কত আস্তে আস্তে। সূর্য থেকে যে গ্রহ যত দূরে, তার আবর্তন তত স্লো। আবার এই উপগ্রহের একটা নিজস্ব আবর্তন আছে নিজের কক্ষে—সব মিলিয়ে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ বছর এখানে। মানুষও ধীর গতিতে চলে, বহু সময় নিয়ে কাজ করে, বহু সময় নিয়ে আমোদ করে, বদলায় অনেক সময় নিয়ে। পৃথিবীর মত তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই।

—এদের আয়ু?

—তিনশো বছর প্রায়, তোমার পৃথিবীর হিসেবে। ধীরগামী আত্মা, পৃথিবীর পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যারা উন্নতি করতে পারবে না, কিছু বুঝতে পারবে না—এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তারা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে।

—কি রকম ব্যবস্থা বড় জানতে ইচ্ছে হচ্চে—

দেবতা হেসে বল্লেন—রুদ্র ব্যবস্থা কিছু নেই, পৃথিবীতে যেমন আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাধি, মহামারী, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ। এখানকার মানুষেরা একটু অলস, একটু ধীর-বুদ্ধি—এদের ওপর দয়া করতে হয় অনেকখানি। সবই তাঁর ব্যবস্থা (এখানে গ্রহদেবের মুখশ্রী শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে কোমল হয়ে এল), তিনি তাঁর অসীম করুণায়এ ব্যবস্থা করেচেন—আমরা তাঁর নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র। এ কি দেখচো। এর চেয়েও ধীরগামী জগৎ আছে, তবে এ সৌরমণ্ডলে নয়। তিনিই এই সব অলস জড়বুদ্ধি জীবের জগতে উচ্চস্তরের দেবদূত পাঠিয়ে দেন, তাঁরা দেহধারণ করে আসেন এদের শিক্ষা দিতে। তাঁরাই এ সকল পৃথিবীর শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, ব্যাস, দ্বৈপায়ন—সবাইকে তাঁর লীলাসহচর না করে নিলে তাঁর সুখ নেই। তাঁর অপার অনন্ত করুণার কথা তোমরা কি জানো? কেবল দুঃখ হয় মানুষে তাঁকে আগাগোড়া ভুল বুঝছে। কে তাঁকে জানে বা জানবার চেষ্টা করে? মানুষ যদি এক পা এগিয়ে যায়, তিনি তিন পা এগিয়ে আসেন মানুষের দিকে। অথচ সবাই নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত, পৃথিবীর সুখ নিয়ে দিশাহারা—তিনি উদাসীন, কেউ তাঁকে চায় না দেখে অপেক্ষা করে করে দোর থেকে চলে যান। কেউ গ্রাহ্য করে না। জগৎজোড়া বনফুলের মালা তাঁর গলায়—অথচ—

পুষ্পের চোখে জল এসে গেল গ্রহদেবের অপূর্ব কণ্ঠস্বরে। সে হাত জোড় করে বল্লে—প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

গ্রহদেব তখনো আত্মস্থ বিভোর অবস্থায় বলেই চলেচেন আগের কথার জের টেনে—

—দেখ, তোমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে। আমি তোমাদের ভালবাসি, কারণ তোমাদের জন্মজন্মান্তর নিজের হাতে গড়ে তুলেচি। তাঁর জ্যোতির্বাতায়ন অসীম শূন্যে খোলা রয়েচে, আশ্চর্যের বিষয় সেদিকে কেউ চায় না। সবাই অন্ধ। নরক থেকে বাঁচাতে চাই, কিন্তু পারিনে। অন্ধের মত ছুটে যায় সেদিকে। ওঁকে দেখ—উনি সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বতন স্তরের দেবী কিন্তু নিজের সুখ চান না। পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বলে কোনো ঊর্ধ্ব লোকেই থাকতে পারেন না। উনি সৌরমণ্ডলের সমস্ত জগতের মা। তোমরা কি আমাদের দেখা পেতে? আমাদের দেখার মত চোখ পেয়েচ শুধু ওঁর কৃপায়। নইলে ওঁর নিজের স্তরে উনি জনঃ, মহঃ, তপঃ লোকের জীবের অদৃশ্য। এখানে কোনো লোকের অধিবাসী তাদের ঊর্ধ্ব লোকের অধিবাসীকে দেখতে পায় না—দেখা সম্ভব নয়। ওই মেয়েটিকে ভালবাসেন বলে আজ তোমাদের এই সব সৌভাগ্য। উনি আমারও ঊর্ধ্ব লোকের দেবী, দয়া করে আমায়—

করুণাদেবী সলজ্জ সুরে বল্লেন—পুষ্প, শোনো তবে—উনি কে জানো? উনি গ্রহদেব বৈশ্রবণ। তোমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। যুগযুগান্তর থেকে তাঁর নির্দেশমত উনি তোমাদের পৃথিবী পরিচালনা করচেন। পূর্ব কল্পের দেবতা উনি। তার পূর্ব কল্পে উনি দেবযান-পথে জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করেন—

বহুদূর পথের যাত্রী উনি। ওঁর স্বরূপ ওঁকে সত্যলোকের জীবেরাও দেখতে পায় না—চোখ ঝলসে যায় ওঁর তেজে। দয়া করে তোমাদের দৃষ্টির উপযুক্ত কায়া ধারণ করে দেখা দিলেন তাই দেখতে পাচ্চ।

সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে ক্ষুদ্র পৃথিবীর ছেলে-মেয়ে পুষ্প ও যতীনএকেবারে নির্বাক্ হয়ে রইল। পুষ্প কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিল তা ভুলেই গিয়েছিল, এই সময় মনে আসতে সে আবার হাতজোড় করে বল্লে—প্রভু, আমাদের জন্মান্তরে কত সৌভাগ্য ছিল যে আপনাদের সাক্ষাৎ...একটা প্রশ্ন আমার আছে—

বৈশ্রবণ বল্লেন—আমাকে ধন্যবাদ দিও না পুষ্প। কৃতজ্ঞতা জানাও সেই মহামহেশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা যিনি, তাঁকে। আমরা তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশে চলি—তাঁর দাসানুদাস। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইঙ্গিতে চলে—অথচ কে জানে তাঁকে? তোমাদের পৃথিবীর জ্ঞানী লোকেরা জানতেন—তাই বলে গিয়েচেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে এই রকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত প্রজ্বলন্ত অবস্থায় অবস্থিত। সেসব ব্রহ্মাণ্ড আমিও দেখিনি। তুমি যে পথিকদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, তাঁর মত বিরাট দুর্দ্ধর্ষ আত্মারা তাঁর কৃপায় বহু সৌরমণ্ডল, বহু নীহারিকা, নক্ষত্রজগৎ অতিক্রম করে এই অনন্ত বিশ্বে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ও শক্তি পেয়েচেন। বিগত কল্পে আর একজন এমন দেবদুতকে আমি জানতাম—তিনি পৃথিবী এক আবর্তকাল অর্থাৎ প্রায় বাইশ হাজার বছর ধরে বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ করেও শুধু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডটার কূলকিনারা পাননি। তা ছাড়াও তো অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—কোথায় তার ঠিকানা, কোথায় তার কূলকিনারা, কোথায় তাদের সীমা! এখন ভাবো এই সমুদয় বিশ্ব যাঁর ইঙ্গিতে চলেচে—পৃথিবীর ছেলেদের খেলবার ক্রীড়নকের মত বন্ বন্ করে ঘুরচে—তাকে কে জানতো যদি তিনি নিজের দয়ায় কৃপা করে—

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন করতে চাইছিল, এবার তার সুযোগ পেয়ে মরীয়ার সুরে বল্লে—প্রভু, আমিও ঐ প্রশ্ন করতে চেয়েছিলুম—আপনি অন্তর্যামী, বুঝতে পেরেই তার উত্তর দিলেন। আমিও জানতে চাইছিলুম ভগবানকে আপনি কি দেখেচেন? দয়া করে আমার এই কৌতূহল—

করুণাদেবী এবার উত্তর দিলেন, কারণ গ্রহদেব তখন আপন ভাবে বিভোর। বিশ্বের ভগবানের কথা মনে ওঠাতে অন্য প্রশ্নের দিকে তাঁর মন ছিল না, যদি মন নামক অতি ক্ষুদ্র মানুষী ইন্দ্রিয় তাঁর মত বিরাট দেবতাতে আরোপ করা চলে। বল্লেন—না পুষ্প, উনি দেখেন নি। আমিও দেখি নি। অথচ তাঁকে অনুভব করেচি। তিনি কোথায় নেই? বিশ্বের প্রতি বাষ্পকণায়, জ্যোতিঃকণায়, পৃথিবীসমূহের প্রতি তৃণে প্রতি ধূলিকণায় তিনি। তিনি আছেনতাই আমরা আছি, তোমরা আছ, বিশ্ব আছে। তিনি সকলেরই। তুমি চাও, তোমার—আমি চাই, আমার।

গ্রহদেব বল্লেন—পুষ্প, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেও না। পারা যায় না। সে ইন্দ্রিয় তোমাদের নেই—তবে শুধু তাঁকে ভালবাসা দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন ভূমি লাভ করা যায় যে-ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়। নয়তো যার সে ক্ষমতা নেই—সেও যদি আকুল হয়ে ডাকে—তার মন ও বুদ্ধির গম্য হয়ে নিজেকে খুব ছোট করে সে ভক্তকে তিনি দেখা দেন। পৃথিবীতে কত লোক ইষ্টরূপে তাঁকে ভজনাকরে। ছোটর কাছে ছোট হয়ে দেখা দেন তিনি—কত কৃপা তাঁর। কিন্তু যে রূপ তাঁর নিজের—সে রূপে তাঁকে কে দেখতে পায়—

—প্রভু, কেউ কি পায় না?

—ব্রহ্মলোকের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর নিজের লোক। দেখি নি, তবে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারি। সেখানে হাজার হাজার কল্পের পূর্বেকার মুক্ত আত্মারা আছেন—কখনো দেখিনি তাঁদের। তাঁরা মহাশক্তিধর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরাই তাঁকে স্বরূপে হয়তো দেখেন। কিন্তু মানুষের রূপে দেখতে চাও, তুমিও পাবে। ভক্তি ভরে চাও। অত বড়ও কেউ নেই, আবার অত ছোটও কেউ নেই।

যতীন বল্লে—প্রভু, এই পৃথিবীর মানুষে ভগবানকে জানে?

সব পৃথিবীর অবস্থাই সমান। সত্য জানতে চায় ক'জন? এখানে তো দেখচো, ইন্দ্রিয়জ সুখ নিয়ে সবাই মত্ত। সেই বিরাট মহাশক্তির ধারণা করা এদের পক্ষে সহজ নয়। অবশ্য এরা পৃথিবীর জীবের চেয়ে অধিকতর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। বহুকাল যুগযুগান্ত কেটে যাবে এদের সমস্ত জড়তা, মনের মালিন্য দূর করে সে ধারণা উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু বিশ্বের ভগবানের অসীম ধৈর্য। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। তবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যারা নিরলস আত্মা, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যাদের মধ্যে জ্বলচে স্বয়ম্প্রভ মহিমায়, তারা এক জন্মেই ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। যেমন বলেছিলেন তোমাদের গ্রহের এক প্রাচীন কবি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি অন্ধকারের ওপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জেনেচি—ওগো শোনো সবাই শোনো শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। কত আনন্দ! আনন্দের ভাগ সবাইকে না দিলে যেন চলচে না। কিন্তু ভাবো, ক'জন সেজন্যে ব্যগ্র?আদিত্যবর্ণ পুরুষকে না জানলেও তাদের জন্মের পর জন্ম, যুগের পর যুগ, এমন কি কল্পের পর কল্প পরম আরামে অন্ধের মত কেটে যাচ্চে চির-অন্ধকারে। তার ওপারে কি আছে কে সন্ধান রাখে?

যতীনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। প্রশ্নটা সে করলে—তাঁদের মত অসীম শক্তিধর দেবতা কৃপা করলে তো একদিনে সব উদ্ধার হয়! সত্যের প্রচার করে দিলেই তো হয়।

দেবতার মুখে অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠলো। বল্লেন—তা কি হয়? যে পৃথিবী যে সত্যের জন্যে প্রস্তুত নয়, যে মানুষকে যে কথা বল্লে সে বুঝবে না—সেখানে সে সত্য প্রচার করা হয় না—সে মানুষকে সে কথা জোর করে শোনানো হয় না। স্বাতীনক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়লে মুক্তা হয়—কিন্তু ধুলোয় পড়লে?...ভগবান মহাজ্ঞানী। যা হয় না, তা তিনি করেন না।

পুষ্প বল্লে—তবে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে?

—মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি উন্মুখ যে মন, সে মনের সকল ভ্রান্তি তিনি ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

—দেব, সহজ কথায় বলুন আমরা কি করবো?আমাদের কি কর্তব্য?

—ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে।

—কি ভাবে প্রভু? মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানে কি?

—সাধারণ মানুষ মরচে, আবার জন্মাচ্চে, আবার মরচে। একে বলে মানবআবর্ত। একে জয় করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা। তাঁকে না জানলেকিছুতেই এ আবর্ত এড়ানো যায় না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

—পথ বলে দিন দেবতা—আমরা শরণাগত।

গ্রহদেব গম্ভীর মুখে বল্লেন—তাঁকে ডাকো, তাঁর কাছে আলো ভিক্ষা চাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সর্বদা। পরকে ভালবাসো। যেখানে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্ষমা—সেখানে তিনি। তিনিই তাঁকে বুঝবার শক্তি দেবেন। তাঁর জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান। পরের জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান।

—এই মানুষের ধর্ম।

—এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই পৃথিবীর মানুষের। যারা নিরলস হয়ে তাঁকে ডাকে, ভালবাসে—পরের সেবা করে, এক অমানব পুরুষ তাদের হাত ধরে দেবযান পথে জন্ম-মৃত্যুর দুস্তর অকূল মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যান। ভগবান নিজেই সেই অমানব পুরুষ, অপার করুণায় যিনি নিজেই এগিয়ে এসে হাত ধরেন অসহায়ের, শরণাগতের। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকালের বাণী এ। কারণ যা সত্য, তা চিরযুগেই সত্য—এই একই বার্তা যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েচে, দূতের পর দূত এসেচে গিয়েচে, 'অন্ধ জাগো! না—কিবা রাত্রি কিবা দিন!' চোখ আছে, কেউ দেখে না; কান আছে কেউ শোনে না!

ওরা সে পৃথিবীর একটি সুরম্য হ্রদ-মত জলাশয়ের ধারে বসেচে। যতীন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ওদের দক্ষিণে পৃথিবীর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের মত এক প্রকার ঘন সবুজ বৃক্ষের সারি, কিন্তু তাতে থাবা-দোপাটির মত রঙিন ফুল এত ফুটেছে যে, বড় বড় শাখাপ্রশাখা নির্মল স্ফটিকের মত জলরাশির কূলে কূলে নুয়ে পড়েছে। বেলা উত্তীর্ণ হয়েচে, নীলকৃষ্ণ দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে দেখলে বিশালকায় এক দশমী কি একাদশীর চন্দ্র উদয় হচ্চে! অত বড় চন্দ্র। আকাশের এক দিক জুড়ে আলোয় আলো করে তুলেচে সারা দিক্‌চক্রবাল।

সে অবাক্ হয়ে বল্লে—ও কি রকম চাঁদের মত ওটা—অত বড়—

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—বৃহস্পতি। ওর জ্যোৎস্না পড়বে এখুনি। পৃথিবীর জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি জ্যোৎস্না আর অদ্ভুত শোভা। আর একটা ব্যাপার, তোমাদের পৃথিবীর মত অমাবস্যা এখানে নেই, উপগ্রহের ক্ষুদ্র দেহ অতবড় বৃহস্পতি গ্রহকে ঢাকতে পারে না, সুতরাং সপ্তমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কলা হয়—কিন্তু দু'বৎসর ধরে শুক্লা রাত্রি চলে।

সে মুগ্ধ হয়ে গেল এই সুদূরতর পৃথিবীর অদ্ভুত জ্যোৎস্নাময় রজনীর শোভায়।হ্রদের ওদিকে জলজ ঘাসের আড়ালে তরুদলের ভ্রষ্ট কুসুমরাশি পদদলিত করে একদল পরমা রূপসী নারী জলে নামলো স্নান করতে। কে জানতো আবার এমন সব স্থান আছে, সেখানেও মানুষ আছে! ভগবানের যে কথা গ্রহদেব কিছু আগে বলছিলেন, তাতে তার মন ভরে আছে। যে আদিত্যবর্ণ পুরুষের মানস থেকে এই সব পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না পাহাড় পর্বত, বেণু-বীণার ঝঙ্কারের মত সুস্বরা ওই সুন্দরীদের উৎপত্তি, তাঁতেই লয় কল্লান্তে, সৃষ্টি আর প্রলয় যাঁর নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস—তিনি কোথায়? কে তাঁকে জানে? কি ভাবে তাঁকে জানা যায়? কে দেখিয়ে দেবে তাঁকে?

—হঠাৎ চমক ভেঙে সে দেখলে তারা তিনজনে মাত্র আছে। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কখন অন্তর্হিত হয়েচেন। করুণাদেবী বল্লেন—উনি এ সব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, ওঁর দেখা পেয়েচি—অবিশ্যি আপনার দয়ায়।

ফেরবার পথে আকাশে উঠে পুষ্পকে দেবী দেখালেন, পৃথিবীটার চারিদিকে আকাশে কুয়াশার মত, মেঘের মত পিঙ্গল প্রভায় আবেষ্টিত করে রেখেছে কি সব। বল্লেন—পৃথিবীর তাবৎ অধিবাসীদের বাসনা কামনা মেঘের মত জমা হয়েচে ও বায়ু-মণ্ডলে। ওদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আমরা ওদের কাছে অদৃশ্য। তোমাদের পৃথিবীতেও আছে এই রকম—এর চেয়েও বেশি। এইসব ঠেলে আমাদের যাতায়াত বড় কষ্টকর—তোমাদের পৃথিবীর শহরগুলোতে তো আরও বেশি। টাকার নেশা, সুরার নেশা, রূপের নেশা—ওর আকাশ ধূসর বাষ্পে ছেয়ে রেখেচে—তাতে বিষ আছে, আমাদের পক্ষে সে ঠেলে যাওয়া কত কষ্ট! কি করি, পৃথিবীর মত স্থূল দেহের আবরণ তৈরি করে যেতে হয়। কিন্তু গেলে কি হবে, আমাদের পর্যন্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে, ভালভাবে কিছু দেখতে পাইনে, নিজের স্বরূপ আবৃত করে গিয়েও কিছু করতে পারিনে। যাও তোমরা তাহলে...

ওদের পায়ের তলায় বুড়োশিবতলার ঘাটে দেখা গেল দিব্যি দুপুরবেলা! দূর পৃথিবীর জ্যোৎস্না ছায়াবাজির মত গিয়েছে মিলিয়ে, তার অপরূপ রূপসী জলকেলিরতা নারীদের নিয়ে।

যতীন বল্লেন—নাঃ, এতদিনে বুঝলুম জগৎটা মায়া!

পুষ্প কৌতুকের সুরে বল্লে—অত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাসটা ফেল্লে যে? ওটা কি দার্শনিক দীর্ঘশ্বাস না সেখানকার ওই সুন্দরীদের অদর্শনে—

—যাও, ওসব ভাল লাগচেনা। মন বড় চঞ্চল—আমি এখুনি যাবো। আমার মা কাঁদচেন আমার জন্যে।

—কোন্ মা?

—আরে, কোন্ মা আবার? পৃথিবীর এই সেদিনের—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—জগৎটা মায়া বলছিলে না যতীনদা?

যতীন বিরক্তির সুরে বল্লে—সব তাতেই তোমার ঠাট্টা। আমার ব্যথা আমিই জানি।

—বেশ ভালই। যাও গিয়ে দেখে শুনে এসো, মায়ের বাছা—আহা!

—তুমিও চলো। পথে নানা বিপদ, চুম্বকের ঢেউ—ঢেউ কখন কি রকম হবে, ওসব আমি বুঝতে পারিনে। শেষকালে আবার কোথায় গিয়ে ঠেলে উঠবো জন্ম নিয়ে, বিশ্বাস কিছু নেই। তার চেয়ে চলো সঙ্গে।

কোলা বলরামপুর গ্রামে ঝাঁ ঝাঁ করচে শরতের দ্বিপ্রহর। নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকচে উদাস-মধ্যাহ্নবেলায়, বনে বনে তিৎপল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এ সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের চারা ঠেলে উঠেছে, বনসিমতলায় বেগুনি ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করচে—বর্ষার শেষে জল মরে যাচ্চে ডোবায়, পুকুরে নদীতে—তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়ি গুগলি খুঁজে বেড়াচ্চে, জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ায় কাশফুলের সাদা তুলোর মত পাপড়ি উড়চে।

যতীন বল্লে—কি চমৎকার, পুষ্প! বাংলার সব পাড়াগাঁয়েই এমন। মন খারাপ হয়ে গেল। এর সঙ্গে জীবনের কত স্মৃতি জড়ানো! ছেলেবেলায় এমনি শরতে পুজোর ছুটিতে স্কুল-বোর্ডিং থেকে বাড়ি আসতুম...দ্যাখো দ্যাখো এই গেরস্তর বাড়িটিতে কি শিউলি ফুলটা তলায় পড়ে রয়েচে!আহা!

পুষ্প বল্লে—দুপুরের রোদে এখনো শুকোয় নি—ঘন ছায়া কিনা!

যতীন স্বপ্নালস চোখে বল্লে— কতকাল পরে যেন নিজের মাটির ঘরটিতে ফিরে এলুম পুষ্প। এমনি স্নিগ্ধ, এমনি আপন। চলো—

ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা—তাতে যতীনের সেই তরুণী মা আধময়লা লেপকাঁথা গায়ে শুয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগচে। শুধু এখানে নয়, পাশের বাড়িতেও তাই—জানলার কাছে ছোট তক্তপোশে আর একটি বৌ শুয়ে জ্বরে এপাশ-ওপাশ করচে, তার পাশে দুটি ছোট ছোট ছেলে—জ্বরে ধুঁকচে তারাও। রান্নাঘরে একটি বৃদ্ধা কলাই-এর ডালে সম্বরা দিয়েচেন, তারই সুগন্ধ জ্বরাক্রান্ত বাড়ির বাতাসে। পাশের বাড়ির বৌটি চিঁচিঁ করে বলচে—একটু জল দিয়ে যাও পিসিমা।

বৃদ্ধা বলচে—একা মানুষ কতদিকে যাবো, ক'টা হাত পা? কাল গিয়েচে একাদশী, আর এই খাটুনি। একটু সবুর করো। গোরু দুটো সেই কোন্ সকালে বেঁধে দিয়ে এসেচি নদীর ধারের বাচ্ড়ায়, একটু জল দেখিয়ে আসবার সময় পাইনি এত বেলা হোল।

যতীন এসে ওর নতুন মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়ালো। একটু আগে ওর মা ওর কথা মনে করে কেঁদেচে জ্বরের ঘোরে। এই তো গত বর্ষায় ও মায়ের কোল ছেড়ে গিয়েচে, সে স্মৃতি ওর মায়ের মনে এখনো অতি স্পষ্ট। চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে বালিশের গায়ে। মাতৃহৃদয়ের নিঃশব্দ ব্যথার অভিব্যক্তি। যতীন বুঝলে, মায়ের এইচোখের জল, বুকের চাপা কান্নাই তাকে আজ সপ্তস্বর্গের পার থেকে টেনে এনেচে এখানে। মাতৃশক্তির আকর্ষণ অদম্য, কেউ তাকে তুচ্ছ করতে পারে না, হোলই বা মাটির ঘরের দুদিনের মা। সব মা-ই তো দুদিনের।

পুষ্প বল্লে—যা ভাবচো তা নয় যতীনদা। মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেয়ো না পৃথিবীকে, পৃথিবীর স্নেহ-ভালবাসাকে। তোমার সাধ্যি কি এই মাতৃশক্তিকে অবহেলা কর? নিজের নিজের জায়গায় কারো শক্তি কম নয়।

যতীন কৃত্রিম রাগের সুরে বল্লে—ওঃ এখন যদি সেই সমাধিবাজ সন্নিসিটাকে পেতাম—বুঝিয়ে দিতাম তাকে—

—মহাপুরুষদের নামে অমন বোলো না, ছিঃ! তিনি যে ভূমিতে উঠে জগৎকে মায়া দেখেচেন, তোমার সে জ্ঞান কোথায়? যে অবস্থা যার, তাই তার কাছে সত্যি আর সহজ। তোমার কাছে এই সত্যি। বদ্ধ জীব তুমি।

—তাহোলেই পুষ্প, জগৎটা কি কতকটা ভেল্কির মত লাগচে না? বদ্ধ জীব বলে গালাগালি তো দিচ্চ—

—আবার তোমার বোঝবার ভুল। যাক, ও সব বড় বড় কথা। তিনি যখন বোঝাবেন তখন বুঝো। এখন তোমার মায়ের সেবা করো—আমি যাই পাশের বাড়ির বৌটির কাছে—জ্বরের ঘোরে বমি করচে ওই শোনো—আহা!

—তার ওপর বাড়িতে তো দেখচি এক খাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ি ছাড়া মুখে জল দেবার কেউ নেই—

যতীন বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। অতি দরিদ্রের ঘরকন্না, ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর আর মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ির গেরস্থালি। খানিক আগে পাশের ঘরের মেজেতে কে পান্তাভাত খেয়ে এঁটো থালা-বাসন ফেলে রেখেচে—একটা বেড়ালছানা থালার আশেপাশে ঘুরচে। হয়তো তার মা জ্বর আসবার আগে পান্তাভাত ক'টা খেয়ে থাকবেন, গরিবের ঘরে জ্বরের উপযুক্ত পথ্য জোটে নি। কেন তাকে পুষ্প নিয়ে গেল এখান থেকে? এই ঘরে মায়ের কোলটি জুড়ে সে বেশ থাকতো। তারপর একদিন সুখেদুঃখে বড় হয়ে উঠতো, ভাল চাকুরি করে এই দরিদ্রের ঘরণী মায়ের সেবা করতো। ভাঙা বাড়ি সারাতো, মাকে ভাল ভাল শাড়ি, কানের দুল, হাতের বালা চুড়ি কিনে দিতো, ম্যালেরিয়ার সময় এখান থেকে নিয়ে যেতো দেওঘর মধুপুরে। ওইখানে সজনেতলায় বড় রান্নাঘর তৈরি করে দিত, সানাই বাজনার মধ্যে একদিন বিয়ে করে বৌ এনে মায়ের বুকে সুখের ঢেউ তুলতো, নানা দিক দিয়ে মায়ের শত সাধ পূর্ণ করতো। আজ এই যে অসহায় অশিক্ষিতা পল্লীবধূ জ্বরের ঘোরে তাকেই স্মরণ করে কিছুক্ষণ আগেও কেঁদেচে—কি অপূর্ব! স্নেহের অমৃতই ওর বুকে জমা রয়েচে তার জন্যে। এর জন্যে তার মন পিপাসিত—কি হোল তার স্বর্গে গিয়ে? স্বর্গ তো পালাচ্ছিল না।

এই সময় ডাকপিওন বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—মনিঅর্ডার আছে।

বাড়িতে আর কেউ নেই, যতীনের মা ধড়মড় করে উঠে বল্লে—ও শৈল, শৈল—কোথায় গেলি? মাগো, আমায় সবাই মিলে খেলে। কেউ যদি বাড়ি থাকবে—ও শৈল—

রোগিণীর আহ্বানে কোথা থেকে আট দশ বৎসরের একটি বালক ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—কি কাকীমা—কি হয়েচে?

—আমার মাথামুণ্ডু হয়েচে? দুপুর বেলা বেরোয় কোথায় সব, বাড়িতে কেউ নেই—মনিঅর্ডার এসেচে, নে পিওনের কাছ থেকে; আমার এমন জ্বর এয়েচে যে মাথা তুলতে পারচিনে—শৈল কোথায়?

—দিদি তাস খেলচে পাঁচুদের বাড়ি—

বালক মনিঅর্ডারের ফর্মখানা, হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো! ওর কাকীমা বল্লে—ক'টাকা?

বালক ঘাড় নেড়ে বল্লে, সে জানে না। বাইরে থেকে পিওন চেঁচিয়ে বল্লে—সাত টাকা মা ঠাকরুণ—সইটা করে দেন—

পিওন ফর্ম সই করিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল। বালক টাকা নিয়ে এসে রোগিণীর হাতে দিতে রোগিণী তিন চার বার গুনে গুনে বালিশের পাশে রেখে দিলে। যে ভাবে বৌটি আদরে যত্নে সতর্কতার সঙ্গে টাকা কয়টি বার বার গুনলে তাতেই যতীনের মনে হোল এই দরিদ্র সংসারে গৃহলক্ষ্মীর কাছে এই সাতটি টাকা সাতটি মোহর। সে যদি বড় হয়ে মায়ের হাতে থলিভর্তি টাকা এনে দিতে পারতো! আজ সত্যিই তার মনে হোল, পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চ স্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে, তার মনে অনুভূতি জাগায় এই সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা। তার এই মাকে একলা ফেলে আশালতাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোন্ স্বর্গে গিয়ে সুখ পাবে?

যতীনের অদৃশ্য উপস্থিতি ও স্পর্শহীন স্পর্শ ওর মাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করে তুললে। পুষ্প এসে বল্লে—তোমার মাকে ছবি দেখাবো যতীনদা? যেন এক অদৃশ্য দেবতা ওঁর ছেলের মত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—মিষ্টি কথা বলচে—দেখাবো?

—পাশের বাড়ির বৌটি কেমন?

—ঘুম পাড়িয়ে এলুম। মাথা ধরেছিল, সারিয়ে দিয়ে এলুম।

—খাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ি কি করচে? বুড়িটা?

পুষ্প হেসে বল্লে—পিস্‌শাশুড়ির অত দোষ দিও না। বৌটির চরিত্র ভাল না।

যতীনের মনে পড়লো আশালতার কথা—সে একটু তিক্তস্বরে বল্লে—মেয়েমানুষ কিনা, তাই অপর মেয়েমানুষের চরিত্রের দিকটাতে আগে নজর পড়ে। কই আমাদের তোপড়ে না? দেখেই বুঝে ফেল্লে?

পুষ্প বল্লে—তা নয়, ওর মনে সব কথা লেখা রয়েচে আমি পড়ে এলুম। ও চিন্তা করচে ওর একজন প্রণয়ীকে, নাম তার হরিপদ, এই দুপুরে নদীর ঘাটে গিয়ে তারসঙ্গে লুকিয়ে দেখা করার কথা ছিল, জ্বর এসেচে ঠেসে দুপুরের আগেই।

—যেতে পারেননি বলে ভাবচেন বুঝি? আহা!

—হঠাৎ অত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলে যে ওর ওপর? অত দরদই বা এল কোথা থেকে? জানো, যতীনদা—আমার একটা ব্যাপার হয়েছে আজকাল, লোকের কাছে কিছুক্ষণ বসলে বা থাকলে আমি তার মনের চিন্তা সব বুঝতে পারি। ও বৌটির পাশে গিয়ে বসে দেখি ও শুধু কে হরিপদ, তার কথাই ভাবচে। যাক্ গে, তোমার মা, কেমন?

—এখন একটু ভাল। মায়ের মনিঅর্ডার এসেচে সাত টাকা কোথা থেকে। দেখতে যদি মায়ের আনন্দ! পুষ্প, কেন আমাকে নিয়ে গেলে? এ দরিদ্র সংসারের উপকার করতে পারতাম বেঁচে থাকলে। আমি হয়তো চাকরি করে—

—আমি নিয়ে যাই সাধ্যি কি আমার? যিনি দীনদুনিয়ার মালিক তাঁর ইচ্ছে না থাকলে—

—তুমি কি দীনদুনিয়ার মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করেছিলে পুষ্প?

এই সময় যতীনের মা বিছানা থেকে উঠে বাইরের রোয়াকে রোদ্দুরে গিয়ে বসলেন। ম্যালেরিয়া-রোগীর ভাল লাগে রোদ্দুরে বসতে। দুটি প্রতিবেশিনী এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো যতীনের মায়ের সঙ্গে। একজন বলচে—জ্বরটা কখন এল আজ বৌ?

—দুটো ভাত খেয়ে উঠেচি, থালা তুলিনি—অমনি সে কি ভূতোনন্দি জ্বর। কিন্তু এখন যেন ভাল মনে হচ্চে। হঠাৎ জ্বরটা আজ যেন কমে গেল।

—হ্যাঁরে, আজ নাকি টাকা এসেচে তোর? ক'টাকা এল?

—হ্যাঁ দিদি, সাত টাকা।

—বাঁচা গেল! ক'দিন তো একরকম না খেয়ে ছিলি। বট্‌ঠাকুর টাকা পাঠাতে অত দেরি করেন কেন? সামনে পুজো—অত দেরি করেই যখন পাঠালেন তখন আরও কিছু—

—কোথায় পাবে দিদি যে পাঠাবে। এই তো সেদিন বাড়ি থেকে গেল। পনেরো টাকা তো মোটে মাইনে—মনিব যে উন্‌পাঁজুরে লোক, দু-এক টাকা আগাম চাইলে তো দেবে না। ওরও তো শরীর ভাল না সবই জানো। সেবার সেই বড় অসুখের পরে আর শরীর ভাল সারলো না। ওই মানুষকে একা পাঠিয়ে যে কত অশান্তিতে ঘরে থাকি—তার ওপর আমার খোকা যাওয়ার পর উনি একেবারে—

যতীনের মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনার কথা বলতে লাগলো। একজন বল্লে—যাও বৌ, রোদ্দুরে বোসোনা, বমি হবে। ঘরে শোওগে। কি করবে বলো, সবই অদেষ্ট।

যতীনের মা চোখের জলে ভেজা সুরে বল্লেন—তোমরা আশীর্বাদ করো দিদি, উনি ভাল থাকুন। ওই সাত টাকাই আমার সাত মোহর। পুজোর সময় আসতে পারবেন নাবলে লিখেচেন কুপনে—সেই কি কম কষ্ট আমার। পোড়ারমুখো মনিব মহালে পাঠাবে খাজনা আদায় করতে—ছুটি পাবেন না—

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—আমি বলছি তিনি বাড়ি আসবেন, আসবেন!

যতীন অবাক হয়ে পুষ্পের দিকে চেয়ে রইল। পুষ্পের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠেছে, ওর কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মত শক্তিমান ও অমোঘ।...

কথা শেষ করে যখন পুষ্প ওর দিকে চাইলে তখন পুষ্পের চোখে জল।

যতীন বল্লে—কি হোল তোমার, পুষ্প?

পুষ্প তখনো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। বল্লে—সতীলক্ষ্মী উনি—জয় হোক ওঁর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাকে।

তারপর দুজনে আরও অনেকক্ষণ সেখানেই রইল। যতীনের মায়ের জ্বর ছেড়ে যায় নি, তিনি আবার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে তিনি জ্বর কমবার সঙ্গে সঙ্গে নির্জীবভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যতীন বল্লেন—ভাল কথা, মাকে এবার সেই ছবিটি দেখাও না?যেন এক দেববালক ওঁর মাথার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—এই অবস্থার স্বপ্ন বেশস্পষ্ট হবে।

পুষ্প বল্লে—না। কি জানো যতীনদা, ভেবে দেখেচি তারপর। ওসব ছবি যে দেখে, সে সংসার করতে পারে না। মন চঞ্চল হয়ে যায়। পৃথিবীর মন একরকম, ভুবর্লোকের মন আলাদা। এর সঙ্গে ওকে জড়াতে নেই। ওসব দর্শন হয় কাদের যারা আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করবে। সংসারী লোকদের অমন ছবি দেখাতে নেই। আমি দেখাতে পারি, তোমার মা জেগে উঠে কাঁদবেন, উদাস হয়ে থাকবেন দিনকতক, সংসারের কিছু ভাল লাগবে না। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে মন দিতে পারবেন না। কি দরকার সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নয়তো মাকে একবার ঘুমের মধ্যে ভুবর্লোকে নিয়ে যাই না কেন? বেড়িয়ে দেখে আসুন।

—উনি এখনো তার উপযুক্ত হননি। কিছু বুঝতে পারবেন না, হয়তো ওঁর সূক্ষ্ম শরীর অজ্ঞান হয়ে পড়বে সেখানে। সব এক আজগুবি স্বপ্ন বলে ভাববেন। বৃথা পরিশ্রম। চলো যাই, বেলা গেল।

নিকটেই এক ঝোপে তিৎপল্লার হলুদ ফুলে রঙিন প্রজাপতির ঝাঁক উড়তে দেখে ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—কি সুন্দর, না? শুঁয়োপোকা থেকে কেমন চমৎকার রঙিন জীব তৈরি হয়েচে দ্যাখো। শুঁয়োপোকা মরে যায়, গুটি কেটে প্রজাপতি উড়ে বেরোয়! মাটিতে কত আস্তে চলে শুঁয়োপোকা—আর কেমন দ্যাখোপ্রজাপতি নীল আকাশের তলায় ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্চে। শুঁয়োপোকা কল্পনা করতে পারে মরবার পরে সে প্রজাপতি হবে?

যতীন হেসে বল্লে—মানুষ কল্পনা করতে পারে যে মৃত্যুর পর সে বিশ্বের নীলআকাশের তলায় বিদ্যুদ্‌গতিতে উড়ে বেড়াতে পারবে? শুঁয়োপোকার মন অন্ধ, মানুষও তেমনি অন্ধ।

প্রদোষালোকে ম্লানায়মান ধরণী গতির বেগে ওদের পায়ের নীচে কোথায় অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল। সেই ধরণীর একপ্রান্তে যতীনের দরিদ্রা জননী গভীর ঘুমে অচেতন রইলেন। জানতেও পারলেন না তাঁর ভাঙা ঘরে এ অদ্ভুত আত্মিক আবির্ভাবের রহস্য।

সেদিন পুষ্পই প্রথম তাঁকে দেখলে। সেদিন ওরা বুড়োশিবতলার ঘাটে ফিরে আসছিল পৃথিবী থেকে—ফেরবার পথে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর বসেচে—হঠাৎ আকাশের বিদ্যুৎলেখার মত উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন

করে পুষ্প বল্লে—দ্যাখোদ্যাখো—কোন্ দেবতা আসচেন! যতীনও দেখতে পেলে। একটা বিশাল উল্কা যেন আগুনের অক্ষরে শূন্যের গায়ে তার বার্তা ঘোষণা করচে।...

চক্ষের পলকে সেই পথিক দেবতা কায়া ধারণ করে ওদের সামনে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প ও যতীন উভয়েই চিনলে—যে দেবতা একবার মহাশূন্যে পথ হারিয়ে ওদের কুটিরপ্রাঙ্গণে বিভ্রান্ত অবস্থায় এসে পড়েছিলেন, সেই ভ্রাম্যমাণ আবিষ্কারক দেবতা।

দেবতা বল্লেন—তোমাদের কথা স্মরণ রেখেচি। আবার দেখা করবো বলেছিলাম, মনে আছে কন্যা?

পুষ্প ও যতীন দেবতার পাদবন্দনা করলে। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি ভ্রমণের গল্প করুন।

যতীন বল্লে—একটা কথা দেব, আমাদের পৃথিবীর পণ্ডিতরা অনুমান করচেন আমাদের এই সৌর-জগতের বাইরে অন্য কোনো নক্ষত্রে গ্রহ নেই। একথা কি সত্য?

দেবতা হেসে বল্লেন—ভুল কথা। বিশ্বের এই অঞ্চলেই বিভিন্ন নক্ষত্রে লক্ষ লক্ষ গ্রহ বর্তমান। বহু শ্রেণীর জীব তাতে বাস করচে। তোমাদের পৃথিবী যতটুকু এর চেয়ে অনেক বৃহত্তর ও সুন্দরতর গ্রহ বিশ্বের এই অঞ্চলে বহু নক্ষত্রে বর্তমান।

যতীন বল্লে—দেব, বিশ্বের এই অঞ্চল বলে আপনি কতটুকু জিনিসের কথা বলচেন?

—বিদ্যুতের বেগে যদি যাও, তবে এক কোটি বৎসর লাগবে তোমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল পার হতে। এ রকম লক্ষ লক্ষ নাক্ষত্রিক বিশ্ব ছড়ানো রয়েচে চারিধারে। আমি বিশ্বের এ অঞ্চল বলতে তোমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী অঞ্চলের কথা বলচি।

পুষ্প বল্লে—আমাদের একবার নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ওই সব দূর দেশে?

চক্ষু মুদ্রিত কর। গতির প্রচণ্ড তেজ তোমরা সহ্য করতে অভ্যস্ত নও—জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দুজনেই চক্ষু মুদ্রিত করো—প্রস্তুত হও—মধ্যপথের কোনো নক্ষত্র বা গ্রহলোক তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না।

গতির কোনো অনুভূতিই ওদের হোল না, চক্ষের পলক ফেলতে যত বিলম্ব হয়,ততটুকুও বোধ হয়নি—পথিক দেবতা বল্লেন—চোখ চেয়ে দেখতে পারো—

পুষ্প ও যতীন সম্মুখের দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো। তারা এ কোথায় এসেচে— এক বিরাট অগ্নিমণ্ডল তাদের সামনে—সে অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বহুলক্ষ বিশালকায় কটাহে যেন লক্ষ কোটি মণ ধাতু গলিত হচ্চে একসঙ্গে—লক্ষ লক্ষ মাইল ঊর্দ্ধে উঠেচে রক্তবর্ণ স্বয়ম্প্রভ বাষ্পশিখা—রক্ত-আগুনের শিখার মত। বাল্যকালে জলস্তম্ভের ছবি দেখেছিল যতীন পৃথিবীর পাঠশালার কোন পুস্তকে—এখন ওর চোখের সামনে ধারণার অতীত বিশালকায় অগ্নি ও প্রজ্বলন্ত বাষ্পের খাড়া সোজা উঁচু স্তম্ভ চক্ষের নিমেষে উঠে যাচ্চে যেন দশ হাজার মাইল, যেদিকে চাওয়া যায় দাউ দাউ করচে শুধু আগুন—অথচ পৃথিবীর আগুনের মত নয় ঠিক—জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হয়তো। অগ্নিমণ্ডলের চারিদিকে শুভ্র ও রক্ত-আগুনের ছটা—গ্রহণ যোগে দৃশ্যমান সূর্যের চারিপাশে দৃষ্ট সৌরকিরীটের (corona) মত। কোন্ রুদ্র ভৈরবের প্রচণ্ড আবির্ভাব এ! এখানে না আছে নারীনা আছে শিশু, না আছে বনকুসুমের শোভা, না আছে জীবের জীবনস্বরূপ বারি। কিন্তু এই রুদ্রের বামমুখ প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ ঘটে না কারো—এ ভয়ঙ্কর মূর্তিকে দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা যেমন থরথর কেঁপে উঠলো ওদের, তেমনি ওদের মনে হোল, এই অদ্ভুত ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের ও অস্তিত্বের সামনে তাদের সকল ক্ষুদ্রত্ব ও সংকীর্ণতা। এখানকার বাষ্পমণ্ডলের কটাহে বিগলিত বহু লৌহ, তাম্র, নিকেল, এলুমিনিয়ম, কোবাল্ট, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্যের মতই দ্রবীভূত হয়ে নয় শুধু, বাষ্পীভূত হয়ে যায়—যেমন যাচ্চে ঐ সব ধাতু নিমেষে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

দেবতা বল্লেন—এ একটা নক্ষত্র। কিন্তু কামচারী বা বিদ্যুৎচারী না হোলে তোমরা এর বিরাটত্ব কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের জড়জগতের অবস্থানকালের কোনোমাপকাঠি ব্যবহার করে এ নক্ষত্রের সীমা পাবে না। চেষ্টা করো—চলো—

পুষ্প ও যতীন যে বেগে যেতে ইচ্ছা করল, তাকে পৃথিবীতে রেলগাড়ির বেগ বলা যেতে পারে। দেবতা গতির বেগ কমিয়ে ওদের সঙ্গে চলেছেন। ওরা সবেগে যেন উড়ে চলেচে একটা অগ্নির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে ও একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে—ওদের চারিপাশে ঘিরে অগ্নি-দেবতার রক্ত-চক্ষু। বহুক্ষণ ওরা গেল, পৃথিবীর হিসেবে দশ বারো ঘণ্টা। ওদেরও ক্লান্তি নেই, যাত্রাপথেরও শেষ নেই—মহা অগ্নিসমুদ্রেরও কূলকিনারা নেই।

দেবতা বল্লেন—তোমরা যদি জড় বস্তুর উপাদানে তৈরি হতে এই জ্বলন্ত নক্ষত্রের বহুদূর থেকে তোমাদের দেহ জ্বলে পুড়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো—আকর্ষণের বলে সে বাষ্পটুক এই বৃহত্তর বাষ্পমণ্ডলে প্রজ্বলন্ত অবস্থায় প্রবেশ করে মিশিয়ে যেতো...

পুষ্প বল্লে—আর সহ্য করতে পারবো না—আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুন দেব দয়া করে।

দেবতা প্রসন্ন হেসে বল্লেন—বিশাল বিশ্বের রূপ সবাই সহ্য করতে পারে না, দেখতে চায়ও না। শক্তিমতী হও। ভগবান তাকেই এসব দেখান, যে তাঁর বিশ্বেরবিরাটত্ব দেখে ভয় পাবে না। আমি সুদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এ সাধনা করেছিলাম—তারপর জড় জগৎ থেকে এসে বহুকাল ধরে শুধু বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্চি। এই আমার সাধনা—এতে আমি সিদ্ধিলাভ করেচি। কিন্তু আমিই দিশাহারা হয়ে যাই সময় সময়। তোমরা কী দেখেচ, এক কণিকাও নয়।

পুষ্প বল্লে—আর কী দেখাবেন বলুন দেব, এ আগুনের দৃশ্য আমার আর সহ্য হচ্চে না—

—তোমাকে এর চেয়েও বৃহত্তর নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডলে নিয়ে যাবো, চলো। শক্তিমতী হও। এবারে চোখ চেয়ে চলো। তোমাকে চোখ তখন মুদ্রিত করতে বলেছিলাম কেন জানো? তোমাদের জড়জগতের অতি নিম্নস্তর অতিক্রম করতে হবে আসবার পথে। সে অতি কুশ্রী স্তর। তোমরা দেখলে ভয় পেতে—তাই দেখাই নি।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নরক? সে দেখতে বড় ইচ্ছে, দেব! দয়া করে—

দেবতা গম্ভীর স্বরে বল্লেন—প্রত্যেক জড় জগতের অমনি নিম্নস্তর আত্মিক স্তর আছে। জড় জগতের অপুষ্ট আত্মা ওখানে আসে। পৃথিবীর নরক তবুও ভাল, কারণ গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর জীবদের আধ্যাত্মিক প্রগতি অনেক বেশি! তোমাদের দেখে তা মনেহচ্চে। এমন গ্রহ তোমাদের দেখাতে পারি যেখানকার জীবের চৈতন্য নিম্নস্তরের। তোমাদের পৃথিবীতে এমন শ্রেণীর জীব নেই।

ওরা অনন্ত ব্যোমের যে অংশ দিয়ে যাচ্ছিল, যতীন তার চারিদিকে চেয়ে কোনো পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে পেলে না—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ধ্রুবনক্ষত্র, এমন কি বৃশ্চিক পর্যন্ত না! অসীম বিশ্বের কোন্ সুন্দর অংশে তারা এসে পড়েচে যেখান থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বৃশ্চিক কিংবা ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় না? প্রশ্নটা সে পথপ্রদর্শক দেবতাকে করলে।

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের এসব নক্ষত্র চিনি না। তোমাদের জড়জগৎ থেকে চিরকাল দেখে আসচো বলে ওগুলো পৃথিবীর জীবের কাছে সুপরিচিত। বিশ্বের পথিক আমি, আমার কাছে ও-রকম লক্ষকোটি ধ্রুব আর সপ্তর্ষি অগণ্য জ্যোতির্লোকের ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েচে।

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল আকাশের ওপরদিকে বকের পালকের মত বহু-দূরব্যাপী রঙিন মেঘরাশি এক জায়গায় স্থির ছবির মত দৃশ্যমান।

পুষ্প কৌতূহলী হয়ে বল্লে—ওই মেঘের মত কী ওগুলো দেব?

—আমি জানি কিন্তু কখনো দেখিনি। ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের জীবলোক।

—জড়দেহধারী জীব?

—না। তোমরা যাকে বলবে আত্মিক লোক—

—অনেক উঁচু স্তরের আত্মা?

—খুব উঁচু।

যতীন ওদের কথা শুনছিল—সাগ্রহে বল্লে, একটা প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে নাকরেন স্যার—আই মিন্—মানে, দেব।

পুষ্প ভ্রুকুটি করে বল্লে—তোমার এখনো পৃথিবীর সংস্কার গেল না যতীনদা?

দেবতা ওদের মনোবৃত্তি অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারেন না; ক্রোধ, অশ্রদ্ধা, হিংসা প্রভৃতি মনোভাবের বহু ঊর্দ্ধে তাঁরা। তিনি অনেক পরিমাণে সরল বালকের মত। পুষ্প লক্ষ্য করচে—করুণাদেবীও অনেক সময় বারো বৎসরের পার্থিব বালিকার মত কথা বলেন, ব্যবহার করেন। উচ্চতর দেবচরিত্রের এদিকটা আজকাল বেশি করে ওদের দুজনেরই চোখে পড়চে।

যতীন আরও বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—একটা প্রশ্ন ছিল—আপনি ওখানে যান নি কেন?

দেবতা বল্লেন—ওর উত্তর খুব সোজা। ওসব লোক আমার নিকট অদৃশ্য।

পুষ্প ও যতীন দুজনেই বিস্ময়ে স্তব্ধ। পুষ্প বল্লে—আপনার কাছেও অদৃশ্য? দেব, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এইবার সামনে বহুদূর থেকে ওরা দেখতে পেলে সারা আকাশ জুড়ে একটা বিশাল অগ্নিক্ষেত্র ওদের দিকে যেন ছুটে আসচে। ঘোর শুভ্রবর্ণ মহাপ্রজ্বলন্ত বাষ্পপরিবেশ, মাঝে মাঝে তা থেকে সহস্র যোজনব্যাপী বাষ্পাগ্নি বহু ঊর্দ্ধে উঠেমহারুদ্রের মত সর্বধ্বংসকারী প্রলয়ের হুঙ্কার ছাড়চে। সে দৃশ্য দেখে পুষ্পের চেতনা লোপ পাবার মত হোল।

যতীন সেই কালাগ্নির ভৈরব দৃশ্যের দিকে পেছন ফিরে বল্লে—ভীষণ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে এ দৃশ্য না দেখাই ভাল। ভয় করে প্রভু।

দেবতা হেসে বল্লেন—শুধু বিশ্বদেবের মোহনমূর্তিই দেখবে? তাঁর করাল, রুদ্র রূপ দেখলে ভয় পাবে কেন? ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনি শোনাবো তোমাদের। আত্মার দুর্বলতা দূর কর।

—কিন্তু আপনার শিষ্যা যে অচেতন হয়ে পড়েচে! ও মেয়েমানুষ, ওকে ও রূপ আর নাই বা দেখালেন প্রভু?

সেই বিরাট কালাগ্নিবেষ্টিত মহাদেশ তখন ওদের অদূরে। যতীনের দেখে মনে হোল একটা প্রজ্বলন্ত বিশ্বপৃথিবী তার সামনে। অল্প পরেই দেবতার অদ্ভুত শক্তিবলে ওরা দুজনেই সেই বিরাট অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের চারিধারে শুধু শুভ্র জ্বলন্ত হিলিয়াম ও ক্যালসিয়াম বাষ্পরাশি মহাবেগে ঘূর্ণমান, কোথাও রাঙা শিখা নেই—শুধুই শ্বেতশুভ্র—আবার বহুদূর অগ্নিময় দিগন্তে লক্‌লকে রাঙা হাইড্রোজেন শিখা অজগরের মত ফুঁসে গর্জে তেড়ে উঠচে চক্ষের পলকে লক্ষ লক্ষ মাইল। ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনির মত ভৈরব হুঙ্কার সে কালাগ্নিমণ্ডলের চারিদিক থেকে একসঙ্গে অনবরত শোনা যাচ্চে। একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন দাউ দাউ করে জ্বলচে! অতি ভীষণ, রৌদ্ররূপ প্রকৃতির।

ভয়ে, বিস্ময়ে যতীন আড়ষ্ট হয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। রৌরব নরকেরবর্ণনা সে কিসে যেন পড়েছিল তার পৃথিবীর বাল্যজীবনে। এই কি সেই রৌরব নরক? কোন্ দেবতার তাণ্ডবনৃত্যের পদচিহ্ন এর প্রতি অগ্নিশিখাটির গায়ে আঁকা, উদ্ধত ও ভয়াবহ মৃত্যুদহন এ কালাগ্নি পরিবেশের প্রতি অণু পরমাণুর মর্মস্থলে?

দেবতা বল্লেন—ভয় পেয়ো না। এই থেকেই সৃষ্টি। দাঁড়িয়ে দেখ।

শুধু অন্ধবেগে ধাবমান অণুপরমাণু পুঞ্জের সংঘর্ষে উৎপন্ন এই বিশাল অগ্নিময় মহাদেশ যেন চারদিক থেকে ওদের ঘিরেচে—এর শেষ কোথায়? অতি নীলাভ শুভ্র অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে—ভীমবেগে সঞ্চরণশীল, আলোড়নে ও আক্ষেপে উন্মাদ সে বহ্নিমান ব্রহ্মাণ্ড ধরার মানুষ সহ্য করতে পারে না। যতীন অনুভব করলে সেও উন্মাদ হয়ে যাবে এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখলে। মনে পড়লো গ্রহদেবের সেদিনকার কথা,

সেই অদ্ভুত সত্য কথা—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতা-দৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানিজ্বলন্তি—পৃথিবীর প্রাচীন দিনের জ্ঞানীরা যে বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তপস্যা দ্বারা সত্যকে অনুভব করে।

হঠাৎ পথিক দেবতা যেন ভাবাবেগে সমাধিস্থ হয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্যে। সুন্দর চক্ষুদুটি মুদ্রিত করে সেই অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি স্থির প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন—হে অনল, হে সর্বেশ্বর, হে পরাবরস্বরূপ, কারণে তুমি বর্তমান, কার্যেও তুমি বর্তমান, তুমিই ধন্য—ধ্বংসের মধ্যে তোমার সৃষ্টি সার্থক হোক। জয় হোক তোমার!

ওদের দিকে ফিরে বল্লেন—চলো। কন্যা এখনো অচেতন? এই নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডল ছাড়িয়ে গেলেই জ্ঞান ফিরে পাবে।

যতীন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল দেবতার সেই ধ্যানপ্রশান্ত গম্ভীর রূপের দিকে। অদ্ভুত এ মূর্তি। সাক্ষাৎ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় নারায়ণ যেন তার সম্মুখে। সে মুখে অনায়াস করুণা ও গভীর মৈত্রীর চিহ্ন ব্রহ্মাণ্ডের জরামরণচক্রে বদ্ধ জীবকুলকে যেন অভয় দান করচে। কে বলেছিল এঁকে নাস্তিক?

দেবতা বল্লেন—জানো, প্রত্যেক গ্রহ বা নক্ষত্র, প্রত্যেক জড় বা বাষ্পপিণ্ড যা আকাশে ছড়ানো আছে—তোমাদের সূর্য নামক সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রও এর মধ্যে—প্রত্যেকটি এক এক চুম্বক। এরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করচে। সমস্ত ব্যোম ব্যেপে এই বিরাট চৌম্বক ক্ষেত্র—কোনো জড়দেহধারী জীবের সাধ্য নেই এই বিশাল চৌম্বকক্ষেত্রেরআকর্ষণশক্তিকে জয় করে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

যতীন বল্লে—দেব, আমাদের সূর্যও বড় চুম্বক?

—তোমাদের পৃথিবীও। সূর্য তো বটেই। প্রত্যেক নক্ষত্রও।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা বহুদূর চলে এল নক্ষত্রটা থেকে—ওদের মাথার ওপরে বহুদূরে সেটি একটি বিশাল বহ্নিগোলকের মত জ্বলচে তখনো।

হঠাৎ যতীনের মনে পড়লো সেই পূর্বের কথাটি।

সে বল্লে—দেব, আপনি তখন বলেছিলেন ওই সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে যা,ওগুলো আপনার কাছেও অদৃশ্য জীবলোক?

দেবতা বল্লেন—জীবলোক বলিনি—স্থূলদেহধারী জীব নেই ওতে। আত্মিকলোক বলেচি।

পুষ্পের এবার জ্ঞান হয়েচে। সে বিস্ময়ের সঙ্গে ওদের দিকে চেয়ে চোখ খুলে বল্লে—এ কোথায় চলেচি?

যতীন হেসে বল্লে—তার চেয়ে কোথা থেকে আসচি বল্লে প্রশ্নটা সুষ্ঠু হোত। আমরা আসচি বহুদূরের নক্ষত্রলোক দেখে।

—আমি কোথায় ছিলাম?

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

পুষ্পের এবার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে বল্লে—মনে পড়েচে এবার। দূর থেকে যা দেখেচি, তাই যথেষ্ট। উনি দেবতা—তা বলে আমরা সামান্য মানুষ—ও সহ্য করতে পারা কি—

যতীন প্রতিবাদ করে বল্লে—আমরা এখনো সামান্য মানুষ? এতকাল স্থূলদেহ ছেড়ে এসে এখনো সামান্য মানুষ?

পথিক দেবতা হেসে বল্লেন—তোমার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর আর এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গেই দিচ্চি শোনো। ওই যে সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে বহুদূরে, ওগুলো বহু উচ্চস্তরের আত্মিক লোক। ওতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা এবং তাঁদের বাসভূমি দুই-ই আমার কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। অথচ আমি কতকাল ধরে শুধু ভ্রমণ করেই বেড়াচ্চি—কত যুগ যুগ এসেচি আত্মিক লোকে—আর তোমরা দুদিন এসেই—

যতীন বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেল। এই মহান্ দেবতা—ইনিও ছোট? তাহোলে তারা কোথায় আছে? কীটস্য কীট—তাই বুঝি অত অহংকার? কিন্তু কি বিশাল, অনন্ত এ ব্রহ্মাণ্ড—কত অসংখ্য জীবলোক, আত্মিক লোক, অনাদি, অনন্ত সময় ব্যেপে কি অনন্ত বিবর্তন! তাদের সবারই ওপর সেই বিশ্বনিয়ন্তা। সত্যিই ভগবানের নাগাল কে পাবে? তিনি কোথায় আর তারা কোথায়!

যতীন বল্লে—আপনি শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন, দেব?

—কেন বলো তো?

—আজ আপনাকে যে চোখে দেখলাম—অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না স্যার—মানে—মানে—

পুষ্পের ভ্রূকুটি ওকে নির্বাক করে দিলে।

দেবতা নিজেই বোধ হয় ওর মন বুঝে জবাব দিলেন।

—এই ভ্রমণই আমার উপাসনা। কত সৌন্দর্য দেখেছি, কত ভয়ানক রূপ দেখেছি তাঁর—যেমন তোমরা আজ দেখলে। এও কিছু নয়—এর চেয়ে অতি ভীষণ রূপ আছে সৃষ্টির। সে সব সহ্য করতে পারবে না তোমরা। আমি এর মধ্যেই তাঁকে দেখি।

যতীনের চেয়ে পুষ্পের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বেশি, সে বল্লে—প্রভু, আপনি তাঁকেদেখেচেন?

ওরা একটা অপরিচিত গ্রহের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আকাশপথ থেকে তার বিচিত্র ধরনের গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব দেখা যাচ্ছিল। গ্রহে তখন রাত্রি গভীর। লোকালয় বড় কম তাতে, কেবলই ভীষণ অরণ্যানীসমাচ্ছন্ন শৈলমালা ও উপত্যকা। ওর একটা সাথী উপগ্রহ থেকে নীল জ্যোৎস্না পড়ে সে সব এমন একটা সৌন্দর্যে ভূষিত করেচে—পৃথিবীতে কেন, এ পর্যন্ত স্বর্গলোকেও সে রকমটা দেখেনি ওরা। অপার্থিব তো বটেই অদৈবও বটে। বনে বনে নীল জ্যোৎস্না—মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা সে গ্রহের গভীর রাত্রির নীলজ্যোৎস্নাস্নাত গভীর উত্তুঙ্গ শৈলারণ্যের রূপে।

দেবতা বল্লেন—কি দেখচো? এ একটা জীবজগৎ। খুব উঁচু স্তরের জীব এতে বাস করে। চলো, এর বনের মধ্যে বসি। তোমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ থেকে বহু জন্মের পর যখন লোকের মন তাঁর দিকে যায়, তখন তারা এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। শুধু তোমাদের পৃথিবী থেকে নয়—ওই ধরনের আরও অনেক নিম্নস্তরের স্থূল জগৎ থেকে। আত্মার সেই বিশেষ অবস্থা না হোলে এই সব গ্রহে আসা চলে না। এখানে কর্মবন্ধন কম। ভগবানে যারা আত্মসমর্পণ করেচে, তাদের মন বুঝে অন্তর্যামী বিশ্ব-দেবতা এখানে—এবং আরও এর মত বহু গ্রহ আছে, সেই সব লোকে—জন্মগ্রহণ নির্দেশ করেন। দেখচো না এখানে জীবের বসতি কম। ভিড় নেই। জীবনের যুদ্ধ সরল ও সহজ। সব রকম ভ্রম, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার বাঁধন যারা কাটিয়েচে, তারাই এখানে আসে শেষ জন্মের জন্যে। আর স্থূল শরীর গ্রহণ করতে হয় না তাদের এখানকার মৃত্যুর পর।

—তাহোলে পৃথিবীর লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে শুধু যে পৃথিবীতেই ফিরে আসবে তা নয়?

—পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় কম—তবুও আমি জানি, কোনো জীবাত্মা পুনর্জন্মের সময় সে যে-স্থূলজগৎ থেকে এসেছিল, সেখানেই জন্মাবে—তার কি মানে আছে! অবস্থা অনুসারে জীবের গতাগতি নির্দিষ্ট হয়। যেখানে পাঠালে যে উন্নতি করতে পারবে, তাকে সেখানেই পাঠানো হয়। অনন্ত উন্নতিতে জীবাত্মার অধিকার তিনিই দিয়েচেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করেছেন। কে বুঝবে তাঁর করুণা ও মৈত্রী! খুব উচ্চঅবস্থার আত্মা না হোলে বোঝা যায় না।

ছায়াশীতল শিলাতট ঘন বনশ্রেণীতে ঘেরা। ওরা এসে সেখানে বসেচে। যতীন আর পুষ্প চেয়ে চেয়ে দেখলে এসব গাছপালা তাদের চেনা নেই, পৃথিবীতে এত বড়, এত অদ্ভুত চমৎকার তরুশ্রেণীর সমাবেশ কোথায়? উগ্র লোভ এখানকার বন নষ্ট করেনি, ব্যবসাতে টাকা উপার্জনের জন্যে। বনকুসুমের সুগন্ধ, ঝরণার কলধ্বনি, পক্ষী-কূজন অব্যাহত শান্তি ও পবিত্রতা—সব মিলিয়ে জায়গাটা যেন তপোবনের মত মনে হচ্চে। উনি

যা বলচেন সে হিসেবে দেখলে সমগ্র গ্রহটাই তাহোলে এক সুবিশাল তপোবন। পুষ্প সময় বুঝে আগের প্রশ্নটি এখানে আবার করলে। বল্লে—আপনি তাঁকেদেখেচেন প্রভু?

পথিক দেবতার মুখ সহসা সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে কোমল হয়ে এল। তিনি বালকের মত সরল স্বরে বল্লেন—না।

—আপনিও দেখেননি তাঁকে!

পুষ্পের স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠেচে।

—আমি তাঁর রূপ দেখেচি তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে। তাঁকে চোখে দেখা যায় আমি জানি। কিন্তু আমি তপস্যা করিনি তাঁকে সে ভাবে পেতে। আমি ভবঘুরে, তাঁকে দেখে বেড়াতে চাই তাঁরই সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে। ভ্রাম্যমাণ আত্মা হয়েই আমার আনন্দ। তাই অনেকে আমাকে নাস্তিক বলে।

যতীনের হঠাৎ মনে পড়লো করুণাদেবীর কথা। তিনিও তাই বলেছিলেন। পুষ্প বল্লে—প্রভু, এই গ্রহে স্ত্রীলোক আছে?

—কেন থাকবে না? নারী বিশ্বে শক্তির অংশ। এসো—দেখবে। গ্রহে এ অংশটাতে রাত্রি। অন্য অংশে দিনমান—এদের ঘর সংসার দেখাবো—খুব শান্ত জীবন-যাত্রা এদের। বহু প্রবৃত্তি ও বাসনার সঙ্গে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে এ জন্মে পূর্বজন্মের জ্ঞান ও সংযমের প্রভাবে এরা সমাহিত ওআত্মস্থ হয়েছে।

—এদের সমাজ কেমন? ইচ্ছে করে প্রভু—জানি—

—এই গ্রহের কথা আমি ঠিক জানি না—তবে বিশ্বের এই অঞ্চলে এরকম বহু গ্রহ আছে। সব উচ্চস্তরের জীবজগৎ। জীবে জীবে যুদ্ধ রক্তপাত নেই এই সব গ্রহে। অত্যন্ত পরার্থপর এখানকার মানুষ। পরের জন্যে প্রাণ দেবে। অনেক জাতি নেই, ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত কম। সহজে খাদ্য মেলে স্থূল-দেহ ধারণের উপযুক্ত। আয়ু দীর্ঘ নয় কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে হয়—কাজেই আলস্যের স্থান নেই। অসার বস্তুতে লোভ নেই—যেমন অত্যন্ত খাদ্য সঞ্চয়, বড় আবাসবাটী, উজ্জ্বল পরিচ্ছদ— মান, যশ—অহঙ্কার, অভিমান।

যতীন বল্লে—কিন্তু নারী রয়েচে যে প্রভু, ওরা থাকলেই—

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—কি রকম, যতীনদা?

দেবতা হেসে পিতার ন্যায় সস্নেহে পুষ্পের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে বল্লেন—কন্যার মনে আঘাত দিও না—ও ঠিক বলেছে। ওরা থাকলেই হয় না গোলমাল। বাসনা থেকে পাপ, গোলমাল। এখানকার জীব বাসনা ক্ষয় করে এসেচে বহু জন্ম ধরে। এদের নিম্নস্তরের বাসনা জাগে না তীব্রভাবে। উচ্চজ্ঞানের, শিল্পের সংগীতের সাধনা বা ভগবৎসাধনা নিয়ে এরা থাকে। ভগবানের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষদর্শন এদের অনেকের হয়েচে। সুতরাং যে সব জিনিস জীবনে স্বপ্নের মত অস্থায়ী তাদের অসারত্ব এরা বুঝেচে। অত্যন্ত সাধু, নিস্পৃহ, সরল উচ্চস্তরের জীবন এখানকার—মানে, এই সব গ্রহের।

যতীন বল্লে—বাঃ, চমৎকার জীবন তো এখানকার—ইচ্ছে হয় জন্ম নিই—

দেবতা ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে এখানে একদিন তো জন্ম নিতেই হবে। কারণ এই স্বর্গলোক, যেখানে তোমরা আছ, এও মায়ার অধীন। হয়তো বহুকাল এখানে থাকবে, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবে—কিন্তু স্বর্গও দুদিনের। ব্রহ্মচক্রে জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হচ্চে, মানুষ আবার জন্মাবে, আবার মরবে, আবার জন্মাবে—যতদিন বাসনার শেষ না হয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে না যায়। ভগবানকে জানলে, জীব নিজেকে জানতে পারবে—তখন ছুটি। স্থূল দেহে জন্ম সাধারণত এই সব গ্রহে হয়—এখানে আত্মদর্শনের ও সাধনার সুযোগ ও সময় অনেক বেশি। দয়া করে বিশ্বের অধিদেবতা জ্ঞানী ও মুমূক্ষু জীবদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করান।

—দেব, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন? আপনি এত উচ্চ—

—ঐ রজনীর তারালোকের ব্যাপ্তির মধ্যে, বনপুষ্পের সুবাস ও এই সব অদ্ভুত গ্রহের বনানীর নির্জনতা ও বনবিহঙ্গের কূজনের মধ্যে, বিশ্বের রহস্যের মধ্যে আমি তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মনে মনে। তিনি অসীম করুণায় সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেচেন। নইলে সাধ্য কি এই অগণ্য লোকালোকে ভ্রমণ করি? এ শক্তি তো সকলের হয় না। আমি দেখচি এভাবে তাঁর লীলা-সৌন্দর্য দেখে বেড়ানোর বাসনা কারো নেই, এ নেশা আর কারো দেখিনি, কেবল বহুকাল আগে আর একটি আত্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—দুটি নক্ষত্রের বিরাট সংঘর্ষের দৃশ্য দেখেছিলাম দুজনে—তা থেকে তৃতীয় একটি নূতন প্রজ্বলন্ত তারকার সৃষ্টি হোল। ওঃ সে সব দৃশ্য তোমাদের শক্তি নেই সহ্য করো। আমাকে তিনি ভ্রমণের শক্তি দিয়েচেন, সুপর্ণের মত বিরাট পাখা দিয়েচেন লোকে লোকান্তরে উড়তে—এই আমার তাঁকে উপাসনা। জয় হোক তাঁর।

পুষ্প হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, দেখাদেখি যতীনও। এই মনোরম জগতের নৈশ-সৌন্দর্যের মধ্যে উচ্চস্তরের এই পথিক দেবতার বাণী স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধির বাণী বলে মনে হোলো হঠাৎ ওদের মনে। সুস্পষ্ট সত্য বাণী—চন্দ্রমা অস্তমিত হোলে, বাদ্য শান্ত হোলে, পৃথিবীর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে যেমন একদিন বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

পুষ্প মাথানীচু করে বল্লে—আশীর্বাদ করুন দেব—

ওর অশ্রুপ্লাবিত চোখ দুটির দৃষ্টি নতুন গ্রহের মৃত্তিকার দিকে আবদ্ধ রইল।

দেবতা বল্লেন—আশীর্বাদ করচি কন্যা, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের দেব-আত্মার সাক্ষাৎ পাবে। আমি ভবঘুরে মাত্র। সত্যিকার জ্ঞানীর দর্শন পাবে। তবে তোমার ভাগ্যে এখনো অনেক সংগ্রাম আছে। কিন্তু তুমি বিশ্বদেবের করুণা লাভ করবে। আমি যাদের পাদস্পর্শ করবার যোগ্য নই, এমন আত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হবে।

এমন সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল সেখানকার বনে-বনানীতে। আকাশের নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে এল—সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে এল। পক্ষী-কূজন জেগে উঠলো বনভূমির বুকে।

পুষ্প ভাবছিল, কোনো এক সুদূর জন্মান্তরে এই গ্রহলোকে যদি সে জন্ম নেয়, সাথী তারার নীল-জ্যোৎস্নায় এরই শৈলারণ্যে, উপত্যকায়, গিরিসানুদেশে, শান্ত উপত্যকায় সে হাত-ধরাধরি করে বেড়াবে যতীনদার সঙ্গে—দুজনে মিলে ভগবানের উপাসনা করবে সারা জীবন এই তপোবনসম গ্রহলোকের পবিত্র আশ্রয়ে, কোনো গিরিনির্ঝরিণীর কূলে কুটির বেঁধে। জগতের বিশাল পথে ঘুরতে ঘুরতে কবে এখানে এসে হয়তো পড়তে হবে, তা কেউ জানে কি? মহাপুরুষের আশীর্বাদ বৃথা যাবে না।

দেবতা বল্লেন—চলো, এখুনি লোকে জেগে উঠবে। এরা আমাদের হয়তোদেখতে পাবে—এদের ক্ষমতা বেশি। তোমাদের তো নিশ্চয় দেখতে পাবে। সরে পড়ি তার আগে।

ওদের বুড়োশিবতলার ঘাটে পৌঁছে দিয়ে পথিক দেবতা পুষ্পের চোখের জলের মধ্যে অদৃশ্য হোলেন। তার অনুনয় ও অনুরোধের উত্তরে বলে গেলেন, সময়ে আবার দর্শন দেবেন।

১৭

বুড়োশিবতলার ঘাটে আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা। ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে ছাদে ছাদে প্রদীপ দিয়েচে মেয়েরা। এদের প্রাচীন ঘাটের রানায় পুষ্প নিজের হাতে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলেচে। গঙ্গাবক্ষ অন্ধকার, দু-একটা নৌকোর ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্চে—ছপ্ ছপ্ দাঁড়ের শব্দও পাওয়া যাচ্চে।

পুষ্প বল্লে—এসো যতীনদা, আমরা আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবি বসে বসে। মনে পড়ে কেওটা-সাগঞ্জের দিন? আমি পিদিম দিচ্চি, তুমি এক পয়সার কুচো গজা কিনে আনলে—

—কুচো গজা না জিবে গজা—

—না, কুচো গজা। বেশ মনে আছে ময়রা বুড়ির দোকান থেকে। নিতাই-এর ঠাকুরমা, মনে আছে?

—খুব। বটতলায় দোকান ছিল। আহা, সে তোকতদিন মরে এসেচে এখানে—তাকে কখনো দেখিনি!

—তারপর সেদিন দুজনেই মার খেলুম বাড়ি ফিরে। অত রাত পর্যন্ত তুমি আর আমি ঘাটে বসে ছিলুম পিদিম দেওয়ার পরে। মনে পড়ে যতীনদা?

—খুব। আমি মার খাইনি। মাসিমা তোকে মারলেন। আমিই বরং উত্তরের কোঠায়—যতীন হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলো। বল্লে—পুষ্প আমি এখুনি কলকাতায় যাবো—

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন?

—তোর বৌদিদির কিছু হয়েছে। একটা আর্তনাদ শুনলাম তার গলার। দেখে আসি—পুষ্প, সত্যি বলচি, ও আমায় শান্তি দিলে না। তুই যতই চেষ্টা করিস, আমারভাগ্য ওর সঙ্গে বাঁধা। চল্লুম আমি—

—বা-রে, আমিও বুঝি বসে থাকবো? দাঁড়াও—

মনে মনে পুষ্প বড় হতাশ হোল। তারও জীবন যেন কেমন। কিছুতেই কি কিছু সুরাহা হয় না? সব সময় দেওয়ালের ওপর দিয়ে কোন বিকটমূর্তি কঙ্কাল উঁকি মারে, অমঙ্গল ভরা দৃষ্টিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত কষ্ট করে আজ সে দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যাটিকে প্রাণপণে সাজালে—সব বৃথা!

নামবার পথে পুষ্প বল্লে—কলকাতায় আসতে পারিনে, কষ্ট হয়। উঃ দেখেছ কেমন কালো কালো কুয়াশার মত জিনিস! মানুষের অর্থলোভ, বিলাসিতা—নানারকম খারাপ চিন্তা—সকলের ওপর, লোভ—এই সব এক ধরনের কালো কুয়াশা সৃষ্টি করেচে। ওর মধ্যে দিয়ে আসতে দম বন্ধ হয়ে যায় যেন—সব বড় শহরেই এরকম দেখেচি—এখানে মানুষ সব ভুলে শুধু ভোগ নিয়ে আছে।

সেই বাসাবাড়ি—যতীন এর আগেও দুবার লুকিয়ে এসে দেখে গিয়েছিল আশাকে। পুষ্প তা জেনেও কিছু বলেনি। যতীনদা ভাবে পুষ্প পোড়ারমুখীকে লুকিয়ে কোনো কিছু করা যায়! যতীনদার বয়স হয়েছে বটে কিন্তু ছেলেমানুষি ঘোচেনি।

আশার অবস্থা ভাল নয়। নেত্যনারায়ণ ওকে ফেলে আজ মাস চার পাঁচ হোল চলে গিয়েচে দেশে। নিজের গ্রামে গিয়ে সে মুদির দোকান খুলেচে—কিন্তু আশার ফেরবার মুখ নেই। বাড়িওয়ালীর দয়ায় এবং হাতের দু'একগাছি সোনার চুড়ি বিক্রির টাকায় এতদিন যা হয় চললো। কিন্তু তার মধ্যে বাড়িওয়ালী নানারকম উপার্জনের ইঙ্গিত করেচে। এক মারোয়াড়ি লোহাওয়ালা তাকে দেখেচে দোতলার ছাদ থেকে—আশা যখন ওদের বাসায় তেতলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। বেলঘরে না সোদপুরে তার বাগানবাড়ি, মস্ত বাগান—ইত্যাদি।

তাকে সদুপদেশও দিয়েচে—এই তো বয়েসখানা চলে যাচ্চে গো—আর দুটো বছর। তারপর কেউ ফিরে চাইবে? না বাপু। বলে, মেয়েমানুষের রূপ আর জোয়ারের জল। হ্যাঁ, দেমাক থাকতো যদি সোয়ামী পুত্তর থাকতো। নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেচ একবার?

আশা একা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে—তার মনে যে নিরাশার অন্ধকার ছেয়েচে, কোনোদিন তা ফুটে আলো বেরুবার সম্ভাবনা আছে কি? হাতের পয়সা ফুরিয়েচে, আর বড়জোর দশটা দিন। তারপর?

গভীর রাত্রি কলকাতায়। আশা এখনো ঘুমোয়নি—দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই চোখে।

যতীন আকুল হয়ে ওর শিয়রে বসে ডাকলে—আশা, আশা লক্ষ্মীটি—আমি এসেচি আশা—

পুষ্পও বসলো পাশে। পুষ্প যে ভবিষ্যৎ দেখচে, যতীন তা দেখবার শক্তি রাখে না। পুষ্প খুব দুঃখিত হোল। কর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আশা-বৌদির সঙ্গে যতীনদার গাঁটছড়া বর্জ-আঁটুনিতে আঁটা। দুঃখ হয়, কিন্তু সে জানে, কিছু করবার নেই তার। সেএখানে গাড়ির পঞ্চম চক্রের মত অনাবশ্যক। সে না থাকলেও কর্মের রথ দিব্যি চলবে।

যতীন বল্লে—পুষ্প, আমায় সাহায্য করো—

—ভাবচি।

—কি ভাবচো?

—ভাবচি তোমার অদৃষ্ট যতীনদা—

—এখন কি হেঁয়ালি উচ্চারণ করবার সময় পুষ্প?

হায়! সে যা বলতে চাইচে, যতীনদাকে যদি কেউ তা বুঝিয়ে দিতে পারতো! যতীনদা চিরকাল তাকে ভুল বুঝে আসচে, এখনো বুঝবে তা সে জানে। কিন্তু কি করবে সে, এ তারও অদৃষ্টলিপি।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—তা বলিনি। তুমি বল্লে বুঝবে না আমার কথা। আশা বৌদির এ অবস্থা দেখে—আমি মেয়েমানুষ—আমার কষ্ট হচ্চে না তুমি বলতে চাও? কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারবো না তুমি আমি। আশা বৌদিদির কর্মফল—একভগবান যদি বাঁধন কাটেন তবেই কাটে। তোমার আমার দ্বারা হবে না।

—এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যাই কি করে তোর বৌদিদিকে—বল্ পুষ্প—তা পারি? যতীনের কাতর উক্তিতে পুষ্পের চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো— আশালতার দুরবস্থার জন্যে নয়, অন্য কারণে। সে বল্লে—পৃথিবীতে থাকতে, উপকার করতে পারতে। এ অবস্থায় আমি তো কোনো উপায় দেখচিনে। আচ্ছা—দেখি—একটু ভাবতে দাও—

পুষ্প একটু পরে বল্লে—এখানে থাকবে না। চলো যতীনদা। এখান থেকে যেতেই হবে। নইলে তোমার আসন্ন বিপদ।

যতীন বল্লে—তুমি বড় ভয় দেখাও, পুষ্প। চলো করুণাদেবীর কাছে যাই, তাঁকে সব বলি।

—বলবে কি, তিনি অন্তরের কথা জানতে পারেন। ওঁরা হোলেন উচ্চ স্বর্গের দেবদেবী। স্মরণ করলেই বুঝতে পারেন—কিন্তু সময় না হলে আসেন না। বৃথা দেখা দেন না। তা ছাড়া কলকাতার এই বিশ্রী পাড়ায় তাঁকে আমি এনে এর সঙ্গে জড়াতে চাইনে।

সারারাত যতীন ও পুষ্প আশার শিয়রে বসে রইল। পাশের একটা বাড়ির খোলা জানালা দেখিয়ে বল্লে—দ্যাখো যতীনদা, ওখানে ওরা কি করচে! দেখে এসো না?

—কি?

—তুমি গিয়ে দেখে এসো, অমন জায়গায় যাবো না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

যতীনের কৌতূহল হোল, সে গিয়ে দেখলে, কয়েকটি ভদ্রলোক, সাজে পোশাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়—একটি ঘরে বসে তাসের জুয়া খেলচে। পাশের টেবিলে একটি বোতল, কয়েকটি গ্লাস—এক টিন সিগারেট, দু'চারটি শূন্য চায়ের কাপ ডিশ্—একটা বড় প্লেটে খানকতক অর্ধভুক্ত পরোটা ও অন্য একটা পাত্রে কিছু ডালমুট।সিগারেটের ছাই ও ডালমুট ঘরের মেজের দামী কার্পেটের ওপর ছড়ানো—যদিও সিগারেটের ছাই ফেলবার পাত্র টেবিলের ওপর রয়েচে কিন্তু আধপোড়া সিগারেট আর সিগারেটের ছাইতে পাত্রটা বোঝাই। ওরা ছোট ছোট তাকিয়া পাশে রেখে একমনে খেলেই চলেচে। বিছানার পাশে রাশীকৃত দশটাকার নোট একটার পর আর একটা হিসেবে সাজানো, ওপরে একটা পেপারওয়েট্ চাপানো। ওরা মাঝে মাঝে বোতল থেকে ঢেলে মদ খাচ্চে, সিগারেট ধরাচ্চে, মাঝে মাঝে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়ে হারজিৎ-সূচক হিসেব রাখচে। এদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েচে, দেখলেই বোঝা যায়, মাথার চুলে কালো রং খুঁজে বের করা কঠিন। ফুলফোর্সে মাথার ওপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরচে, দেওয়ালের ঘড়িতে রাত দেড়টা বাজে।

একজন ডেকে বল্লে—ও প্রমীলা—টুসু—খাবার দিয়ে যাও।

দু'তিনবার ডাকের পর একটি সুন্দরী রমণী ঘুম-ঢুলুঢুলু চোখে একটা বড় প্লেটে কতকগুলো কাটলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বল্লে—নাও সব—রাত কম হয়নি, আমার ঘুম পেয়েছে—কাল আবার হাসপাতালের ডিউটি সকাল থেকে শুরু—

একজন বল্লে—সোডা ফুরিয়েচে—টুসু। লক্ষ্মীটি, একটা সোডা আমাদের যদি দিয়ে যাও—

আর একজন বল্লে—অমনি ওই সঙ্গে গোটাকতক পান—

সুন্দরী মেয়েটি রূপে ঘর আলো করেচে। ওর পরনে দামী সিল্কের শাড়ি, কাজ করা ব্লাউজ, অনাবৃত কণ্ঠদেশ, বক্ষঃস্থলে জড়োয়ার কাজ করা নেকলেস্ চিক্ চিক্ করচে। সে যেতে যেতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কৌতুক-মিশ্রিত সুরে বল্লে—পারবো না এত রাত্রে পান সাজতে বসতে—

পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের সেই লোকটি কপট মিনতির সুরে বল্লে—আমার দু'হাত বন্ধ, মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে যদি দিয়ে যেতে টুসু—

যতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না। পুষ্পকে এসে বল্লে—তাস খেলচে। তাসের জুয়ো—টাকা জিত্চে।

পুষ্প বল্লে—একবার দেখে এসেচি জানালা দিয়ে। ওরা অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক—দেখে মনে হয় টাকার ভাবনা নেই—অথচ টাকার এমন নেশা?

—তুমি এসব বুঝবে না পুষ্প। টাকার নেশা নয়, জুয়োর নেশা—

—ঐ হোল। ওই মেয়েটি কে?

—মেয়েটি টুসু। ভাল নাম যেন প্রমীলা—

পুষ্প হেসে বল্লে—তা তো বুঝলাম, ওদের কে? কি সম্বন্ধ ও বাড়ির সংসারে?

যতীন কিছু বল্লে না, সরলা পুষ্প কত কথা জানে না সংসারে। ওর নিষ্পাপ মনে—দরকার কি?

পুষ্প আপন মনেই যেন বল্লে—কিন্তু ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ওর মধ্যে কেন? ওঁকে দেখে কষ্ট হয়। এখনো ভোগের নেশা এত! পরকালের চিন্তা করবার সময় হয়নিআজও?

—তোমার মত সবাই হবে? বাদ দাও না, বাজে কথা বলো কেন?

পুষ্প দুঃখিত কণ্ঠে বল্লে—আমার বাবার মত দেখতে। সত্যিই কষ্ট হোল। ভগবানের দিকে মন দেবার ওঁর সময় যে পার হয়ে গেল!

—তোমার তাতে কি? বড় বাজে কথা তোমার পুষ্প—

—আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়চে।

—কি হবে ওর পুষ্প? সত্যি কথা বল। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাস।

—দেখতে পাই কে বলেচে?

—আমি সব জানি—

পুষ্প গম্ভীর সুরে বল্লে—কেউ কিছু নয়। মানুষের মিথ্যে অভিমান। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এসো দুজনে।

—এখানে?

—এখানেই। তাঁর নামে সব পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি এখানেই কি নেই? কে বলেচেন নেই? তিনি তাঁর অসীম কৃপা ও করুণায় এই হতভাগিনী আশাবৌদির মঙ্গল করুন।

করুণাদেবীর বিনা সাহায্যেও আজকাল পুষ্প মহর্লোকের সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে, এমন কি আরও ঊর্ধ্বতর লোক পর্যন্ত। যতীনকে অত উচ্চস্তরে কোনো শক্তিমান আত্মার বিনা সাহায্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে পুষ্প অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাই মাঝে মাঝে যায়। সে বলে এতে অনেক কিছু সে দেখে, শোনে ও শেখে। অনেক ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে এসে মানসিক ও আত্মিক শক্তির প্রসার হয়।

সেদিন যতীন ছাড়লে না, বল্লে—আমি যদি উচ্চস্তরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি—তুমি সেখানে আমাকে ফেলে যেও। যতদূর জ্ঞান থাকে ততদুর নিয়ে যাও না? আমিও বেড়িয়ে দেখতে, জানতে ভালবাসি না কি ভাবচো? রেলভাড়ার টিকিট তো লাগচে না।

—দ্যাখো যতু-দা, এখনো পৃথিবীর ওই উপমা ও চিন্তার ধরনটা ছেড়ে দাও। তোমায় এই জন্যেই বারণ করি বার বার পৃথিবীতে যেতে। ওখানে নানা আসক্তি, ইচ্ছা, ভোগপ্রবৃত্তি, সর্বত্র ছড়ানো রয়েচে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। স্থূল দেহ ভিন্ন ওই সব ইচ্ছা পূরণ করা যায় না। স্থূল জগতের স্থূল প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম দেহে কি করে চরিতার্থ করবে? কাজেই ওই সব আসক্তি যেমন তোমার মনে আসন গেড়ে বসবে, তখনই তোমাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে বাধ্য করবে। সুতরাং আবার পুনর্জন্ম।

—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই তোমার মত।

—সে আমি জানি। সেজন্যেই তো তোমার জন্যে ভয় হয়—চলো তোমাকে মহর্লোকে নিয়ে যাই—

ওরা ব্যোমপথে অনেক ঊর্ধ্বে এমন এক স্থানে এল, যেখানে উচ্চলোকের জ্যোতির্ময় অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ। তার পরেই এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ; অতি চমৎকার বন-পর্বতের মেলা, বনকুসুমের অজস্রতা। অথচ এখানে কোনো অধিবাসী নেই, অনেকদূর গিয়ে একটা নীল হ্রদ, চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। পুষ্প বল্লে—চলো যতু-দা, ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে একটি গ্রাম আছে, অনেক জ্ঞানী মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে বাস করেন—তোমায় দেখিয়ে আনি।

বনবীথির অন্তরালে শুভ্র স্ফটিকসদৃশ কোনো উপাদানে তৈরি একটি বাড়ি, দেখতে অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত। হ্রদের নীলজলের এক প্রান্তে কুসুমিত লতাবেষ্টিত এই সুন্দর গৃহটি যতীনের এত ভাল লাগলো! এমন সুন্দর পরিবেশ আর্টিস্টের কল্পনায় ছাড়া যতীন অন্তত পৃথিবীতে কোথাও দেখেনি। আপন মনেই সে বলে উঠলো—কি সুন্দর!

একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র সবই অপরিচিত ধরনের। পৃথিবীতে ব্যবহৃত কোনো আসবাব সে ঘরে যতীন দেখলে না। লোকটিকে দেখেই মনে হোল অনেক উচ্চ অবস্থার আত্মা ইনি। ওদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তিনি বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে আসচো?

যতীন বল্লে—ভুবর্লোকের সপ্তম স্তর থেকে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন—না, তা কেমন করে হবে? তা হোলে তো আমাদের এই জনপদ, এই ঘরবাড়ি বা আমাকে কিছুই দেখতে পেতে না? নিশ্চয় তোমরা উচ্চতর স্তরের অধিবাসী।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ লোক?

—মহর্লোকের প্রথম স্তর। ভুবর্লোকের অধিবাসীদের পক্ষে এখানকার বাড়িঘর, মানুষ, বন, পর্বত সব অদৃশ্য। আমার অবস্থার আত্মা না হোলে আমার এ গৃহে আমাকে পাবেই না। মহর্লোক কোনো একটা স্থানও বটে, বিশেষ একটা অবস্থাও বটে। স্থান ও অবস্থার একত্র যোগ না ঘটলে এ লোকে চৈতন্য জাগরিতই হবে না যে। তা নয়, তোমাদের মধ্যে একজন কেউ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচ, নইলে এখানে আসতে পারতে না।

—সে এই মেয়েটি। আমি নই—

পুরুষটি হেসে বল্লেন—আমিও তা অনুমান করেচি।

পুষ্প সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বল্লে—আমি কি-ই বা—ওঁর জন্যেই—

যতীন বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে—আপনি পৃথিবী চেনেন তো স্যার?

—আমি আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। সেই আমার শেষ জন্ম। সেবার ছিলাম গ্রীসে, তার পূর্বে দুই জন্ম ভারতবর্ষে ও একজন্ম সুপ্রাচীন মিশরে কাটাই।

—তার পূর্বে?

—তার পূর্বে পৃথিবীতে ছিলাম না। অন্য গ্রহে সৌর-জগতে বহু জন্ম নিয়েচি।কত অদ্ভুত গ্রহ আছে, অদ্ভুত জীবকুল আছে! বিচিত্র লীলা ভগবানের।

হঠাৎ পুষ্প বল্লে—আপনি ভগবানকে দেখেচেন, দেব?

—না।

—আপনি বিশ্বাস করেন তিনি দেখা দেন?

—না।

—আশ্চর্য! ভগবানে বিশ্বাস করেন না?

—তাঁর কোন রূপে আমার বিশ্বাস নেই, এই কথা বলচি। ভগবানকে তোমরা যে চোখে দ্যাখো, আমরা সম্পূর্ণ অন্যচোখে দেখি। তিনি অচিন্তনীয় মহাশক্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। দেহধারী হয়ে দেখাও দেন, আমার এই গ্রামের একটি মেয়ে প্রায়ই তাঁর দেখা পায়।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—তবুও আপনি বিশ্বাস করেন না?

—যে যেভাবে কল্পনা করে, তাকে সেইভাবেই তিনি দেখা দেন। এতে আমি বুঝি, এই তোমরাই আমার ভগবান হতে পার। নিত্যমূর্তি কি আছে তাঁর? সবই তাঁর মূর্তি—এই গাছপালা, এই বনভূমি, এই তুমি মেয়েটি—ঐ অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডকুল—

কথা বলতে বলতে ভক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতার জ্যোতিতে তাঁর মুখের শ্রী হোল অপূর্ব; তীক্ষ্ণ নীল আলোক বড় বড় চোখ দিয়ে কখনো ঠিকরে বেরুতে লাগলো— কখনো শান্ত হয়ে আসতে লাগলো। ভগবানের কথায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে এল।

পুষ্প তার ভুল বুঝে বল্লে—আমায় ক্ষমা করুন দেব, আমি বুঝতে পারিনি আপনাকে। আপনি তাঁকে ভক্তি করেন।

যতীন বল্লে—পৃথিবীতে বহুদিন যান নি?

—পৃথিবীর বসন্তকালে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ফুল ফোটে, সেইসময় পৃথিবীর মহাঅরণ্যে পর্বত-সানুতে নদীতীরে বেড়িয়ে দেখে আসি। কখনো কোনো অসহায়া নারীর দুঃখ দেখি কোনো জনপদে, তার দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করি। নীলনদীর জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জন তটে বসে ভগবানের ধ্যান করি। শুধু পৃথিবী নয়, বহু গ্রহে এমনি আমাদের যাতায়াত।

—আপনি যা করচেন, শুধু আপনাদের মত উচ্চলোকের অধিবাসীরাই তা করতে পারেন। আচ্ছা, পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য কি?

—প্রেম—এক ওর মধ্যেই সব।

—আপনি একথা পৃথিবীতে প্রচার করেন না কেন?

—কতবার প্রচার করা হয়েচে!আমার চেয়ে উচ্চতর ও শক্তিধর দেবতারা মানুষের দুঃখে পৃথিবীর শত কষ্টের মধ্যেও দেহ ধরে একথা বলতে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করে নেমে গিয়েচেন বলতে। প্রেম—একটি কথা। কেউ শোনেনি।

—তাহোলে কি আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন?

—অদ্ভুত চরিত্র ভগবানের। বার বার সুযোগ দেন। বিরক্ত হন না। অপূর্ব তাঁর ধৈর্য, অপূর্ব তাঁর ক্ষমা। অন্য কেউ হোলে আর সুযোগ দিত না—কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। আবার লোক পাঠান অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে। তোমাদের পৃথিবীতে ভগবানের তুল্যঅবহেলিত প্রাণী আর কে? কেউ তাঁর কথা ভাবে না।

এই পর্যন্ত বলেই অপূর্ব ঈশ্বরীয় প্রেমে মহাপুরুষের চোখ দুটি নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করতে লাগলো। পুষ্প শ্রদ্ধায় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লে—আপনি ঠিক বলেচেন দেব, পৃথিবীতে কেউ ভাবে না ভগবানের কথা। যে ভাবে সেও টাকা চায়, সাংসারিক সুখ চায়। প্রেমভক্তি দুর্লভ হয়ে পড়েচে।

মহাপুরুষ বল্লেন—প্রেমভক্তি ছেড়ে দাও। ও অনেক উঁচু কথা। অতি সাধারণ ভাবেও ক'জন ভগবানের চিন্তা করচে। আমি পৃথিবীতে যাই, জনপদে বা তোমাদের বড় বড় নগরে যাই না। দুর্নিবার লোভ, অর্থাসক্তি, ঐশ্বর্য-কামনা, নারী, সুরা, কাম, হিংসাদ্বেষ বাতাসে ছড়ানো ঘন ধোঁয়ার মত। ভাই ভাই-এর বুকে ছুরি বসাচ্চে। সত্য বিদায় নিয়েচে। পৃথিবীর এখনকার দর্শন হচ্চে খাওয়া-পরার দর্শন। কিসে ভাল খাবো, ভাল পরবো। আমি আপন মনে মরুভূমিতে বেড়াই জ্যোৎস্নারাত্রে, হিমালয় কি অন্য কোন পর্বতচূড়ায় বসে থাকি, নীলনদ বড় ভালবাসি, তার তীরে একা বসে থাকি। অথচ এক কথা—প্রেম, এই যদি ওরা শিখতো—জীবে প্রেম, ভগবানের প্রেম!

তিনি এই পর্যন্ত বলে চুপ করতে পুষ্প বল্লে—বলুন দেব, অমৃতের মত বাণী আপনার।

—আমার? আমার কিসের কন্যা? এ বাণী স্বয়ং ভগবানের। তিনি অনেক উঁচু, তাই মানুষের দেহ ধরে পৃথিবীতে গিয়ে একথা বলে এসেছিলেন। কেন না মানুষের দেহ ধরে না গেলে মানুষের সাধ্য কি যে অসীমকে গ্রহণ করে? একবার নয়, বার বার গিয়েছিলেন। ক্লান্তিহীন তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু কে শুনচে? ধনজনের মোহে, লোভের মোহে, বিলাসের মোহে—স্থূল ভোগের মোহে সবাই উন্মত্ত। একবারও যদি নির্জনে উচ্চতর সত্যের ধ্যান করতো মানুষে!

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আজ এখানে আসা তার সার্থক হয়েচে বটে। সে বল্লে—তবে কি তাদের উদ্ধার নেই, দেব?

—একটা কথা মনে রেখো। জোর করে মানুষের ওপর কোনো সত্য, কোনো বাণী চাপানো যায় না। মানুষ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বাণী অন্তরালে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। বুদ্ধিহীন বা স্থূলবুদ্ধি ভোগাসক্ত মন হঠাৎ ভগবানকে গ্রহণ করতে পারে না।পারলেই যে মুক্তি—যে ভগবানকে ভালবাসে, সে ভগবানের সমান হয়ে যায়। এত সহজে তা হবে কোথা থেকে? কাজেই মহাযুগ মন্বন্তর চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মুক্তি

পেতে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে যারা মানুষ হয়ে জন্মেছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম—এইবার তারা মানব-আবর্ত কাটিয়ে দেবযান-পথে মহর্লোকে যেতে শুরুকরচে। ওদের এতদিন পরে পৃথিবীতে গতাগতি শেষ হোল।

—এর চেয়ে আগেও হয়?

—তুমি বুঝলে না—এ তো হোল স্বাভাবিক নিয়মে, লক্ষ বৎসর পরে। এক জন্মেই মুক্তি হয়—যদি সত্যের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবৎপ্রেমে বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে মনে। এদের জন্যে ভগবান কত সাহায্যের ব্যবস্থা করেচেন, তা যদি জানতে! যে সত্যকে জানতে চায়, ভগবান তাকে জানবার সব রকম সুযোগ দেন। চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে আনি—ক'দিন থেকে আমি দেখছি তোমাদের পৃথিবীতে—

যতীন ও পুষ্পকে নিয়ে সেই উচ্চলোকের পুরুষটি চক্ষের নিমিষে পৃথিবীতে নেমে এলেন। সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে। যে নদীতীরে এসে ওঁরা দাঁড়ালো, সে নদীটি খরস্রোতা, তীরে শস্যক্ষেতের মধ্যে এক জায়গায় বড় একটা গাছ। পুষ্প ও যতীন নদীটি চিনতে পারলে না। বৃক্ষের তলে একটি তরুণ যুবক ধ্যানমগ্ন। যুবকের রং টকটকে গৌর, মুখের চেহারা লালিত্যপূর্ণ, বেশ বড় বড় চোখ—কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে দাড়ি রেখেচে—রেশমের মত নরম, চকচকে দাড়ি। যতীনের মনে হোল যীশুখ্রিস্টের ছবির মত মুখখানা ওর দেখতে।

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—এ কি নদী দেব?

—এ রাভি নদী। এটি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ। ছেলেটির বাড়ি এই জনপদে, সবাই ঘুমুলে গভীর রাত্রে নদীতীরে বৃক্ষতলে ও রোজ একা এসে ভগবানের চিন্তা করে, গান করে আপন মনে। ওই দ্যাখো ওর মা খাবার দিয়ে যায় এ সময়—আসচে—

একটি মেয়ে—মেয়েটি প্রৌঢ় বটে, কিন্তু সুন্দরী—দূরের গ্রাম থেকে একটা পাত্রে খাবার নিয়ে এসে ছেলেটির সামনে রাখলে। জিজ্ঞেস করলে—বাড়ি যাবি?

ছেলেটি বল্লে—তুমি যাও মা, আমি একঘণ্টা পরে যাবো।

—ঠাণ্ডা লাগাসনে বেশি, বাচ্চা।

ওর মা সন্দেহে ছেলের দিকে দু'তিনবার চেয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো যতীন ও পুষ্পর। আকাশপথ আলো হয়ে উঠলো ক্ষণকালের জন্যে এবং সেই আলোর রেখা ধরে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ নেমে এসে ওই ধ্যানরত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। আগন্তুক দেবতার রূপে ও দেহজ্যোতিতে স্থানটি যে আলো হয়ে উঠলো, যদিও যুবকটি তার কিছুই বুঝতে পারলে না।

পুষ্প ও যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—উনি কে?

—উনি সত্যলোকের প্রাণী। পৃথিবীতে ওঁরা তো দূরের কথা, আমাদেরই আসতে কষ্ট হয়, অথচ দ্যাখো ওই সত্যপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত যুবকটিকে প্রেরণা দিতে নিজে এসেচেন। যেখানে ভগবানের নামগান হয় সেখানে ভগবান স্বয়ং আসেন—এ তোমরা অবিশ্বাস কোরো না।

তারপরে ওরা তিনজনেই দূর থেকে সত্যলোকের সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করলে। তিনি ওদের দিকে চেয়ে সদয় হাস্য করলেন ও দুটি আঙুল ওপর দিকে তোলার ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করলেন। পুষ্পর চোখে জল এল। কি সুন্দর রূপ দেবতার।

পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পুষ্পদের সঙ্গী পুরুষটি বল্লেন—দেখলে? নীলনদের তীরে বহু হাজার বৎসর পূর্বে যাপিত আমার একটি গোপন রাত্রির কথা আজও আমার মনে হয়। একা ছিলাম সে রাত্রে। বসন্তকাল ছিল, পুষ্পিত হয়ে ছিল

নদীতলের ওষধি ও বনতরুরাজি—ক্ষুদ্র একটি পর্বতের চূড়ায় নদীর অপর পারে আমি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমার সারাজীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়—দশ জন্মের প্রগতি একজন্মে সাধিত হয়। ভগবানের কৃপা নইলে হয় কি? কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরি হওয়া দরকার। পরকে ভালবাসো, জীবকে সেবা করো। আসক্তি ত্যাগ করো। ভগবানে মন দাও। মনের কুয়াশা না কাটলে সত্যর আলোকপাত কি হয়?

—আপনারা দয়া করুন পৃথিবীর জীবকে—তাহোলেই হবে।

—আমার ইচ্ছা আছে, আর একবার পৃথিবীতে দেহধারণ করবো। যা পারি প্রচার করে করে আসি।

—পৃথিবীতে গিয়ে ভুলে যাবেন না?

—দেহ ধরলেই বিস্মৃতি আসে। তবে তার ব্যবস্থা আছে। অন্য দিব্য পুরুষেরা গিয়ে আমায় বাল্যে ও যৌবনে নানাভাবে মনে করিয়ে দেবেন। ওঁরা দেখা দিতে পারেন আমায় স্বপ্নে কিংবা রাত্রিকালে, নয়তো ঘটনার এমন যোগাযোগ ঘটাবেন যে আমার আত্মা ক্রমশ জেগে উঠে বুঝতে পারবে পৃথিবীতে সে কেন এসেচে; ভোজ খেতে, নারী ও সুরা নিয়ে আমোদ করতে আসেনি। ভগবানের বিশ্বে এসবের ব্যবস্থা আছে—যে ভাল কাজ করতে চায়, তাকে সাহায্য দেওয়া হয়। তিনি যে বিরাট মহাশক্তি, সেই শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলে জীব পলকে প্রলয় করতে পারে, অসাধ্য সাধন করতে পারে, মহাশক্তির সদয় সাহায্য সে পায়। এ রহস্য কে বোঝে? পৃথিবীতে সবাই অর্থ নিয়ে ব্যস্ত, সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট এই করুণাময়ী মহাশক্তির রহস্যভেদ করতে ব্যস্ত ক'জন?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আপনি বলছিলেন আপনার গ্রামে একটি মেয়ে ভগবানের দেখা পায়—সে কি রকম?

—সে উচ্চ অবস্থার মেয়ে। তার শেষ জন্ম হয় পৃথিবীতে, সাতশো বছর পূর্বে। মানব-আবর্ত কাটিয়েচে। স্বামী-ভাবে ভগবানকে চিন্তা করে। ভগবানের দেখা পায় সেইভাবে। আমি জানি ভগবানের এসব মায়িক রূপ। তাঁর রূপের কি কোনো সীমা আছে? ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ডাকে, তিনি তার কাছে যাবেনই। যে রূপে চায়, সে রূপেই যাবেন। এ একটা অমোঘ নিয়ম। যেমন চুম্বকের কাছে লোহা ছুটে যাবেই—তেমনি। ভগবান যাবেনই ভক্তরূপ চুম্বকের কাছে। তাঁকে টেনে নেবে আকর্ষণকরে ভগবান লোহা, ভক্ত চুম্বক। এ ওকে টানচে ও একে টানচে। পৃথিবীর লোককে এ সকল কথা বিশ্বাস করানো কঠিন। বিশ্বাস করলে তো মানুষ আর মানুষ থাকে না, ভগবান হয়ে যায়।

ওরা সব মহর্লোকের সেই গ্রামটিতে ফিরে এল। তারপর তিনি ওদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আবাস-বাটী দেখালেন জনপদের। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে নানা রঙের ফুল, কোনো স্থানে কোনো অপার্থিব পশুর মূর্তি, স্ফটিকে তৈরি। কোথাও বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও সরোবর। দূরে দূরে এইসব বনবীথি ও উদ্যানের মধ্যে মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা। শুভ্র স্ফটিক প্রস্তর ছাড়া অন্য কোনো উপাদান এই প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়নি। গাছে গাছে কুসুমিত লতা মালার আকারে জড়িয়ে, আরতির পঞ্চপ্রদীপের শিখার মত কোনো কোনো রক্তবর্ণ পুষ্প ঊর্দ্ধমুখী হয়ে উঠে আছে। জনপদের কিছুদূরে নিভৃত অরণ্য শিলাবাঁধানো পথের দুপাশে, অথচ সে সব অরণ্যে জুঁই, গোলাপ, কাঞ্চন ফুলের মত দেখতে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর আকারের সুগন্ধি বনকুসুম অজস্র ফুটে আছে। পাহাড়ের কোলে গুহা ও প্রস্তরনির্মিত মন্দির—যেন বহুকালের বলে মনে হয়।

ওদের সঙ্গী বল্লেন—ওই সব গুহাতে মহর্লোকের প্রাচীন সাধুরা ভগবানের চিন্তাতে নিমগ্ন থাকতেন। এখন বহুদূর পথে, অনেক ঊর্দ্ধলোকে তাঁরা চলে গিয়েচেন, পৃথিবীর হিসেবে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। এখন ওগুলি তীর্থস্থান হিসেবে বিদ্যমান আছে, তবে ওই বনস্থলী, নিভৃত গিরিগুহা ও মন্দিরগুলিতে বসলেই আত্মা স্বভাবত অন্তর্মুখী ও আবৃতচক্ষু হয়ে নিজের হৃদয়কন্দরের অন্ধকার গহনে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপ বুঝতে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, আপনাদেরও কি ধ্যানধারণা সাধনার প্রয়োজন হয়?

—আমরা তো অনেক নিম্নলোকের জীব! সত্যলোকের ঊর্ধ্বস্তরের দিব্য মহাজ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবেরাও ধ্যান ও সাধনা দ্বারা আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ সাধিত করেন। আমরা ধ্যান-ধারণা দ্বারা জন, তপঃ ও সত্যলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান চালাই। তাঁদের অদৃশ্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

—তাঁরা কি আপনাদের কাছেও অদৃশ্য?

—সম্পূর্ণ। বিনা ধ্যান-ধারণায় তাঁদের মত উচ্চজীবদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব নয়। আমাদের চোখে তাঁরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

—তাঁদেরও ঊর্ধ্বে লোক আছে?

—আছে, অনেক আছে। সত্যলোকেরই ঊর্ধ্বতন স্তরের জীবেরা ঐ লোকের নিম্নস্তরের জীবদের নিকট অদৃশ্য। তার ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক, তার ঊর্ধ্বে সর্বলোকাতীত পরব্রহ্মলোক বা গোলোক। তারও ঊর্ধ্বে নির্গুণ ব্রহ্মলোক—কিন্তু সেখানকার খবর কেউ দিতে পারে না—কেউ জানে না। এসব লোকের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—সাধারণজীবেরা এর খবর রাখে না বা তাদের কোনো আবশ্যকও নেই এসবে। তবে আমারও এইসব লোক সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—কারো থাকে না। ঊর্ধ্বলোকের কোনো কোনো দেবতা দয়া করে দেখা দিয়ে যেমন বলেচেন, তেমনি জানি।

—গ্রাম নগর বেঁধে বাস করেন কেন?

—আমরা বহুযুগ পূর্বের আত্মা। আমাদের সমসাময়িক আত্মা এ লোকে আর নেই। আমরা পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে উন্নতি লাভ করচি। নিজেদের মনের সাহায্যে এই জনপদ নির্মাণ করে একত্রে বাস করি, ভগবানের উপাসনা ধ্যানধারণা করি—সাধ্যমত পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে গিয়ে স্থূল জগতের জীবদের উপকার করবার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে যেমন গ্রাম জনপদ, সূক্ষ্ম জগতের এই সব জনপদ, বনবীথি, উদ্যানেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র সে সব। তাদের বিকার আছে, এদের বিকার নেই।

পুষ্প বল্লে—ভগবানকে স্বামী রূপে পেয়েচে সেই মেয়েটিকে একবার দেখাবেন না? ওঁর ভাগ্য অদ্ভুত তো!

দেবতা হেসে বল্লেন—ও সব হোল নারীর সাধনা। প্রেমভক্তির সাধনা—ভগবানের মায়িক রূপে দেখা পায়। তুমিও দেখা পেতে পারো কন্যা, যদি তোমার প্রেম জন্মে থাকে তাঁর প্রতি। ভগবান কল্পতরু-স্বরূপ যথার্থ পিপাসু ও আকুল ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না। তবে আমি ওগুলোকে পুতুলখেলা বলে বিবেচনা করি। নারীর ধর্ম,পুরুষের নয়। পুরুষ হবে জ্ঞানী, বীর, ত্যাগী।

পুষ্প বল্লে—কিন্তু মনে রাখবেন দেব, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমভক্তির সাধনা শিখিয়েচেন—

—জ্ঞানেরও, কর্মেরও। তাঁতে তিনেরই অপূর্ব সমন্বয়।

—শ্রীকৃষ্ণকে আপনি যাই বলুন, তিনি প্রেমের দেবতা। প্রেমময়, ভাবময়, সৌন্দর্যময়—এই তাঁর আসল রূপ।

—তুমি নারী, তোমার পক্ষে ওই ভাবই স্বাভাবিক বটে। তবে জেনে রেখো, জগতের বহু গ্রহে বহু জীবকুল বাস করে। ভগবান প্রত্যেক গ্রহে অসীম বিশ্বের সমস্ত জীবকুলের সম্মুখে তাদেরভাবানুযায়ী মায়িক রূপ নিয়ে দেখা দেন। তিনি অসীম, অনন্তরূপী, তাঁর কোনো শেষ নেই! কত লক্ষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কত লক্ষ রামচন্দ্র আছেন তোমাদের পৃথিবীর তাঁর মধ্যে—একথা মনে রেখো।

—তাতে কি। সসীম মানুষ তাঁর কোটি কোটি মায়িক রূপ ধারণা করতে পারবে না। একটিমাত্র সুন্দর রূপের ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করুক। তাহোলেই তাঁকে পাবে তো?

—নিশ্চয়। এ তোহোল সহজ পথ। ভক্তির পথ সহজ পথ, নারীর পথ। জ্ঞানের পথ বীরের পথ, পুরুষের পথ—সে কথা তোমাকে তো আগেই বলেছি। ভগবানকে পাবে—ও পথেও, এ পথেও।

পুষ্প বল্লে—সেই সহজ সুন্দর পথের সহজ সুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার মনের গোপন মন্দিরে বিরাজ করেন, তবে আমার জন্ম মরণ ধন্য হবে, দেব। জীবনেরএপারে বা ওপারে আর কিছুই চাইনে।

এই সময়ে একটি সুন্দরী নারী সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ অপূর্ব দিব্যভাবপরিপূর্ণ। অঙ্গকান্তি তরল জ্যোৎস্নার মত, বড় বড় চোখ দুটিতে অসীম সারল্য ও অন্তর্মুখিতা। মহাপুরুষ পুষ্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এই সেই কন্যা। এর নাম সুমেধা—ভারতবর্ষেরই কন্যা—

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেবি, ভগবানের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল—

নারী হেসে বল্লেন—আমি সব শুনেচি—তাঁর স্বরূপ কি শুনবে? আমি খুব ভাল করে দেখেচি। তিনি বালকস্বভাব, পথের বাঁকে বসে থাকেন উৎসুক হয়ে, ধরা দেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর পেছনে ছুটতে গেলে তিনি বালকের মত হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে যান—

যতীন অভিভূত ও মুগ্ধভাবে বলে উঠলো—বাঃ মা, বাঃ, কি সুন্দর অনুভূতির কথা!

পুষ্পও মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ভাবময়ী নারীর দিকে চেয়ে রইল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর? তারপর?

—তারপর কি জানো? সেই সময় যদি তুমি হতাশ হয়ে ছুট দেওয়া বন্ধ করো—তবে ভগবান নিরাশ হবেন, দাঁড়িয়ে যাবেন, বালকের মত। তিনি চান জীব তার পেছনে পেছনে খানিক ছোটে, হাঁপায়। ভগবান জীবের সঙ্গে বালকের মত খেলা করেই মহাখুশি। না থেমে তবুও ছুটলে ভগবান শেষে অকারণেই আবার ফিরে আসবেন, হাসতে হাসতে ধরা দেবেন। অতএব ভগবানকে নিরাশ কোরো না, তাঁকে একটু জীবকে নিয়ে খেলা করতে দাও—তিনি বড্ড একা—

দেবীর চোখ স্নেহে ও প্রেমে ছলছল করে উঠলো।

পুষ্প বল্লে—চমৎকার! আজ অতি সুন্দরভাবে বুঝলাম, সহজভাবে বুঝলাম। আপনার অনুভূতি সহজ বলেই সহজভাবে বুঝেচেন তাঁকে।

যতীনের মন পুষ্পের এ কথায় সায় দিলে।

ওদের সঙ্গী কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন উদাসীনের মত—যেন তিনি এসব ভাবালুতার বহু ঊর্ধ্বে, জ্ঞান ও তপস্যার দৃঢ়ভূমির উপর স্বপ্রতিষ্ঠ।

যতীন ও পুষ্প তাঁকেও প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করলে।

মেয়েটি ওদের হাসিমুখে বল্লে—আবার এসো তোমরা। আমি এখানে শীগগির উৎসব করবো—বনকুসুম-উৎসব। জনলোকের অনেক নারীপরুষ আসে, সবাই বনফুলের মালা দেন আমার বিগ্রহের গলায়। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাবো।

পুষ্প বল্লে—দেবি, কল্প-পর্বতের সঙ্গীত শুনতে যান না আপনি? আবার তো সেদিন আসচে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

—আমি প্রতিবারই যাই। আমাদের গ্রামের সকলেই যায়। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মায় ওই সঙ্গীত শুনলে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির দরজা খুলে যায় বলেঅনেক উচ্চস্তরের নরনারী আসেন সেদিন। যেও সেখানে—আমিও যাবো।

গ্রামের প্রান্তে বনবীথির অন্তরালে একটি শুভ্র স্ফটিকের মন্দিরে মেয়েটি ওদের দুজনকেই নিয়ে গেল। সেখানে পা দিয়েই পুষ্প বুঝতে পারলে এ অতি পবিত্র স্থান—দেবতার আবির্ভাব দ্বারা এর অণু-পরমাণু ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে, এখানে এসেই তার মনে হোল এখানে নির্জনে বসে ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান করি। রঘুনাথ দাসের আশ্রমের মত এর পুণ্যময় প্রভাব।

মেয়েটি হঠাৎ বল্লে—সমুদ্র দেখবে ভাই?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কোথায়?

—ওই দ্যাখো—

পুষ্প সত্যই দেখলে, সেই বনবীথির ওপারে বিশাল সুনীল মহাসাগর ঢেউ-এর ওপর ঢেউ তুলে বহুদূরে দিগন্তে মিশে গিয়েচে—কোনো কূল নেই, কিনারা নেই। তার অনন্ত জলরাশির ওপর নীল মহাব্যোমের প্রতিচ্ছায়া—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, সমুদ্রতীরে এক শিলাখণ্ডে বিশাল বৃক্ষতলে মেয়েটি ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে। পুষ্পের মনে হোল ওর সমস্ত সত্তা এই আনন্দ মহাসমুদ্রের কূলরেখা ধরে বহুদূর অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্চে, জগৎস্বপ্ন যেন লয় হয়ে যাচ্চে স্বসংবেদ্য আত্মানুভূতির শান্ত গভীরতায়। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। কি মধুর হাসি তার সুন্দর মুখের। বল্লে—কেমন ঠকিয়েচি ভাই?

পুষ্প বল্লে—সমুদ্র কোথা থেকে এল এখানে? আমিও তাই ভাবচি।

—সমুদ্রতীরে এই গাছতলায় বসলে তাঁর কথা বড় মনে হয়—তাই তৈরি করে রেখেচি।

—সব সময় থাকে?

—সব সময়। তবে অন্য কেউ আমার মনের ভূমিতে না পৌঁছুলে দেখতে পায় না। আমার কাছে সর্বদাই সত্যি—অন্যের কাছে অবাস্তব।

—এ গ্রামের অন্য লোকের কাছেও?

—আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। তুমি ভাই ভালবাসবে বলে তোমাকে আমার ভূমিতে নিয়ে এসে দেখালাম। বলো ভাল?

—আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানিনে দেবী। কত ভাল যে লাগচে এই বন, এই পাথরের বেদী, এই নীল সমুদ্র—এখানে ভগবানের আসাযাওয়ার পায়ের চিহ্ন আছে।

—আছেই তো। উনি যে আসেন লুকিয়ে আমার কাছে। জানো না ভাই?

মেয়েটির গলার সুরে পুষ্পের মমতা জাগলো। শ্রদ্ধাও। এই শিলাস্তৃত সমুদ্রবেলায় দেবতার শুভঙ্কর আবির্ভাবের কথা লেখা রয়েছে। পুতুলখেলা হয়তো। হোক পুতুলখেলা। সে নারী, এই তার ভাল লাগে।

সে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, একটা কথা বলুন। মেয়েরা কি খারাপ?পৃথিবীতে কেন একথা সাধু-মহাজন বলে এসেচেন?

—মেয়েরা সাধনপথের বিঘ্ন, তাই।

—কেন?

—বিভ্রান্ত করে দেয় পুরুষের মন। প্রকৃতির কাজ করবার জন্যে মায়ার সৃষ্টি করে। পুরুষেরা মজে অতি সহজেই। সখি, তোমার এই মুখখানি নিয়ে এই মহর্লোকেই একবার পরীক্ষা করে দ্যাখো না?

—সত্যি আমরা কি এতই হেয়?

—হেয় বা খারাপ এমনি হয়তো কিছু না, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। যে ভগবানকে পেতে চায়, যে জ্ঞানের সাধনা করতে চায়, ভক্তির সাধনা করতে চায়—সে নারী থেকে দূরে থাকবে এই বিধান। অন্য লোকে যত খুশি মিশুক—কে বারণ করচে? সাধনার পথের পথিক যারা নয় তাদের কি বাধা আছে নারীসঙ্গের? নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে, পুরুষে তা পারে না। নারী পাপের পথেও নিয়ে যায়, কল্যাণের পথেও নিয়ে যায়। কারণ, চিত্তনদী উভয়তোমুখী, বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়। খুব সাবধানেচললে সর্বনাশ আসে ওদের থেকে। সাপ খেলাতে সবাই জানে না। আনাড়ি সাপুড়ে সাপের হাতে মরে।

—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি চিরকালের?

—যেখানে প্রেম থাকে। নয়তো কিসের সম্বন্ধ? যেখানে প্রেম আছে প্রেমের দেবী মিলিয়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী না হোলেই বা কি। প্রেম নিয়ে বিষয়—কিন্তু এ ধরনের প্রেম সাধনালব্ধ বস্তু। দেহের বা রূপের মোহ এ প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। রূপজ প্রেম দিয়ে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেয় মাত্র।

—আপনি কি করে এসব জানলেন?

মেয়েটি হেসে বল্লে—কত যে ঠকেচি ভাই কত শত জন্ম ধরে। কত নেমে গিয়েছিলাম কত ভুগেছিলাম—জন্ম-জন্মান্তরের সে সব স্মৃতি ও সংস্কার আমাকে জ্ঞানী করেচে। একজন্মে দুজন্মে সাধু হওয়া যায় না ভাই—মহর্লোকেও আসা যায় না—

—আবার আপনি জন্মাবেন?

—পৃথিবীতে আমার শেষ জন্ম হয় বহুকাল আগে—পৃথিবীর সে হিসেব ভুলে গিয়েচি। আর সেখানে যাবো না। ভগবান আমায় দয়া করেচেন।

—যদি আপনার মত মেয়ের দরকার হয় পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার?

—সে অবস্থায় ভগবানের নির্দেশ পাবো। জীবের সেবা করবার ভার—সৌভাগ্যের কথা সে। তিনি যদি আমায় না ছাড়েন ভাই, নরকে যেতেই বা কি? উনি হাত ধরে নিয়ে গেলে নরক আর বলি কোথায়! কিসের স্বর্গ কিসের নরক? থাকুন তো উনি আমার সঙ্গে!

মেয়েটির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দর-দর ধারে।

পুষ্প অবাক হোল ওঁর অনুভূতির তীব্রতায়। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ভরে উঠলো তারমন।

মেয়েটি আবার বল্লে—ভগবান এই আলোর কমল বিশ্বজগৎ হয়ে ফুটে আছেন। তাঁর করুণার আলো। কাউকে তিনি ভোলেন না, অবহেলা করেন না ভাই—তাঁর মত প্রেমিক কে? যে ডাকে, যে তাঁর শরণ নেয়, তিনি তারই দোরে ছুটে যান, পাপী-পতিত মানেন না। কিন্তু ভাই, কেউ কি তাঁকে চায়?

সমুদ্রতীরের বিশাল বৃক্ষতলে নীল ঊর্মিমালার দিকে চেয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি সুন্দর ভঙ্গিতে হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বল্লে—ওই মহাসমুদ্রের মত অন্তহীন তাঁর করুণা! কেউ বুঝতে পারে না, বলে তাঁকে নিষ্ঠুর। তিনি দু'তিন জন্মের মঙ্গল করেন একজন্মের কর্মক্ষয় করে। পৃথিবীর লোকে সদ্য সদ্য ফল চায়। বোঝে না তিনি কি করতে চাইচেন। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় আসে তাঁর করুণা। কাজেই অবুঝের গালাগালি তাঁকে সহ্য করতে হয়।

পুষ্প বল্লে—আপনি দেবী, কি আনন্দ হোল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমার সঙ্গী মহর্লোকে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। আজ আমি যাই—

—আবার এসো ভাই, আসবে ঠিক? আমার পায়ে হাত দেওয়া কি ভাই? তুমিও তো কম নও। আমি তোমাকে চাই। এসো—আনন্দে থাকো ভাই।

মেয়েটির অব্যর্থ আশীর্বাদ। সত্যিই এক অপূর্ব আনন্দের প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে গেল পুষ্পের মনে। এ জগতে ভয় নেই, অমঙ্গল নেই—মেয়েটি বলেচে, ভগবানের আশীর্বাদ রয়েচে বিশ্বের ওপরে।

ফিরে এসে বুড়োশিবতলার ঘাটে বসে সেদিন সন্ধ্যায় পুষ্প যতীনকে ওই অদ্ভুত মেয়েটির গল্প শোনালে।

সেদিন ফিরে আসবার পর আরও কিছুকাল কাটলো। বুড়োশিবতলার ঘাটে যে সংসার পেতেছিল পুষ্প, তাতে যেন ভাঙন ধরেচে। আজ সাত বছর আগে প্রথম যেদিন যতীন এখানে আসে, সেদিনটি থেকে পুষ্পের

কত সাধ, কত আনন্দ, ছেলেবেলার সেই প্রিয় সাথীকে নিয়ে এখানে সংসার পাতবে। তাই অনেক আশা করে সাজিয়েছিলবুড়োশিবতলার ঘাটের সংসার।

ওপারের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে আরতি-ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প আগে নিজেদের ঘরে প্রদীপ দেখায়, গৃহদেবতার সামনে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে ফলফুলের অর্ঘ নিবেদন করে, মনে মনে দেবদেবীকে স্মরণ করে। রঘুনাথদাস ওকে একটি সুন্দর স্ফটিকবিগ্রহ এনে দিয়েচেন, তিনি বলেন একজন শিল্পী মননশক্তি দ্বারা ভুবর্লোকের পদার্থে ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটিয়ে এই সব দেবদেবীর মূর্তি তৈরি করেন—এই লোকেরই চতুর্থ স্তরে কোথায় তিনি থাকেন। পুষ্প বলেছিল একদিন সেখানে গিয়ে দেখে আসবে।

কিন্তু কি জানি পুষ্পের ভাগ্যে কোথায় যেন কি গোলমাল আছে। সব মিথ্যে হয়ে যায় কেন? হঠাৎ আশা বৌদিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেচে।

সেই মুহূর্তেই পুষ্প টের পেয়ে গেছে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যতীন তার কিছুই জানে না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে ওর কষ্ট হোল। আশা প্রারব্ধ কর্মের ফলেভুবর্লোকের কোন্ নিম্নস্তরে হয়তো ঘুরচে—যতীনদার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়, পুষ্প এ সত্য বুঝেচে।

সুতরাং মিছি মিছি কেন যতীনদাকে আশার মরণের কথা জানিয়ে কষ্ট দেওয়া। পৃথিবীতে থাকলেও তারা যেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি, এখানেও ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়াবে। এ-লোকেও নিম্নস্তরের অধিবাসী আশার কাছে সে ও যতীনদা যেমনি অদৃশ্য ছিল পৃথিবীতে থাকতে, তেমনিই থাকবে।

কিন্তু আশা কোথায় আছে একবার দেখা দরকার।

সেদিন সে রঘুনাথদাসের কাছে গেল, যতীনকে কিছু না জানিয়ে। দেখা পাবে কিনা সন্দেহ ছিল, কারণ এ সব মহাপুরুষ নিজের খেয়ালে থাকেন, আজ আশ্রম আছে, কাল নেই। সর্বপ্রকার মায়াবন্ধনের অতীত এঁরা। ভগবানের দেহে লয় না হয়ে ভক্তিসেবার জন্যে চিন্ময় আশ্রমে চিন্ময় বিগ্রহ স্থাপন করে সেবামৃত আস্বাদ করচেন মাত্র। আজ আছেন কাল হয়তো নাস্তি। দেখাই যাক্।

রঘুনাথদাস আচার্যকে তার বড় ভাল লাগে।প্রেমে স্নেহে বালকস্বভাব বৃদ্ধ সাধু ঠিক যেন তার বাবার মত। আজ তার মনে হোল এ বিপদে এঁরই আশ্রয় নিতে হবে। অতি উচ্চস্তরে সাধুর আশ্রম, সেখানে পৌঁছোনো তার পক্ষে সব সময় সহজ নয়—তবে ভগবানের কৃপা ভরসা।

আশ্রমটি একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সাধুর আবাসস্থানের মাহাত্ম্যে দূর থেকেই পুষ্পের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হোল—এ ভাব সে পূর্বেও এখানে আসবার সময় গাঢ় ভাবেই অনুভব করেচে। সেই অপূর্ব আনন্দরস...বার বার জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত, কোন্ লীলাময়ের অনন্ত লীলারাজ্যে সে নিত্য অভিসারিকা চিরযৌবনা প্রেমিকা...জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের পার্শ্বচারিণী।

সেই শ্বেত স্ফটিকের দুগ্ধধবল গোপাল-মন্দিরটি দূর থেকে দেখেই পুষ্প উদ্দেশে প্রণাম করলে। মন্দিরের চারিপাশের পুষ্পবাটিকাতে কত ধরনের ফুল ফুটে আছে, পূর্ব-পরিচিত এই সুন্দর লতাকুঞ্জটিতে রঘুনাথদাস বসে নামগান করচেন। এবার তিনি একা নন, দুটি বালক ও দুটি উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কুমারী সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে হাততালি দিয়ে গানে যোগ দিয়েচে। কেমন চমৎকার সুগন্ধ এখানকার! সেবারও এখানে আসতেই পুষ্প পেয়েছিল—অগুরু, চন্দন, সুগন্ধি, ধূপের ধোঁয়া, কত কি ফুলের সুবাস মিলে এই স্বর্গীয় সুগন্ধটার সৃষ্টি করেচে। আশ্চর্য, কোনো পার্থিব ধরনের বাসনা একেবারে থাকে না এই সুমধুর গন্ধময়, নিস্তব্ধ, চিরশান্তিময় পরিবেশের মধ্যে।

ওকে দেখে রঘুনাথদাস বল্লেন—এসো মা। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম,বোসো।

পুষ্প ওঁকে প্রণাম করতেই আচার্য বল্লেন—অপুনর্ভব হও।

বিস্ময়ে পুষ্প শিউরে উঠে বল্লে—কি বল্লেন আচার্যদেব! ওকি কথা?...জানেন—

তিনি হেসে বল্লেন—ঠিক বলেচি মা।

—আপনি তো জানেন, আমার বাসনা কামনা কিছুই এখনো যায়নি, পৃথিবীতে আমার যাতায়াত বন্ধ হোলে কি করে চলবে? বলুন আপনি। জন্ম এখন থেকেই বন্ধ হবে?

রঘুনাথদাস পুষ্পের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে অনেকটা যেন আপনমনে সুর করে বল্লেন—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখি, অথবা কীটপতঙ্গে।

করমবিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহুঁ তুয়াপরসঙ্গে।

এমন দিব্য মধুর সুরের সে গান, বিদ্যাপতির বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠলো সুগায়ক রঘুনাথদাসের কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে।

তারপর পুষ্পকে বল্লেন—যাও, গোপালকে দেখা দিয়ে এসো। বড় অভিমানী—সামলে রাখতে হয়।

পুষ্প হেসে বল্লে—ওসব আপনার সঙ্গে, কই আমাদের সঙ্গে তো কোনোদিন একটা কথাও—

—হবে। দেখতে পাচ্চি মা, দেখতে পাচ্চি। গোপালের চিহ্নিতা সেবিকা তুমি। সাধে কি বলেচি অপুনর্ভব হও? আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হয়নি।

—আপনি বুড়ো দাদু হয়ে বসে আছেন, দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্চেন কেন? ও রকম বল্লে মেয়ের অপরাধ হয় না?

বৃদ্ধ প্রসন্নমুখে বল্লেন—ঠিক মা ঠিক। যাও দেখে এসো—

একটু পরে পুষ্প আবার এসে তাঁর কাছে বসলো। এখানে সে কিজন্যে এসেছিল তা যেন ভুলে গিয়েচে। এ পবিত্র আশ্রমে বসে কি করে ঐ সব কথা বলবে! হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে পারতো না, কিন্তু রঘুনাথদাসই বল্লেন—তোমাকে অন্যমনস্ক বলে মনে হচ্চে কেন?

—আপনি অন্তর্যামী, সব জানেন। লজ্জা করে আপনাকে মুখে বলতে—

রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর গম্ভীরভাবে বল্লেন—কি চাও মা?

—সেই হতভাগীর সঙ্গে দেখা করতে বড় ইচ্ছে হয়। কি ভাবে আছে,—যদি কোনো উপকার করতে পারি।

—সেই মেয়েটি প্রেতলোকে রয়েচে। তার চোখ খোলেনি, মনও অপরিণত। তার ওপর আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের ফলে প্রকৃতি একটা প্রতিশোধ নেবে।

—একবার দেখা হয় না?

—সে কোথায় আছে জানি না। ভুবর্লোকের নিম্নস্তর, যাকে সাধারণত নরক বলে থাকে পৃথিবীর ভাষায়—সে অনেক বড় জায়গা। তারও আবার অনেক স্তর আছে— চলো দেখি—

—প্রভু, আমার সঙ্গে তার একভাবে খানিকটা যোগ আছে, সুতরাং আমি গেলে তাকে বার করা সহজ হবে।

—ওসব না। সে মেয়েটি পৃথিবীর যে গ্রাম থেকে এসেচে—তারই নিকটবর্তী কোনো নিম্নলোকে ভ্রাম্যমাণা। স্থূল ধরনের বাসনা কামনা নিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে ওঠা অসম্ভব।

একটু পরে পুষ্প রঘুনাথদাসকে নিয়ে প্রথমে এল কুড়ুলে-বিনোদপুর, সেখানে কোন সন্ধান না পেয়ে গেল আশার বাপের গ্রাম রসুলপুরে। কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর ধূসরবর্ণের আত্মা গ্রামের বাঁশবন, তেঁতুলগাছের ডালে, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছে পা ঝুলিয়ে বসে হাওয়া খাচ্চে। একটি দুষ্ট আত্মা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার পুকুরপাড়ের এক নোনা গাছে বসে স্নানরতা স্ত্রীলোকদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। প্রায় তুরীয় অবস্থায়। পুষ্প মনে মনে হেসে বল্লে—দ্যাখো পোড়ারমুখোর কাণ্ড! ইচ্ছে হয় গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে আসি—হাঁ করে যেন কি গিলচে—হি—হি—

অবিশ্যি এই সব নিম্নস্তরের আত্মার কাছে তারা অদৃশ্যই রইলো।

রঘুনাথদাস বল্লেন—চলো, এখানকার কাছাকাছি নিম্নলোকে—এখানেই আছে।

অল্প পরেই ওরা এক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের ন্যায় ঊষর স্থানে এসে পড়্লো। তার চতুর্দিকের চক্রবাল-রেখা ধূমবাষ্পে সমাচ্ছন্ন—যেন মনে হয় কাঁচা বনে লতাপাতা পুড়িয়ে অজস্র ধূম সৃষ্টি করে দাবানল জ্বলচে। অথচ অগ্নিশিখা দৃশ্যমান নয়—শুধুই মরুময় ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরস্তূপ। ওরা সেই জনহীন মরুদেশের ওপর দিয়ে শূন্যপথে ধীরগতিতে যেতে যেতে দেখলে সে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জনহীন, জলহীন, বৃক্ষ-লতাহীন। সেখানকার আকাশ নীল নয়, ঘোলাটে ঘোলাটে শুভ্র লঘু বাষ্পে ঢাকা। পুষ্পের মনে হোল ভাদ্র মাসের গুমটের দিনে পৃথিবীর আকাশে যেমন সাদামেঘ জমে থাকে—অনেকটা তেমনি।

পুষ্প বল্লে—এই জায়গাটা যেন কেমন বিশ্রী—

রঘুনাথদাস বল্লেন—এই সব ভুবর্লোকের নীচু স্তর, পৃথিবীতে যাকে নরক বলে। এ অনেকদূর ব্যেপে রয়েচে—হাজার হাজার ক্রোশ চলে যাও, পৃথিবীর ঠিক ওপরে পৃথিবীর চারিপাশ ঘিরে এ রাজ্য বর্তমান! অথচ পৃথিবীর লোকের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখানকার বাসিন্দারা আবার ভুবর্লোকের কোনো উচ্চ স্তর দেখতে পায় না।

—হাজার হাজার ক্রোশ! এমন জনহীন!

—তারও বেশি। যতদূর চলে যাও, এ অদ্ভুত লোকের আদি অন্ত পাবে না। বহু হাজার ক্রোশ চলে যাও, এমনি। এ কোনো বাইরের অবস্থা নয়। এখানকার বাসিন্দাদের মানসিক-অবস্থা-প্রসূত। এরাও অনেক সময় যতদূর যায়—এ জনহীন মরু-পাথরেরদেশের আদি-অন্ত পায় না খুঁজে, অন্য কোন প্রাণীকেও দেখতে পায় না। চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, তারা নেই—এক রকম চাপা আলো—কখনো কালো হয়ে আসে, ঘোর কালো, পৃথিবীর অমাবস্যার মত। উপনিষদে এ লোকের কথা বলে গিয়েচে—অসূর্যা নামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা—এই সে ভীষণ অন্ধ-তমিস্রা লোক—একশো বছর পর্যন্ত হয়তো টিকে যায় সেই অন্ধকার কোন কোন পাপী আত্মার কাছে। সে হতভাগ্য আশ্রয় ও আলো খুঁজে, সঙ্গী খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ে।

পুষ্প শিউরে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে বল্লে—একশো বছর ধরে অমাবস্যা!

রঘুনাথদাস হেসে বল্লেন—কন্যা, জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশী শ্রীকৃষ্ণমুরারির শরণ নাও—যেন এখানে কোনদিন আসতে না হয়। এ হোল হিরণ্যগর্ভদেবের রাজ্য, তিনি এখানে শাসক ও পালক।

—তিনি কে?

—ব্রহ্মের তিন রূপ—স্থূলরূপে বিরাট, সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ, কারণ-স্বরূপ ঈশ্বর।

—প্রভু, পৃথিবীর গ্রহদেব বৈশ্রবণ কে?

—তিনি পূর্বকল্পের মহাপুরুষ। পৃথিবীর প্রজাপতি।

—তবে আপনার গোপাল কে?

রঘুনাথদাস প্রসন্ন হাস্যে বল্লেন—গোপাল সব। আমি ওকেই জানি। ওই ব্রহ্ম, ওই আত্মা, ওই ভগবান। আমি আর কারো খবর রাখিনে। ব্রহ্মের সাকার রূপ, জ্ঞানচক্ষে দেখলে মায়িক রূপ বটে। কিন্তু আমার চোখে গোপাল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করে রেখেচে। আমার আর কোনো তত্ত্বে দরকার কি। ভক্তির চোখে ভাবের চোখে দেখতে শেখো ভগবানকে। তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যাও। তাঁকে বন্ধু ভাবো, পুত্র ভাবো, পতি ভাবো—এমন কি দাস ভাবো।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—দাস ভাববো? কি বলেন ঠাকুর!

রঘুনাথ চিৎকার করে বল্লেন—কেন ভাববে না? দাবি করে ভাবো। প্রেমের সঙ্গে দাবি করে ভাবো। তিনি ভক্তের দাসত্ব করেচেন—করেন নি? তিনি যে প্রেমের কাঙাল—তাঁকে যেভাবেই ডাকো, ডাকলেই সাড়া দেবেন। তবে প্রেমের সঙ্গে ডাকা চাই। ভয় করে ডেকো না। ভয় করবার কিছু নেই তাঁকে।

পুষ্প মেয়েমানুষ, এ সব কথায় ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়লো। যুক্তকরে নমস্কার করে বল্লে—আপনার আশীর্বাদ, ঠাকুর। নরকে এ কথা বল্লেন, নরক যে পুণ্যস্থান হয়ে উঠলো!

এমন সময় পুষ্প দেখতে পেলে আশাকে। একটা কালো পাথরের অনুর্বর টিলার ওপর সে মলিনমুখে চুপ করে বসে আছে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—তুমি যাও মা। আমি এখানে থাকি।

—কিন্তু আমাকে যে ও দেখতে পাবে না?

—পাবে, যাও। কিন্তু একটা কথা মা—

—কি?

—ওই কন্যাটির এখন জ্ঞান হয়নি।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—সে কি প্রভু! ও তো দিব্যি জেগেই বসে আছে।

—ও মেয়েটি ধূম্রযান দক্ষিণমার্গের পথিক। ওর গতির পথ বেঁকে আছে ধনুকের মত পৃথিবীর দিকে। তুমি দেখতে পাচ্চ না মা! ও অল্পদিন হোল পৃথিবী থেকে এসেচে—তার ওপর স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয়নি। আত্মহত্যা করেচে। ওর মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাই হয়নি। যাও, কাছে গিয়ে বুঝতে পারবে।

পুষ্প কাছে যেতেই আশা বল্লে—তুমি আবার কে গো? হ্যাঁগো, এটা কি আলিপুরের বাগান?

পুষ্প সস্নেহে বল্লে—কেন বৌদি? এটা কি বলে মনে হচ্চে?

—বাড়িওয়ালী মাসি বলেছিল আলিপুরের বাগান দেখাতে নিয়ে যাবে। সেখানে একটি কি বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। আমি বলি, ছি ছি কি ঘেন্না, বলি—নেত্যদার সঙ্গে চলে এসেছিলাম সে আলাদা কথা। অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছিলাম, কে খেতে পরতে দেয় সংসারে...না হাঁ, সত্যি কথা বোলবো। মা বুড়ো হয়েচেন, তার ঘাড়ে আমার আর একটি বিধবা দিদি...আচ্ছা, মাহেশের রথতলা এখান থেকে কতদূর? তুমি কে?

পুষ্প ওর পাশে গিয়ে বসলো। ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি তোমাকে চিনি। তুমি আমার বৌদিদি হও।

—তা এখানে কি মানুষ নেই? এটা কোন্ জায়গা? খিদে-তেষ্টা পেয়েচে কিন্তু একখানা খাবারের দোকান নেই। মাহেশের রথতলাতে আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি থাকে। সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যেতে লজ্জাও করে—

—তুমি এখানে এলে কার সঙ্গে?

—এলাম কার সঙ্গে তা মনেই পড়ে না। একদিন বাড়িওয়ালী মাসি বল্লে—তোমায় আলিপুরের বাগানে নিয়ে যাবো—সেখানে একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চায়। ঘরে সেদিন কিছু খাবার নেই। বাড়িভাড়া কুড়ি টাকার জন্যে তাগাদা করে করে বাড়িওয়ালী তো আমার মাথা ধরিয়ে দিতে লাগলো। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুলাম, তারপর যে কি হোল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

—বাড়িওয়ালী তোমায় আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—কি জানি ভাই, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এখানে আজ ক'দিন আছি তাও মনে নেই। খিদে-তেষ্টা পেয়েচে—অথচ খাবার পাইনে। না আছে একটা লোক, না আছে একটা দোকান-পসার। আচ্ছা, এর বাজারটা কোন্ দিকে?

পুষ্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—আশা বৌদি, যতীনদাকে মনে পড়ে?

আশা কেমন যেন চমকে উঠে, ওর দিকে অল্পক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—তুমি তাঁকে কি করে জানলে?

—জানি আমি। দেশের লোক যে গো! এক গাঁয়ে বাড়ি।

আশার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে মুছে বল্লে—তিনি স্বগ্‌গে চলে গিয়েচেন, তাঁর কথা আর আমার মুখে বলে কি লাভ?

—সে কথা বলচিনে বৌদি, সত্যি কথা বলো তো আমার কাছে, তাঁর কথা তোমার মনে হয় কি না?

আশা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—হয়। যখন হয় তখন বুকের মধ্যে কেমন করে উঠে—

—কেন বৌদি?

—আমি হতভাগী তাকে একদিনও সুখ দিইনি। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুঝতাম না—কেবলই বাপের বাড়ি এসে থাকতাম শ্বশুরবাড়ি থেকে—

—কেন?

—শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট পেতাম। ছেলেমানুষ তখন—

—তোমার একথা সত্যি নয় বৌদি। আমার কাছে সব খুলে বলো না ভাই?

আশা চুপ করে নখ খুঁটতে লাগলো। এ কথার কোনো জবাব দিলে না। পুষ্প বল্লে—বলবে না ভাই?

আশা বল্লে—কি হবে শুনে সে সব কথা। আমার বুদ্ধির দোষেই যা কিছু সব হয়েচে। আমি আমাদের গ্রামের মজুমদার-পাড়ার একটা ছেলেকে ভালবাসতাম।

—বিয়ের আগে থেকে, না বিয়ের পরে?

—বিয়ের আগে নয়, কিছুদিন পরে।

—বিয়ের পরে অন্য কারো সঙ্গে ভাব করতে গেলে কেন? এটা খুব অন্যায় হয়েচে তোমার বৌদিদি। হিন্দুর মেয়ে, দ্বিচারিণীর ধর্ম্ম কে শেখালে তোমায়?

আশা চুপ করে রইল। পুষ্পের কড়া সুরে বোধহয় একটু ভয় খেয়েই গেল।

—কথার উত্তর দিলে না যে?

—আমার অদেষ্ট ভাই। ও কথার কি উত্তর দেবো?

—কিন্তু আমি তোমায় বলচি তুমি এখনো সেই লোকটাকেই ভালবাসো। যতীনদার ওপর তোমার কোনো টান নেই। আমি সব বুঝতে পারি ভাই। আচ্ছা, তোমার ঘেন্না হয় না? যার জন্যে এত কষ্ট, যে তোমাকে ফেলে চলে গেল, যার জন্যে তোমাকে আফিং খেয়ে মরতে হোল, আবার সেই ইতর লোকটার জন্যে এখনো ভাবনা? যতীনদা দেবতার মত স্বামী তোমার, তাকে একদিন দেখলে না মরবার সময়ে, তার কুলে কালি দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলে—

আশার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বল্লে—আফিং খাওয়ার কথা তো কেউ জানে না —তুমি কি করে জানলে? আমি তো—

—আফিং খেয়ে তুমি মারা গিয়েচ বৌদি। তুমি বেঁচে নেই—মরে প্রেতলোকে এসে কষ্ট পাচ্চ—

আশা এবার যেন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এটা তাহলে ঠাট্টা! তবুও আফিং খাওয়ার কথা এ কি ভাবে জানলে! পরক্ষণেই একথা ওর মন হোল—কে এ মেয়েটা, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেচে? এত হাঁড়ির

খবরে ওর কি-ই বা দরকার? ওর গলা ধরে কে কাঁদতে গিয়েচে তা তো জানি নে। সে যা খুশি করেচে, তার জন্যে ওর কাছে এত কৈফিয়ৎ দেবার বা কি গরজ। শ্বশুরবাড়ির লোক বোধ হয়, ওই গাঁয়েরই মেয়ে—তাই এত গায়ে ঝাল।

মৃদু হেসে বল্লে—তা যাই বলো ভাই—মরে ভূত হওয়াই বই কি এক রকম—

পুষ্প দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—তা নয়। আমি ঠাট্টা করিনি। মারা তুমি গিয়েচ। আফিং খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে ছিলে কলকাতার বাসায়, মনে নেই? তারপর তুমি মরে যাও, মরে এই প্রেতলোকে এসেচ।

আশার মুখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ও বল্লে—এখনো বিশ্বাস হোল না বৌদি? আচ্ছা, তোমার বিশ্বাস করাবো। চলো— তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ি যাবে?

আশা কিছু না ভেবেই ঝোঁকের মুখে বল্লে—সেখানে আর কি মুখ নিয়ে যাবো—

—গেলেও কেউ টের পাবে না। সত্যি-মিথ্যে চলো চট্ করে পরীক্ষা করে নিয়ে আসি। তোমার প্রেতদেহ হয়েচে। এ দেহ পৃথিবীর মানুষের চোখে অদৃশ্য।

পুষ্পের কথার ভাবে ও সুরে আশা কি বুঝলে যেন, ওর হঠাৎ ভয়ানক আতঙ্ক হোল। কি সব কথা বলে এ! যদি সত্যিই তাই হয়?সে যদি সত্যিই মরেই গিয়ে থাকে?

ঠিক সেই সময় একটি নিম্নশ্রেণীর প্রেত দুটি অল্পবয়সী মেয়েকে একাকী দেখে পূর্বসংস্কারবশত ওদের দিকে ছুটে এল। মুখে দু-একটি অশ্লীল কথাও উচ্চারণ করলে, ঘোর কামাসক্তিতে তার চোখ ও মুখের অবস্থা উন্মত্ত পশুর মত।

ওর বিকট হাবভাব দেখে আশা ভয়ে পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বল্লে—ওই দ্যাখো ভাই কে একটা আসচে—মাগো—

পুষ্পও ভয় পেয়েছিল, সেও প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো, লোকটা ওদের কাছে এসে পড়ে পুষ্পের দিকে চেয়েই জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুট্ দিলে সোজা।

হঠাৎ আশা ভয়ে ও বিস্ময়ে পুষ্পের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েবল্লে—ওকি! তোমার কপাল দিয়ে আগুন বেরুচ্চে যে!...এ কি! ওমা—কি সর্বনাশ।

পুষ্প অবাক হয়ে নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেল। সে আবার কি! পরক্ষণেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দরদর করে। সে হাত দিয়ে মুছে বল্লে— ভাই বৌদি—

আশার ভয় ও বিস্ময় তখনো যায়নি। সে দূর থেকেই আপন মনে বললে—বাবাঃ কি এ! আর দেখা যাচ্চে না। কি আগুন!...

তারপর সে ছুটে এসে পুষ্পের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বল্লে—কে আপনি? আমায় বলুন কে আপনি? আপনি তো সহজ কেউ নয়। স্বগ্‌গো থেকে দেবি এসেচেন আমায় দয়া করতে?

আশার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে একটা বড় সত্য কথা বেরুলো।...

যতীন সব শুনলে। আশার এই পরিণতি! সেই আশা। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়ে ওদের কাঁটালগাছের দিকের ঘরের সেই ফুলশয্যায় বৃষ্টিধারামুখর রাত্রিটি, সেই সব দিনের কথা আজও যেন মনে হয় কাল ঘটে গেল। কেন এমন অসারতা সংসারে, কেন এমন মিথ্যার উৎপাত! যা ভাল বলে মনে হয়, জীবন যাতে পরিপূর্ণ হোল মনে হয়— তা কেন দুদিনও টেকে না? অমৃত বলে যা মনে হয়, তা থেকে বিষ ওঠে কেন?...

এই ঘোর বিষাদের দুর্দিনে যতীন সবদিক থেকে সব আলো একেবারে হারিয়ে ফেললে। কালো কালিতে সব লেপে একাকার হয়ে গেল। কেবল পুষ্প তাকে কত করে বুঝিয়ে রাখতো।

যতীন বল্লে—জীবনে আর কি রইল আমার? ওর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও—

—তোমাকে ও দেখতে পাবে না।

—তবে তোকে দেখতে পেলে যে?

—সে রঘুনাথদাস ঠাকুরের মহিমায়। তুমি কষ্ট পাবে। বৌদির সে কষ্ট তুমি কি করে দেখবে?

তখনকার মত যতীন বুঝে গেল। পুষ্পও কিছু নিশ্চিন্ত হোল। একটা অন্য ঘটনাতেও যতীনের মন একটু অন্যদিকে চলে গেল। ওদের গ্রাম কুড়ুলে-বিনোদপুরের রায় সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর বড় ছেলে রামলাল কুণ্ডুকে একদিন খুব বিষণ্ণ অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখলে। একটা গাছের তলায় সে বসে আছে গালে হাত দিয়ে, যতীন দেখে ওকে চিনতে পেরে তখনই ওকে দেখা দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে—নয়তো ওর দেহ রামলালের নিকট অদৃশ্যই থাকবে।

রামলাল ওকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—যতীন না?

—হ্যাঁ। তুমি কবে এলে?

—আসা-আসি বুঝিনে, এ জিনিসটা কি বল তো? বাড়ি যাই, সবাইকে দেখি— বাবা, মা, বৌ—কেউ কথা বলে না। আমি মরে গিয়েচি বলে আমার নাম নিয়ে সবাই কাঁদচে!

—ঐ তো তুমি মরে এখানে এসেচ। এ জিনিসটাই মৃত্যু।

—আমারও সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলে? কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।

—কেন, তোমাকে কেউ নিয়ে আসেনি?

—আমার ঠাকুরদাদা এসেছিল, এখনো মাঝে মাঝে আসে। বড় বক্ বক্ করে, আমার পছন্দ হয় না।

রামলাল যতীনের বয়সী, বড়লোকের ছেলে। সুরা ও নারীর পেছনে গত দশ বছরে লাখখানেক টাকা উড়িয়ে দিয়েচে। অত বড় ব্যবসা ওদের, কখনো কিছু দেখতো না, বৃদ্ধ বাপ দোকান আগলে বসে থাকতো, রামলাল দোকান বা আড়তের ধারেও যেতো না। যতীন এসব জানে।

তারপর রামলাল হি-হি করে হেসে বল্লে—ঠাকুরদাদা কি করে জানো? রোজ দোকানে গিয়ে বাবার পাশে বসে থাকে, বেচাকেনা দেখে। বাবা হাত-বাক্সের সামনে যেখানে বসে না? ঠিক ওর পাশে রোজ ঠাকুরদা গিয়ে দুঘণ্টা তিনঘণ্টা করে বসে। মানে, ঠাকুরদাদার নিজের হাতে গড়া আড়তটা, ওর মায়া বড় বেশি।

—বলো কি! উনি তো মারা গিয়েচেন আজ কুড়ি বাইশ বছর। তখন আমি কলেজে পড়ি, বেশ মনে আছে। এখনো রোজ তোমাদের আড়তে গিয়ে বসেন?

রামলাল আবার হি-হি করে হাসতে লাগলো। বল্লে—আচ্ছা ভাই, সেকথা যাক্‌গে। এখানে কেমন করে মানুষ থাকে বলতে পারো? আজ কতদিন এসেচি ঠিক মনে নেই, তবে মাস দুই-এর বেশি হবে না। একটা মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পাইনি এর মধ্যে! এক ফোঁটা মাল পেটে যায়নি—ফুর্তি করবার কিছু নেই। ছ্যাঃ, নিরিমিষ জায়গা বাপু, যা বলো। মানুষ এখানে ট্যাঁকে?

পরে চোখ টিপে বল্লে—বলি, সন্ধানে-টন্ধানে আছে?

যতীন ওর পাশে বসলো। মনে মনে ভাবলে—A wasted life! আমার নষ্ট হচ্চে যেজন্যে, তা আমার নিজের দোষ নয়, কিন্তু এ নিজে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেচে নিজের হাতে।

রামলাল বল্লে—আছ কোথায়?

—এখানেই।

—মাঝে মাঝে এসো। বড় একা পড়ে গিয়েচি। আচ্ছা, হরিমতিকে দেখতে পাও? বুঝতে পেরেচ?—গাঙু গোসাঁই-এর মেয়ে হরিমতি। তাকে এসে পর্যন্ত খুঁজচি—এক সময় তার সঙ্গে ছিল কিনা!

যতীন একটু অবাক হয়ে গেল। গাঙ গোসাঁই-এর যে মেয়ের কথা এ বলচে, তাকে নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী হিসেবে সে জানতো। তবে সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল বটে। আশালতা যেবার বাপের বাড়ি চলে গেল, সেই বছর সে কি জানি কেন গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। হরিমতির চরিত্র ভাল ছিল বলেই তার ধারণা আছে এ পর্যন্ত।

যতীন বল্লে—না, ওসব দেখিনি। তুমি এখন ওসব ছাড়। মরে চলে এসেচ পৃথিবী ছেড়ে। মদ মেয়েমানুষ এখানে কি কাজে লাগবে তোমার? হরিমতিকে তা হলে তুমিই নষ্ট করেছিলে, তোমার জন্যে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়?

—না ভাই। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি। সে ভাল চরিত্রের মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল না। অঘোর কুণ্ডুর সঙ্গে তার গোলমাল হয় তা আমি জানি। জানাজানি পাছে হয় তাতেই সে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। আমায় অত খারাপ ভেবো না। ফুর্তি-টুর্তি করতাম বটে, তা বলে—

—বেশ, তবে ও পথ একেবারে ছেড়ে দাও, নইলে যেমন কষ্ট পাচ্চ এমনি কষ্ট পাবে।

—যতীন সেইদিন থেকে প্রায়ই রামলালের স্তরে গিয়ে তাকে বোঝাতো। রামলাল বাড়িঘর পায়নি, গাছতলাই তার আশ্রয়স্থান। যতীন তাকে উপরের স্বর্গের কথা বলতো, ভগবানের কথা বলতো—কিন্তু রামলাল নিম্নস্তরের আত্মা, অতি স্থূল আসক্তিতে ওর মন বাঁধা। সে-সব ও কিছুই বোঝে না, ভালও লাগে না।

একদিন রামলালের ঠাকুরদাদা ৺কেবলরাম কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা! কেবলরাম ঘুঘু ব্যবসাদার, সামান্য অবস্থা থেকে বিখ্যাত ধনী ও আড়তদার হয়েছিল। ওকে দেখে বল্লে—আরে, তুমি ভবতারণের ছেলে! খুব মনে আছে তোমায়। আহা-হা, অল্প বয়সে তোমরা সব চলে এলে, বড় দুঃখের কথা। আমার নাতির দেখো না, ভরসারাম মরে গেলে অত বড় ব্যবসাটা গেল। কে দেখবে? এই তো সন্দে পর্যন্ত আড়তে বসে ছিলাম। রোজ গিয়ে দেখি। বড্ড মায়া ঐ আড়তটার ওপর। ভরসারাম বাঁধা আসরে গাইলে। কষ্ট কাকে বলে তা তো জানলে না। একলক্ষ আশি হাজার টাকা ক্যাশ রেখে আসি ব্যাঙ্কে, উইলে দুভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে—

যতীন বল্লে—কুণ্ডুমশাই, এখন ওসব ছেড়ে দিন। আপনি আজ কুড়ি বছর এসেছেন, আজও দোকান আড়ত নিয়ে আছেন কেন? আপনি না গলায় তুলসীর মালা দিতেন? হরিনাম করতেন?

—সে এখনো করি। তা বলে—

—আচার্য রঘুনাথদাসের নাম জানেন?

কুণ্ড মশাই দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—কে তাঁর নাম না জানে? আমরা তাঁর দাসানুদাস—

—আপনি যদি আড়ত দোকানে যাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ে যাবো। তাঁর কাছে।

কেবলরাম কথাটা বিশ্বাস করলে না। ভাবলে এ একটা কথার কথা বুঝি। উচ্চ স্বর্গের অনেক কথা যতীন সুতরাং ওকে বোঝাতে বসলে। পুষ্পের সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দিলে। কেবলরাম হাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তুমি কে মা?

পুষ্প হেসে বল্লে—তোমার নাতনী, দাদু—

কেবলরাম কেঁদে ফেললে। বল্লে—আমি পাপী, নরাধম। আমার সে ভাগ্যি কি আছে মা?

—মা নয়, আমায় দিদি বলে ডাকো দাদু—পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে।

কেবলরাম সেদিন থেকে পুষ্পের ক্রীতদাস হয়ে গেল। পুষ্প ম্যাজিক জানে নাকি? যতীন এক এক সময় ভাবে। পুষ্প কেবলরামকে ভরসা দিলে, এক দিন উচ্চস্বর্গের বৈষ্ণব ভক্তদের লোকে ওকে নিয়ে যাবে।

কেবলরাম মানুষটা সরল। বলে—দিদি, তুমিই তো দেবী, তুমি কম নও।ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার ওপর আগুনের মত আভা তোমার রূপের। আমি আর কোথাও যেতে চাইনে—তুমি দাদু বলে ডাকলে এই আমার স্বর্গ হয়ে গেল! আমরা কীটস্য কীট।

আত্মা ওঠে ভালবাসায়! ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে। পুষ্প পিতামহের সমান বৃদ্ধ কেবলরামকে পৌত্রীর মত ভালবেসে ওকে তোলবার চেষ্টা করচে—যতীন বুঝতে পারলে। যতীনের শত লেক্‌চারেও এ কাজ হোত না। যতীন ভাবে—নাঃ, এসব কাজ পুষ্প পারে। পতিত-উদ্ধার কাজ আমার নয়। আমার নিজের কুকুর পথ্যি করে কোথায় তার ঠিক নেই।

কিন্তু রামলালের সাহায্য পুষ্পকে দিয়ে হবে না। পুষ্প অতি সুন্দরী নারী। রামলালের আসক্তি এখনো নিম্নমুখী, মোহে পড়ে যাবে, রামলালের মন গড়ে উঠতেঅনেক দেরি। অন্যভাবে ওকে সাহায্য করতে লাগলো যতীন।

রামলালের দেখা পেয়ে যতীনের খানিকটা ভাল লাগে। হাজার হোক, দেশের লোক, সমবয়সীও বটে। দুটো পৃথিবীর কথাবার্তা বলা যায়। দেবদেবীদের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে। শুধু বড় বড় কথা আর কাঁহাতক শোনা যায়—পুষ্পের মুখেই, বা অন্য যেখানে মাঝে দু-দশবার গিয়েচে, সেখানেই কি? পুষ্প বোঝে সব, বুঝে দুঃখিত হয়। রামলালের সঙ্গে অত মেলামেশা সে পছন্দ করে না।

যতীন রামলালের কাছে এসে বলে—রামলাল-দা, কি তোমার ইচ্ছে করে?

—একটা ইচ্ছে আছে, অন্য কিছু হোক না হোক, একটা সিগারেট যদি খেতে পারতাম, একেবারে কিছু নেই—ছ্যাঃ, এখানে মানুষ থাকে কি করে?

—তোমার স্ত্রীকে তো রেখে এসেচ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না?

রামলাল ইতস্তত করে বল্লে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ—সে তো প্রায়ই দেখচি।

—যাও সেখানে?

—হ্যাঁ, তা—যাই। যাবে—চলো না গাঁয়ে একবার।

যতীন গেল কুড়ুলে-বিনোদপুরে। পুষ্পের বারণ আছে এসব জায়গায় আসবার। এলেই পার্থিব আসক্তি ও তৃষ্ণা আত্মাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে। রামলাল ওর নিজের বাড়ির দিকে চলে গেল, যতীন নিজের বাড়ি এল; ওর ছেলেমেয়ে আছে শ্বশুরবাড়িতে, কিন্তু তাদের ওপর এতদিন যতীনের কোনো বিশেষ মায়া ছিল না, এখানে এসে তাদের জন্যে মন কেমন করে উঠলো। ওদের বাড়িটা একদম ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে এই সাত আট বছরে। ঐখানে ঐ ঘরে সে আর আশা থাকতো, আশার হাতের চুনের দাগ এখনো ইট-বের-করা দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায়। ওখানে বসে আশা পান সাজতো, ষোল বছর আগের চুনের দাগ, কি তারও আগের হবে।

বিয়ের পর প্রথমে আশা খুব পান খেতো এবং ওখানটিতে বসে রোজ সকালে এক বাটা পান সাজতো সমস্ত দিনের মত। গুজব উঠলো এই সময়, পানে একরকম পোকা হয়েচে, অনেক লোক মারা যাচ্চে পোকা-ধরা পান খেয়ে, যতীন আর বাজার থেকে পান আনতো না পাঁচ ছ'মাস। আশা বলতো—তুমি না খাও, আমার জন্যে এনো, না হয় মরে যাবো পান খেয়ে, তোমার আবার বিয়ে বাকি থাকবে না। পান না খেয়ে থাকতে পারিনে—লক্ষ্মীটি—

কাল যেন ঘটে গিয়েচে সে সব দিন। আশা, আশালতা। স্বপ্ন...বহুদূর অতীতের স্বপ্ন আশালতা।

সন্ধ্যা হয়েচে। বোষ্টম বৌ ছাগল নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে তাড়িয়ে—আহা, বুড়ো হয়ে পড়েচে বোষ্টম বৌ। তা তো হবেই, আট বছর হয়ে গেল। আচ্ছা তাকে যদি এখন দেখে বোষ্টম বৌ তো কি না জানি ভাবে!

হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠলো—তুমি কখন এলে গো?

যতীনের অন্তরাত্মা পর্যন্ত বিস্ময়ে শিউরে চমকে উঠলো সে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে। সে পেছন ফিরে চাইলে, আশা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পেছনে। পরনে লালপাড় শাড়ি, ঠিক যেমনটি পরতো কুড়ুলে-বিনোদপুরের এ ঘরে; বয়েস তেমনি, চোখে না বুঝতে পারার বিস্ময়ের মূঢ় দৃষ্টি।

আশা! তুমি এখানে! কি করে এলে।

আশা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। যেন এখনো ভাল করে বিশ্বাস করতে পারচে না।

যতীন ওর দিকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে। বল্লে—আশা, চিনতে পারচো না আমায়?

আশা ওর মুখের দিকে তখনো চোখ রেখে বল্লে—খু-উ-ব।

—তুমি কোথা থেকে এলে?

—কি জানি কোথা থেকে যে এলুম। আজকাল কেমন হয়েচে আমার, সবই যেন কি মনে হয়। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা স্বপ্ন বুঝতে পারিনে। সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে কেমনতর। হ্যাঁগো, তুমি ঠিক তো?...

পরে ব্যস্ত হয়ে বল্লে—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করে নিই তোমায়—

প্রণাম করে উঠে বল্লে—কতকাল দেখিনি। ছিলে কোথায়? সংসার যে ছারেখারে গেল, বাড়ি ঘরদোরের অবস্থা এ কি হয়েচে! আমি এতকাল আসিনি। বাপের বাড়ি থেকে আমাকে আনলেও না। নিজেও ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্চ। ছেলেমেয়ে দুটোর কথাওতো ভাবতে হয়।

যতীন সস্নেহ কণ্ঠে বল্লে—ঠিক, ঠিক। তুমি ভাল আছ আশা?

—আমি ভাল নেই।

—কেন, কি হয়েচে? আশা, আমায় খুলে বলো সব—

—মাথার মধ্যে সব গোলমাল। কিছু বুঝতে পারিনে। সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। কত কি যে ঘটে গেল জীবনে, বুঝিনে কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা সত্যি। এই তুমি দাঁড়িয়ে আছ সামনে, আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে। যেন মনে হচ্চে কে বলেছিল, তুমি—না ছিঃ সে কথা বলতে নেই।

—আশা, আবার ঘর সংসার পাতাই এসো—

—পাততেই হবে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে—এক জায়গায় ছিলাম, মরুভূমি আর পাহাড়, লোক নেই জন নেই, কি ভয়ানক জায়গা। সেখানে যেন এক দেবীর সঙ্গে দেখা হোল, তার কপাল দিয়ে আগুনের মত হল্‌কা বেরুচ্চে। কি তেজ! বাবাঃ—কি রকম সব ব্যাপার। ও সব স্বপ্ন, কি বলো?

—নিশ্চয়ই, আশা।

—তুমি এলে ভালই হোল। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিই। উনুনগুলো ভেঙে জঙ্গল হয়ে গিয়েচে। চড়ুইপাখির বাসা হয়েচে কড়িকাঠে। হাটবাজার করে এনে দাও। সেই মরুভূমির মত জায়গা থেকে কে যেন আমায় এখানে টেনে নিয়ে এল। থাকতে পারলাম না।

পরে কাছে এসে অপরাধীর সুরে বল্লে—হ্যাঁগো, আমায় বাপের বাড়িতে ফেলে রেখেছিলে কেন এতদিন? রাগ করেছিলে বুঝি?

যতীন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, সে দৃষ্টিতে গভীর অনুকম্পা, অতলস্পর্শ অনুকম্পা—সর্ববাসনাশূন্য উদার ক্ষমা...কোনো কথা বল্লে না।

আশা মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখ বল্লে—বেশ চেহারা হয়েছে তোমার।

হঠাৎ আশা চিৎকার করে উঠলো—একি! ওমা, একি হোল! কোথায় গেলে গো? এই যে ছিলে? ওমা এ সব কি!

যতীন বুঝলে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে আশার কাছে। পৃথিবীতে কতক্ষণ সে থাকবে, পৃথিবীর আসক্তি ও চিন্তায় তার দেহ স্থূলস্তরের দর্শনযোগ্য হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যে, ওর চিন্তার প্রবল আকর্ষণ নরক থেকে আশাকে এনেছিল এখানে। আশাও আর থাকতে পারবে না। এখুনি ওকে চলে যেতে হবে। উভয় স্তরে জীবের কোন যোগাযোগ নেই।

রামলাল পর্যন্ত এসে যতীনকে আর দেখতে পেলে না। যতীনের দেহ আবার তৃতীয় স্তরের মত হয়ে গিয়েচে।

রামলাল বল্লে—কোথায় গেলে, ও যতীনদা? থাকো থাকো, যাও কোথায়? ও যতীনদা—

ততক্ষণে নরকের প্রবল আকর্ষণে আশাও তার নিজের স্তরে নীত হয়েচে।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। এ জগতের এই নিয়ম!

আশা সত্যিই বলেচে, কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা আসল তা বোঝবার যো নেই।

সে কোন্ দেবতা, যাঁর শরণ সে নিতে চায়, এ স্বপ্নের শেষ করতে চায়। করুণাময় এমন কে মহাদেবতা আছেন, যাঁর কৃপাকটাক্ষে আশা তো আশা, কত মহাপাপী উদ্ধার হয়ে যায় চোখের এক পলকে, মহারুদ্রের জ্যোতিস্ত্রিশূলের এক চমকে অনন্ত ব্যোম ঝলমল করে ওঠে পুণ্যের আলোয়, পাপতাপ পুড়ে হয় ছারখার, অবাস্তব স্বপ্নের অবসানে। হে অনন্তশয়নশায়ী নিদ্রিত মহাদেব, জাগো, জাগো!

ওদের বাড়ির পেছনের বাঁশবনে কর্কশস্বরে পেঁচা ডাকচে। শীতকালে রাধালতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে বেড়ার ঝোপজঙ্গলে। ঝিঁঝি ডাকচে ডোবার ধারে। মনে হয় চাঁদ উঠচে পূর্বদিকের আকাশে। আকাশের নক্ষত্রদল পাতলা হয়ে এসেচে। বোধহয় পৃথিবীর কৃষ্ণা প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া তিথি।

পুষ্প করুণাদেবীর দেখা পায়নি বহুদিন।

তিনি নানা ধরনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, পুষ্প সেজন্যে তাঁকে তেমন ডাকে না। আজ অনেকদিন পরে পুষ্পের মনে হোল, করুণাদেবীর একবার খোঁজ করা দরকার। সে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উচ্চস্বর্গে উঠে গেল, তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে, সেই কুসুমিত উপবনে। যখনই সে এখানে আসে তখন কি এক বিস্ময়কর আবির্ভাবের আশায় সর্বদা সে থাকে, কি সৌন্দর্য ও শান্তির লীলাভূমি এই পবিত্র দেবায়তন। সুগন্ধ কিসের সে জানে না, কোন্ ফুলের সে সুগন্ধ তাও জানে না—কিন্তু অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, সারা মন খুশি হয়ে ওঠে হঠাৎ।

মহারূপসী দেবী ওকে হাসিমুখে হাত ধরে একটি বিশাল বনস্পতিতলে স্ফটিক বেদীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পুষ্প চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবলে—এ গাছ তো এত বড় দেখিনি, এত বড় গাছই তো ছিল না।

করুণাদেবী মৃদু হেসে বল্লেন—কি ভাবচ, গাছটার কথা? ও তৈরি করেচি। বনস্পতিতে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। তাই দেখি সারা সময় চোখের সামনে।

—কি গাছ?

—পৃথিবীতে ছিল না কোনো দিন, নাম নেই।

—আমি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করেছিলাম কি? দেখা দেননি কতদিন। আমার কষ্ট তো জানেন সব। আপনি একবার চলুন, যতীনদা বড় কাতর হয়ে পড়েচে, আশা-বৌদি নরকে। আত্মহত্যা করেছিল।

করুণাদেবী অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসলেন। বল্লেন—সব জানি। আমার পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের সন্ধান রাখিনে আমি! আমিই যতীনের ব্যাকুলতা দেখে তার সঙ্গে ওর স্ত্রীর দেখা করিয়ে দিই। নইলে নরক থেকে পৃথিবীতে গিয়ে দেখতে পেতো না যতীনকে। এই দেখাতে আশার উপকার হবে—

যতীনদা সেই থেকে কিন্তু পাগলের মত হয়েচে—

—যতীন অজ্ঞান।

—আপনি ভাল বোঝেন সব, দেবী। আপনি যতীনদাকে সুখী করুন। ওর কষ্ট দেখতে পারিনে। আশা বৌদির ভাল হয় কিসে?

করুণাদেবী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ওর গালে হাত বুলিয়ে অতি ধীর শান্ত সুরে বলতে লাগলেন—পুষ্প, তোকে ভালবাসি বড়। মনে আছে সব। ভাল হবে শেষে, কিন্তু—লক্ষ্মী, পুষ্প—

—কি দেবী?

করুণাদেবীর চোখে জল! পুষ্প অবাক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন মায়া হোল এই রাজরাজেশ্বরীর মত রূপবতী মহাশক্তিধারিণী দেবীর ওপর, কোলে শায়িতা ছোট্ট খুকি যেন, তার মেয়েটির মত। ভগবান এমন ভাবেই বোধ হয় মানুষের কাছে ধরা দেন ঐশ্বর্য লুকিয়ে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে অসীমস্নেহে করুণাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে।

দেবী বল্লেন—তোকে বড় দুঃখ পেতে হবে—

পুষ্পের বুকের মধ্যে দুরুদুরু করে উঠলো। কেন, কিসের দুঃখ? কি কথা বলতে চাইছেন দেবী?

দেবী আবার বল্লেন—যতীন ও তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তার দরকার আছে। তুই চলে যা পুষ্প, আমি যাবো তোরই বাড়িতে একটু পরে। তারপর আমার সঙ্গে তোদের পৃথিবীতে একবার যেতে হবে।

—দেবী, গ্রহদেবের দেখা পাবো?

—সময়ে পাবে পুষ্প। তিনি কিছু পূর্বে এখানে ছিলেন।

উচ্চস্বর্গে দেবলোকের প্রেমিক-প্রেমিকা। পুষ্প যতই এঁদের দুজনকে দেখে, ততই আনন্দে ও শান্তিতে মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুষ্প ও যতীনকে সঙ্গে নিয়ে করুণাদেবী একটি পুরাতন শহরে এলেন।

বাড়িঘর সব পুরোনো ধরনের, পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেচে, রাস্তাঘাট সেকালের ধরনের সরু সরু। একটা পুরোনো বাড়ি গলির মধ্যে, সেই বাড়ির পাশে ছোট্ট একটা বাগান। বেলা গিয়েচে, সন্ধ্যার কিছু আগে। বাড়িটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুষ্প ও যতীন দুজনেরই মনে হোল, এখানে ওরা যেন এর আগে এসেচে। যেন কতকাল আগে, ঠিক মনে করতে পারচে না।

হঠাৎ যতীন বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দেবী, আমি এ বাড়ি চিনি বলে মনে হচ্চে—

তার মন আজ আনন্দে পূর্ণ, কারণ বহুদিন পরে আজ সে করুণাদেবীর দেখা পেয়েচে। এ যে কত সৌভাগ্যের কথা, এতদিন এখানে থেকে সে ভাল বুঝেচে।

দেবী বল্লেন—বেশ, বাড়ির ভেতর যাও—

যতীনের মনে হোল বাড়ির ভেতরের উঠানে একটা পেয়ারার গাছ আছে, সে কতকাল আগে সেই গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতো। বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই একটিছোট ঘর। একটা কুলুঙ্গির দিকে চাইতেই যেন বহু পুরোনো দিনের সৌরভের মত কোথাকার কত হারানো দিনের বহু অস্পষ্ট স্মৃতির সৌরভ এল কুলুঙ্গিটা থেকে। এক সুন্দরী নববধূর মুখ যেন মনে পড়ে, ঐ কুলুঙ্গিতে সে তার মাথার কাঁটা রাখতো শোবার আগে, এই ঘরের সঙ্গে যেন এক সময়ে কত সম্পর্ক ছিল ওর। বাড়িটাতে অনেক ছেলেমেয়ে চলাফেরা করচে, দুটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক রান্নাঘরে কাজকর্ম করচে। ঐ তো সেই পেয়ারা গাছটা। ওর তলায় বসে সে কত খেলা করেচে একটি মেয়ের সঙ্গে—মেয়েটিকে সে বড় ভালবাসতো। আজও যেন তার মুখ মনে পড়ে—কোথায় যেন চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

পুষ্প ওর পেছনে পেছনে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকচে। সে বল্লে—যতীদা, ওই সেই পেয়ারা গাছ—

—কোন্ পেয়ারাগাছ—

—মনে পড়েচে ওর তলায় তুমি আর আমি খেলা করতাম, অনেক কাল আগে—স্পষ্ট মনে হচ্চে—

—তুই তবে সেই মেয়ে পুষ্প—আমারও সব মনে পড়েচে। তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে। সে সব দিনের দুঃখুও যেন মনে আসচে।

—তুমি মারা গিয়েছিলে যতীনদা। আমায় ওই বলে গালাগালি দিও না, বালাই ষাট, আমি মরবো কেন?

—দেবী সঙ্গে নেই তাই তোর বাড় হয়েচে, তুই যা তা বলচিস আমায় পুষ্প! আচ্ছা, বল্ তো, এক জায়গায় এ বাড়িতে এক বুড়ো লোক বসে থাকতো, তার কি যেন হয়েছিল, বসেই থাকতো। মনে পড়চে তোর?

—মনে হয়েচে, দেওয়ালের গায়ে বালিশ ঠেস্ দিয়ে।

যতীনের মনে হচ্ছিল যেন সে একটি সুপরিচিত স্থানে বহু, বহুকাল পরে আবার এল। এ বাড়ির সব ঘরদোর সে চেনে, অনেককাল আগে এ বাড়িতে সে বেড়িয়েচে প্রত্যেক ঘরদোরে। বহু প্রিয়জনের দূরাগত স্মৃতি যেন একটি গুরুভার বেদনার মত বুকে চেপে বসেচে।

বাড়ির ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে খেতে বসেচে। খুব গোলমাল করচে নিজেদের মধ্যে। ওদের প্রতি এমন একটি স্নেহ হয়েচে যতীনের, এরা অতি আপনার জন, কতদিনের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে। যতীন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেল, ওদের মা এবার হাতায় করে দুধ পাতে পাতে দিচ্চে। অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েচে বাড়িটা, তার জানা বাড়ি এর চেয়ে ভাল, নতুন ছিল। সে সব বুঝতে পেরেচে, করুণাদেবী তাদের কেন এখানে এনেচেন।

পুষ্প বল্লে—যতুদা, আমাদের পূর্বজন্মের দেশ। কোন্ গ্রাম এটা বলতে পারো? তুমি আমি এখানে জন্মেছিলাম।

—তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে—রাগ করিস্নি বলচি বলে।

—আমার মনে পড়েচে।

—গত জন্মেও তাই। এই রকমই হচ্ছে জন্মে জন্মে। তুই মারা যাচ্চিস, আমি তোর পেছনে যাচ্চি। কিন্তু আর একটি মেয়ের কথা বড় মনে পড়ছে। তাতে আমাতে কিছুদিন এখানে ছিলাম। তারপর সেও কোথায় গেল চলে।

ওরা বাইরে এল। করুণাদেবী বল্লেন—মনে পড়লো?

কিন্তু এ যে অদ্ভুত মনে পড়া। কত নিবিড় বর্ষারাতের টিপ টিপ জলপতনের সঙ্গে, কত বসন্তের প্রথম রোদে পোড়া মাটির গন্ধের সঙ্গে জীবনের মস্ত বড় যাত্রাপথ একসুরে বাঁধা, আনন্দের নিবিড় স্মৃতি সেখানে বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে—গভীর বেদনা, যা শুধু জন্ম-জন্মান্তরের হারানো প্রিয়জনের বার্তা বহন করে আনে অন্তরতম অন্তরে। মনে হয়, সবই কি তবে মিথ্যে, সবই স্বপ্ন?

যতীনের দিশেহারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর মনের কথা পরিস্ফুট হোল। করুণাদেবী বল্লেন—ওই জন্যে তোমাদের এনেচি। এখানে তোমাদের ঠিক এবারকার জন্মের আগের জন্মভূমি।

পুষ্প বল্লে—এ কোন্ গ্রাম দেবী? নাম মনে নেই।

—ত্রিবেণী। গঙ্গার তীরে। ঐ গঙ্গা—

—তা হোলে গত দুই জন্মে আমরা কাছাকাছিই ছিলাম, গঙ্গারই ধারে। এবার তো হালিশহরের এ পার সাগঞ্জ-কেওটায়।

—স্থানের আকর্ষণ অনেক সময় এমন হয় যে গত জন্মের ভূমিতে কোনো না কোনো সময় আসতেই হবে। তবে জন্মান্তরীণ স্মৃতি সব আত্মার থাকে না পৃথিবীর স্থূলদেহে। কখনো কেউ জাতিস্মর হয়। জাতিস্মর হওয়া উচ্চ অবস্থার লক্ষণ।

যতীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মন ভাল নেই। জগৎ ও জীবন দেখচি সব ভেল্কির মত। কোন্‌টা সত্যি? কোন্‌টা মিথ্যে?বাজে জিনিস সব। বাঁচা মরা কিছুরই মধ্যে কিছু নেই। কেন এ বিড়ম্বনা?

সে জিজ্ঞেস করলে—দেবী, এরা আমার কে? এখন যারা আছে?

—তোমার পৌত্রের পৌত্র।

—আর পুষ্পের?

—পুষ্প অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আশা এ বাড়িতে তোমার প্রথমা স্ত্রী ছিল। সে অল্পবয়সে তোমায় ছেড়ে চলে যায় এবারের মত। আমিই তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছিলুম তিনজনকে আবার এ জন্মে। কিন্তু কর্মের ফল আমি খণ্ডন করতে পারিনি তোমাদের—চেষ্টাকরলাম, কিন্তু কর্মশক্তি নিজের পথ ধরল ঠিক।

যতীন হতাশ সুরে বল্লে—আপনি যখন পারলেন না, তখন আর কি উপায় দেবী। আপনি স্বয়ং যখন—

করুণাদেবী বল্লেন—কর্মের বন্ধন স্বয়ং ভগবান কাটতে পারেন চোখের পলকে। তিনি ছাড়া আর কে পারে।

—আমি কি করেছিলাম দেবী, কেন আমার এ দুর্ভাগ্য দুই জন্ম ধরে?

—এরও আগের জন্ম দেখবে? কিন্তু ছবি দেখাবো। সামনের আকাশে চাও—সে স্থান এখন আর নেই, প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। সে জন্মে প্রথমা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে দুবার বিবাহ করেছিলে। সে তোমায় বড় ভালবাসতো। সেজন্যে তাকে আর আপনার করে পেলে না পর পর দু'জন্মেও। সতী লক্ষ্মীর মনে বড় কষ্ট দিয়ে ত্যাগ করেছিলে।

—সেও কি আশা?

—না।

—তবে সে কে দেবী? বলুন দয়া করে—সে কি অন্যত্র চলে গিয়েচে?

—সে এই তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সতীলক্ষ্মী তোমায় ছাড়েনি, কিন্তু তোমার কর্মফলে তুমি ওকে পাচ্চ না। আমি পর পর দু'জন্ম চেষ্টা করচি, কিন্তু পেরে উঠচি কই!

পুষ্প অবাক হয়ে দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ সব কথা তার মনে নেই।

করুণাদেবী বল্লেন—তারও পূর্ব জন্মে তোমার কর্ম আরও খারাপ। যাক্ এ সব কথা। তোমাকে তিন জন্মের কথা জানতেই হবে, এর কারণ আছে। পুষ্প, তুই কষ্ট পাবি আমি জানি। আমি চেষ্টা করবো সে দুঃখ দূর করতে। যতীনকে ওর পূর্বজন্ম দেখালাম, কারণ ওর আত্মার প্রয়োজন হয়েচে।

পুষ্প বিবর্ণ মুখে বল্লে—কেন দেবী?

করুণাদেবী ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—যতীনকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্প জানে। সে জানে তার প্রশ্ন নিরর্থক। সে অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেচে। এই ভয়ই তার মন করছিল।

যতীন চমকে উঠলো। এত অল্পদিনে আবার পুনর্জন্ম কেন? কোথায় রইল আশা, কোথায় রইল পুষ্প—কার কাছে যাবে সে পৃথিবীতে?

তখনি তার মন বলে উঠলো—কেন, মায়ের কাছে। যার কোল আঁধার করে সে চলে এসেচে।

করুণাদেবী বল্লেন—যতীন, তোমার অন্তরাত্মা চাইচে ঐ দুঃখিনী মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে। তোমার মায়ের অন্তরাত্মা কাঁদচে তোমার জন্যে। সেখানে যেতে হবে তোমাকে। এ বাঁধন এড়াবার যো নেই। মাতৃশক্তি জগতের মধ্যে খুব বড়। তা ছাড়া আশার জন্যে তোমাকে যেতে হবে ভূলোকে। ভুবর্লোকের কোনো উচ্চস্তরে ও যেতে পারবে না—বেচারী! গ্রহদেবকে আমি বলেচি, আশার অন্তরাত্মা কাঁদচে, অনুতাপে সব পাপ মোচন হয়। আশাকেও আবার পৃথিবীতে পাঠাবো—তুমি জন্মগ্রহণের কিছু পরে। এই পাঁচ ছ'বছর ওকে নরকেই থাকতে হবে। তার আত্মা তাতে উন্নতি করবে। নিজের ভুল ক্রমশ বুঝবে। এই জন্মে আমি আবার তোমাদের মিলিয়ে দেবো। বোধ হয়তোমাদের প্রারব্ধ ও জন্মে কেটে যাবে।

পুষ্প পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে সব শুনলে। আকাশ পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে ততক্ষণে। জন্ম-জন্মান্তর যে জীবনের মাস, ঋতু ও বৎসর মাত্র, তাও যে শূন্য, অন্ধকার। ভূমা নয়, অল্পেই তার সুখ ছিল।

করুণাদেবী সব জানেন। পুষ্পকে তিনি বুঝিয়ে বল্লেন। আশার জন্যেও স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হবে, যতীনের জন্যেও। এই জন্মে আশার সব ভুল মুছে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন। আচার্য রঘুনাথদাস আশার আত্মার জন্যে তাঁর ঈষ্টদেবকে জানিয়েছিলেন।

ভক্তের ক্ষমতা বড় তুচ্ছ নয়। গ্রহদেবের আসন টলেচে।

পুষ্প বল্লে—বুঝেচি। তিনি মহাপুরুষ সেদিন যখন নরকে নিয়ে গেলেন আমায়, তখনই আমার মনে হোল নরক পবিত্র হোল! আপনারও আসন টললো—আমি ডাকলে আপনি ছাই আসেন!

করুণাদেবী বালিকার মত সকৌতুকে খিল্ খিল্ করে হাসলেন। বল্লেন—তুই আমার ওপর রাগ করলি বুঝি? ছিঃ—লক্ষ্মী দিদি—

পুষ্পের অভিমান এখনো যায়নি। সে দুষ্টু মেয়ের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

দেবী বল্লেন—তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো পুষ্প।

—না। আমাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন না, দিন না দয়া করে। সত্যি বলচি। স্বর্গে আমার দরকার নেই।

—পৃথিবীতে পাঠিয়ে কি হবে? এবার যে চেষ্টা করবো ওদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে। পৃথিবীর মিলন না হোলে আশার প্রারব্ধ কিছুতেই কাটবে না। এ আত্মত্যাগ তুই করতে পারবি আমি জানি। ওরা জন্ম নিলেই তো সব ভুলে যাবে, কোনো কথা মনে থাকবে না এ জন্মের। আমি আবার দেখা করিয়ে দিই, যে যাকে চায় মিলিয়ে দিই। নতুবা জীবের কি সাধ্য?

পুষ্প বল্লে—আমাকেও পাঠিয়ে দিন, সব ভুলে থাকি।

করুণাদেবী ওকে কাছে নিয়ে এলেন আদর করে। পুষ্পের দেহ শিউরে উঠলো, কি অপূর্ব সুগন্ধ দেবীর সারাদেহে, কি অপূর্ব স্পর্শসুখ! সে মেয়েমানুষ তবুও এই রূপসী দেবীর স্নিগ্ধস্পর্শে ওর সারাদেহে যেন তড়িৎসঞ্চার হোল। অমৃতস্পর্শে আত্মা যেন নিজের অমরত্ব, অনন্তত্ব অনুভব করলে এক মুহূর্তে।

সস্নেহে বল্লেন—পুষ্প, তোকে পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হবে না। শুক্লা গতির পথে তোর অনাবৃত্তি লাভ ঘটেচে। ওরা এখনো অপরিণত, শেখবার বাকি আছে, কর্ম এবার নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো। পৃথিবীর জীবন বেশিদিনের নয়। আত্মার পক্ষে চোখের পলক মাত্র। আমি এবার যাই পুষ্প।

পুষ্প বল্লে—আমায় পৌঁছে দিয়ে যান—

—নিশ্চয়, চল যাই।

যাবার সময় করুণাদেবী বলে গেলেন, তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আসবেন।

যতীন একা বসে ছিল বাড়িতে। পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে হবে। শত সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবার জড়ানো, মন্দ কি? সেই গরিব ঘরের বৌটির কোল আলো করে আবার শিশু হয়ে কত বাল্যলীলা করবে, নতুন আস্বাদ, আবার আসবে আশা—হতভাগিনী আশা—নববধূরূপে তার ঘরে, আবার কত বর্ষারাত্রি, কত বসন্তপ্রভাত ওর সাহচর্যে কাটবে। পৃথিবীতে যেতে তার কষ্ট নেই, মধুর সেখানকার শৈশব, মধুর কৈশোর, মধুর যৌবন। চিরযৌবনের হাওয়া যেন বয় তার অমর আত্মায়, পৃথিবীতে মাস যাবে মাস আসবে, নতুন ধানের গন্ধ বেরুবে ক্ষেতে ক্ষেতে, ক্ষুধায় বনের মেটে আলু তুলে নুন দিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তার মা যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তাকে খাওয়াবে, আশা সংসার পাতবে নতুন লক্ষ্মীর হাঁড়িতে ধান দিয়ে।...

কেবল কষ্ট হয় পুষ্পের জন্যে। এতদিন ওর সঙ্গে থেকে কি মায়াই হয়েচে ওর ওপরে। কেন এমন বিচ্ছেদ? কি কষ্ট পাবে পুষ্প, তা সে জানে। আশা যদি কষ্ট না পেতো, যতীন কিছুতেই যেতো না।

পুষ্প এসে ওর হাত ধরে বল্লে—যতীনদা!

—কি পুষ্প?

—আমায় ভুলো না।

—আচ্ছা, পুষ্প—তুই বলতে পারিস, কেন আমাদের জীবনে এ দুর্ভাগ্য, কেন বার বার তোকে হারাচ্চি? তোর বৌদিদিকে হারাচ্চি?

—আমায় নিয়ে যাও সঙ্গে—

—ছিঃ পুষ্প। দেবী যা বলেন তাই তোমার আমার পক্ষে শুভ। ওঁর কথা শোনো।

—আমি কারো কথা শুনবো না, আমি যাবো।

—কি, এবারও একসঙ্গে খেলা করবি পুষ্প? তেমনিধারা সাগঞ্জ-কেওটার ঘাটে? বেশ—অদ্ভুত সে সব দিন।

যতীন চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। পুষ্প ওর হাত ধরে বসে রইল, বল্লে—তাই তো সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট এ লোকেও ভুলতে পারিনি। জন্মান্তরের স্মৃতিতেও অক্ষয় যেন হয়। তোমার যাওয়ার পথে দেবতারা ফুল ফেলুন যতুদা—আমি হতভাগিনী চিরকাল একাই থাকবো। এই আমার ভাগ্য।

যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার মুক্তিতে দরকার নেই, কোনো কিছুরদরকার নেই। সমাধি-টমাধি, দেবী-টেবী সব বাজে। তোকে ছেড়ে যাবো না।

—আশা?

—তার অদৃষ্টে যা হয় হবে পুষ্প।

—ঠিক কথা যতুদা?

—প্রাণের সত্য কথা বল্লাম। এখন আমার অন্তর যা বলচে। সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে আমার কাছে—তুই থাক্ পুষ্প আমার!

—জগতের, বিশ্বের বহুদূর সীমানায় চলে যাও যতুদা, তোমায় মুক্তি দিলাম। ভালবেসো, ভুলো না।

—ওসব থিয়েটারি ধরনের কথা কোথায় শিখলি রে? তোদের দোহাই, মুক্তি-টুক্তির কথা আমায় শোনাস্নে। চল্ তুই আর আমি পৃথিবীতে যাই, ছোট্ট নদীর ধারে কুঁড়েঘরে সংসার পাতবো। সেই আমাদের স্বর্গ, সেই আমাদের সব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ঝরঝর করে। সে কোনো কথা বল্লে না।

সেদিনই যতীনের মনে হোল কে যেন কোথায় তাকে ডাকচে...সব সময় তার প্রাণের মধ্যে কিসে যেন মোচড় দিচ্চে...আশা, অভাগিনী আশা, ভুবর্লোকের নীচের স্তরে অসহায় একাকিনী পড়ে আছে, কেউ নেই তাকে দেখবার।

সত্যি আশা তাকে ডাকচে। তার অন্তরাত্মা শুনতে পেয়েচে অভাগিনীর ডাক।

সে পুষ্পকে কথাটা বল্লে।—তোর বৌদিদি বড্ড কাঁদচে পুষ্প। সেদিন কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়িতে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ওর ডাক প্রায়ই শুনি।

—আমি যাই সেখানে যতুদা, তুমি যেও না। দেখে আসি।

—কিছু ভাল লাগে না ওর জন্যে।

—কেন তোমাকে যেতে বারণ করি, ও সব নীচের স্তরে তোমায় যেতে দিতে আমার মন সরে না।

—তুই তো যাস্ দিব্যি।

—আমি গিয়েছিলাম আচার্য রঘুনাথের কৃপায়। মহাপুরুষদের বিশেষ দয়ায় বিশেষ শক্তি হয়। নয়তো ওই স্তরে নানান রকমের নিম্নশ্রেণীর শক্তি খেলা করচে সর্বদা, মহাপুরুষদের কৃপায় বিশেষ শক্তি লাভ করে সেখানে গেলে ওই সব দুষ্ট শক্তি কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। নয়তো বিপদ পদে পদে—এই জন্যেই তোমাকে ওখানে যেতে দিতে চাইনে যতুদা। চলো দেখি কি উপায় হয়।

রঘুনাথদাসের আশ্রমের যাবার পথে কবি ক্ষেমদাসের সঙ্গে দেখা। তিনি আপন মনে একটি বৃক্ষতলায় চুপ করে বসে; অতি সুন্দর নির্জন স্থানটি, বনপুষ্প ফুটে আছে ঝরণার ধারে। ওরা কাছে গিয়ে দেখলে পৃথিবীর দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে কি যেন দেখছেন। ওদের দেখে স্তিমিত মুখে সম্ভাষণ করলেন। যতীন ও পুষ্প দুজনেই ওঁকে প্রণাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কোথায় যাচ্চ তোমরা?

পুষ্প বল্লে—রঘুনাথদাসের আশ্রমে। বড় বিপদে পড়ে যাচ্চি। আপনিও শুনুন দেব—যদি কিছু উপায় হয়। তারপর সে আশার কহিনী সব খুলে বল্লে।

ক্ষেমদাস সব শুনে ধীরভাবে বল্লেন—এই দুঃখ সনাতন। আত্মা নিরন্তর সাধনা করচে নিজেকে জানবার। আমার নিজের জীবনেও এমনি হয়েছিল। আমি তাই এখানে বসে বসে ভাবছিলাম, আবার পৃথিবীতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠচে যেমন উঠতো পাঁচশো বছর আগে, অনাদ্যন্ত মহাকাল নিজের কাজ করে চলেচে যেমন করতো হাজারবছর কি দু-হাজার বছর আগে—আমি পৃথিবীতে একটি মেয়েকে কত ভালবাসতাম, আমাদের গ্রামের সদানন্দী মাঠের ফুলবাগানে কত বেড়াতাম দুজনে এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে—লুকিয়ে লুকিয়ে,—এখন সে কোথায়?

অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই কবি মাথা দুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সত্যি তাই ভাবি, কোথায় সে?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কেন, আপনি তাঁর দেখা পাননি আর?

—না। বিশ্বের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। দ্যাখো, আমরা কবি, জগতে রূপরসের উপাসক। একেই বড় করেচি জীবনে। যাঁরা বলেন সব মায়া, তাঁদের কথা বুঝি না। মায়া লয় হোলে এই রূপরসের জগৎটাও লয় হয়। তা আমরা চাইনে—তাই দুঃখ পাই, কিন্তু দুঃখের মধ্যেও জানি ভগবানই সৃষ্টি করেচেন এই জগৎ। সবই তিনি। কষ্ট পেলেও জানি তাঁর হাতে কষ্ট পাচ্চি। প্রেমময়ের তাড়নায় কষ্ট কি? সব মুখ বুজে সহ্য করি। এটাও মানি, এই রূপরসের সাধনার মধ্যেই আমাদের সিদ্ধি। এপথেও তাঁকে পাওয়া যায়। চলো, নরকে আমি নিজে যাবো, খুঁজে বার করি তোমাদের সেই মেয়েটিকে। তার দুঃখ আমি কবি আমি বুঝি—

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার পুনর্জন্ম ঠিক হয়ে গিয়েচে সেই মেয়েটিকে নিয়ে। করুণাদেবী জানিয়েচেন—

ক্ষেমদাস বল্লেন—তিনি যা করেচেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী—তাঁকে তোমরা করুণাদেবী বল, দুর্গা বল, লক্ষ্মী বল, সীতা বল, সরস্বতী বল—সবই এক। তবে এখন মেয়েটির কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। উপায় হয়ে গিয়েচে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে গেল শুনে। অত বড় বড় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে সে করুণাদেবীকে এক আসনে বসায়নি। উনি যদি দুর্গা হন, কালী হন, সীতা হন, লক্ষ্মী হন—তবে তার আর জন্মমরণের ভয় কিসের? আশারই বা ভয় কিসের? হাসিমুখে সে মহাগৌরবে নরকে যেতে প্রস্তুত।

ক্ষেমদাস ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—জন্ম নিতে দুঃখ কিসের? পৃথিবীর রূপরস আবার আস্বাদ করে এসো। সেই জ্যোৎস্না, সেই বনবিতান, কোকিলের কুহুতান, সেই মায়ের কোল যাপিত একান্ত-নির্ভরতার শৈশব, প্রথম যৌবনে প্রিয়ার প্রথম দর্শন—যাও যাও, ওরই মধ্যে ভগবানে মন রেখো—কর্ম যতদিন না কাটে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখি অথবা কীটপতঙ্গে করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে।

মেয়েটির কাছে যাবার কোনো দরকার নেই। দেবী যখন তার ব্যবস্থা করেচেন, তখন আমাদের সেখানে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে। দেবী সর্বমঙ্গলা তাকে শ্রেয়ের পথে চালিত করবেন।

ঠিক সেই সময়ে একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হোল বৃক্ষতলে। যতীন তাঁর দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, ইনি সেই সন্ন্যাসী, যিনি একদিন স্পর্শদ্বারা তার মধ্যে সবিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন! সেই যোগী পুরুষই—নীল বিদ্যুতের মত আভা বেরুচ্চে, সারা দেহ থেকে ওঁর।

যতীনের দিকে চেয়ে তিনি মৃদু হেসে বল্লেন—মনে আছে?

যতীন তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলো নিলে, পুষ্পও তাই করলে। ক্ষেমদাস চুপ করে বসে রইলেন।

তিনি আবার বল্লেন—মনে আছে? বলেছিলাম সময় পেলে দেখা দেবো। এই সেই মেয়েটি বুঝি? এঁর তো খুব উচ্চ অবস্থা দেখচি। ক্ষেমদাসের দিকে চেয়ে বল্লেন— কবি যে! কি করচ বসে বসে?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাদের মত সমাধির চেষ্টায় আছি—

—ও তোমাদের অনেক দূর। মায়িক-জগতের বন্ধন এখনো তোমাদের কাটেনি। আবার এদেরও মাথা খাচ্চ কেন ওকথা বলে?

—আমিও ঠিক এই কথাই তোমায় বলতে পারি। অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান-ট্যান এই সব কচি কচি ছেলেমেয়ের মাথায় ঢোকাচ্চ কেন!

সন্ন্যাসী হেসে ক্ষেমদাসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহ সুরে বল্লেন—তুমিও ঐ দলেরই একজন। কবি কিনা, মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে বাস করো।

পুষ্প সময় বুঝে বল্লে—প্রভু, জানেন এঁর প্রতি পুনর্জন্মের আদেশ হয়েচে!

সন্ন্যাসী বল্লেন—নয়তো কি ভেবেচ ইনি মায়ার অতীত হয়ে যাতায়াতের চক্রপথ এড়িয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেচেন?আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো—আত্মাকে না জানলে যাতায়াত বন্ধ হবে না—

ক্ষেমদাস বলে উঠলেন—বয়েই গেল। ক্ষতিটা কি?

—বাজে কথা বোলো না কবি। তোমার ক্ষতি না হতে পারে। তোমার মত চোখ আর মন নিয়ে ক'জন পৃথিবীতে যাবে? সাধারণ লোক গিয়ে অর্থ, যশ, মান, নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য মায়ার খেলা হোক—তবুও স্বীকার করি, দেখতে জানলে তা দেখেও সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছতে পারে। ও যে একটা সোপান। কিন্তু তা ক'জনের চোখ থাকে দেখবার? আর্তের সেবা করে কজন? কাজেই মানুষের দুঃখ যায় না। মনে আনন্দ পায় না; ভোগ করতে করতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে জরার অধিকার শুরু হয়েছে! তখন মৃত্যুভয়ে বলির পশুর মত জড়সড় হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে শোক, বিচ্ছেদ, বিত্তনাশ, অপমান, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। কোথায় সুখ বলো?

—দুঃখের মধ্যেই আনন্দ হে সন্ন্যাসী—দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে, বীতস্পৃহ হয়, বীতমন্যু হয়, বীতশোক হয়। ভগবানের দিকে মন যায়। জন্মে জন্মে আত্মা বললাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরের চিতার আগুনে পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে ওঠে। ভগবানেরই এই অবস্থা—এ তুমি অস্বীকার করতে পারো? ক'জন তোমার মত নর্মদাতীরে সারাজীবন তপস্যা করে ভগবানের দর্শন পেয়েছে? বহু ভুগে, বহু ঠকে, বহু নারী, সুরা, অর্থ বিত্ত ভোগ করে মানুষ ক্রমশ বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসে—বহু জন্ম ধরে এমন চলে—তখন জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতি তাকে বলে আবার কোনো নতুন জন্মে—ও থেকে নিবৃত্ত হও, ও-পথ তো দেখলে গত কত শত জন্ম ধরে, আবার সেই একই ফাঁদে পড়ো, সেই রকম কষ্ট পাবে। ভোগের দ্বারা আত্মাও তখন অনেকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেচে—তখন সে ভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথ খোঁজে।

—হ্যাঁ, তোমার কথা কাটি কি করে? তুমি কবি, অন্য পথে গিয়ে সত্যদৃষ্টি লাভ করেচ। কিন্তু একটা কথা বোঝো—যদি এক জন্মেই হয় তবে ভগবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে শত শত জন্ম ধরে এ অনাগত চক্রে ঘোরাঘুরি কেন?...

ক্ষেমদাস সুকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন হাত দুটি সুন্দর ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখি অথবা কীটপতঙ্গে।করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে—

সন্ন্যাসী বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, ও সব ভাবুকতা রাখো। আমার কথার উত্তর দাও।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ—কলিতে বহু দোষ কিন্তু একটা গুণ এই যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই পরামুক্তি। তাই বলেচে—

এই পর্যন্ত বলেই আবার সুর করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বল্লেন—আবার ওই সব! গান আসচে কিসে এর মধ্যে? তা ছাড়া আমি তোমাদের ওই কৃষ্টটৃষ্ণ মানিনে জানো? ওসব মায়িক কল্পনা—ভগবানের আবার রূপ কি!

—তুমি শুষ্ক পথে ভগবানের সঙ্গে নিজের সত্তা মিলিয়ে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেছ। ভক্তিপথের কিছুই জানো না। প্রেমভক্তি এখনো বাকি তোমার।

—মরুক গে। আমার কথার উত্তর দাও—

—উত্তর কি দেব? ভোগ না হলে নিবৃত্তি হয় না। ভগবান তা জানেন, তাই শত জন্মের মধ্যে দিয়ে জীবকে তিনি ভোগ আস্বাদ করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন। সবারই হবে তবে বিলম্বে।

সন্ন্যাসী শান্ত ভাবে বল্লেন—হাঁ ঠিক।

—তুমি মেনে নিলে?

—নিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথার ঠিক উত্তর দিলে কৈ? যদি এক জন্মে হয় তবে হাজার জন্মের মধ্যে দিয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটি কেন?

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—তার কারণ, সবাই তোমার মত মুক্তিকামী নয়, তোমার মত জ্ঞানী নয়—গত জন্মে তুমি যে উচ্চ অবস্থা নিয়ে জন্মেছিলে, যে জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফলে তোমার মন মুমুক্ষু হয়েছিল, সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়েছিল—তুমিই বলো না, সে কি তুমি একজন্মে লাভ করেছিলে? তুমি তো যশৈ্বর্যশালী—মুক্ত পুরুষ—তোমার অজানা তো কিছুই নেই—বলো তুমি?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্লেন—তা ঠিক। গত জন্মের পূর্ব তিন জন্মেও আমি যোগী ছিলাম। আমার সে সময়ের গুরুভ্রাতা এখনো হিমালয়ের দুর্গম শিখরে তুষারাবৃত গুহায় দেহধারী হয়ে বাস করচেন। প্রায় আটশো বছর বয়েস হোল। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। গত সাতশো বছরের মধ্যে তিনবার নীচে নেমে গিয়েছিলেন ভারতের লোকালয়ে। একবার নেমে শুনলেন শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করচেন।

দ্বিতীয়বার নামলেন অনেকদিন পরে; নামতে নামতে শুনলেন যবনেরা ভারতে প্রবেশ করেচে—শুনে আর না নেমে গিয়ে উঠে নিজের আসনে চলে গেলেন, অনেকদিন আর নামেননি।

পুষ্প ও যতীন রুদ্ধকণ্ঠে শুনছিল। পুষ্প অধীর কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—আর একবার কখন্ নেমেছিলেন?

—আমি তখন এ জন্মের পরেও দেহত্যাগ করেচি—এই সেদিন, পৃথিবীর হিসেবে বড়জোর সত্তর আশি বছর হবে। বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ভারতব্যাপী, আমরা অনেকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে যাই ভারতে যদি কোন প্রতিকার করতে পারি। ওঁকেও নিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে। কুম্ভমেলা সেবার প্রয়াগে। উনি মেলা দর্শন করে দশদিন থেকে ওপরে উঠে যান—সেই শেষ, আর লোকালয়ে যান নি।

ক্ষেমদাস প্রশ্ন করলেন—এখনো দেহে রয়েচেন কেন?

—যোগ-প্রক্রিয়ায় দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গিয়েচে, তাই দেহ ধারণ করেই আছেন। বাসনা-কামনা-শূন্য মুক্তপুরুষ তিনি, দেহে থাকাও যা, দেহে না থাকলেও তা। তাঁর পক্ষে সব সমান। স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। আমিও তাঁকে বলেছিলাম—আর দেহে কেন? উনি বল্লেন—হাম্ তো আত্মানন্দ আত্মারাম, হামারা ওয়াস্তে যো হ্যায় ব্রহ্মলোক, সো মেরা হিমবান, মেরা আসন। এহি পর পরমাত্মা বিরাজমান হ্যায়। লোকালোক তো মায়া—

ক্ষেমদাস বল্লেন—হ্যাঁ, ওসব অনেক উচ্চ অবস্থার কথা। আমাদের জন্যে নয় ওসব। আমরা ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পাই, এই অপূর্ব সৌন্দর্যরসের আস্বাদ করবে কে আমরা ছাড়া? তোমরা তো ব্রহ্ম হয়ে বুড়ি ছুঁয়ে বুড়ি হয়ে বসে আছ।

পুষ্প কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলে—প্রভু, আমাদের একবার সেই সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—না মা। তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করেন না। তবে চলো আমার পূর্বজন্মের আর একটি গুরুভগ্নীর কাছে তোমায় নিয়ে যাবো—তিনিও আজ পর্যন্ত দেহেআছেন। গভীর বনের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকেন—প্রায় সময়ই সমাধিস্থ থাকেন। চলো হে কবি, সমাধি দেখলে তোমার জাত যাবে না—

ক্ষেমদাস বল্লেন—না হে, আমি যাবো না। তুমি এদের নিয়ে যাও—আমার ও ধর্ম নয়। কবির ধর্ম স্বতন্ত্র।

সন্ন্যাসী হেসে এসে ক্ষেমদাসের হাত ধরে বল্লেন—ভগবানের মহিমা সর্বত্র। কেন যাবে না? চলো—

—বেশ, তাহলে তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের আশ্রমে যাবে? যদি শ্রীকৃষ্ণকে দেখাতে পারি সেখানে? প্রেমভক্তি নেবে?

সন্ন্যাসী পুনরায় হেসে বল্লেন—হবে, হবে। আচ্ছা যাবো, কথা দিলাম। প্রেমভক্তি নিই না নিই স্বতন্ত্র কথা। তোমাকেও তো আমি ষট্চক্রভেদ করে অদ্বৈতজ্ঞান পাইয়ে দিচ্চি না জোর করে?

কিছুক্ষণ পরে ওরা সবাই সন্ন্যাসীর পিছু পিছু পৃথিবীর একস্থানে নেমে এল। স্থানটি দেখেই ওরা বুঝলে, লোকালয় থেকে বহু দূরে কোনো এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে। সম্মুখে একটি পার্বত্য নদী, কিন্তু নদীগর্ভে কোথাও মাটি বা বালি নেই—সমস্তটা পাষাণময়, চওড়া সমতল, মসৃণ। প্রায় একশো হাত পরিমিত স্থান কি তার চেয়ে বেশি এমনি আপনা-আপনি পাথর-বাঁধানো। তারই মধ্যভাগ বেয়ে ক্ষুদ্র নদীটি ক্ষুদ্র একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে মর্মর-কলতানে বয়ে চলেচে। উভয় তীরে নিবিড় জঙ্গল, মোটা মোটা লতা এ-গাছ থেকে ও-গাছে দুলচে; গভীর নিশীথকাল পৃথিবীতে, আকাশে ঠিক মাথার ওপরে চাঁদ, গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত অরণ্যভূমি মায়াময় হয়ে উঠেছে।

ওরা মুগ্ধ হয়ে সে অপূর্ব অরণ্য-দৃশ্য দেখচে, এমন সময়ে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন শোনা গেল, দ্বিতীয়বার শোনা গেল আরও নিকটে। যতীন সভয়ে বলে উঠলো—ওই! চলুন পালাই—

অল্প পরেই ওপারের বনের লতাপাতা নিঃশব্দে সরিয়ে প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাঁড়ির মতন মুখ নদীজলে নামতে দেখা গেল এবং তার জল খাওয়ার ‘চক্ চক্’ শব্দ বনের ঝিল্লীরবের সঙ্গে মিলে এই গম্ভীর রহস্যময় রজনীর নৈঃশব্দ মুখর করে তুলতে লাগলো।

পুষ্প বল্লে—ভয় কি যতীনদা তোমার এখন বাঘের?

ক্ষেমদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব শোভাময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন বনকান্তারের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বল্লেন—সুন্দর। সুন্দর! নমস্কার হে ভগবান, ধন্য তুমি, আদি কবি তুমি জগৎস্রষ্টা! কর্ণামৃতে ঠিকই বলেচে:—মধুগন্ধি...

সন্ন্যাসী বল্লেন—ব্রহ্মই জগৎ হয়ে রয়েচেন, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু—তিনিই সর্বত্র। সামনে যা দেখচো, এও তিনি, তাঁর বিশ্বরূপের এক রূপ—তবে অত ভাবুকতা আমাদের আসে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ণনা করা আসে না।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আসবে কি হে! তাহোলে তো তুমি উপনিষদ তৈরি করে বসতে। তোমার সঙ্গে উপনিষদের কবিদের তফাৎ তো সেইখানে। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, আবার কবিও ছিলেন। তোমার মত নীরস ব্রহ্মবিৎ ছিলেন না। ভগবানও কবি। উপনিষদে কি বলেনি তাঁকে, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুঃ?

সন্ন্যাসী বল্লেন—চলো চলো, যে জন্যে এসেচি। উপনিষদে কবি বলেচে যিনি দ্রষ্টা তাঁকে। যিনি প্রজ্ঞার আলোকে এক চমকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দর্শন করেন, চিন্তা দ্বারা যাঁকে বুঝতে হয় না, তিনিই কবি।

যতীন বল্লে—প্রভু, এ কোন্ জায়গা পৃথিবীর?

—এ হোল বাস্তার রাজ্য, মধ্যভারতের। এই নদীর নাম মহানদী, উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়েচে। এখানে নদীর শৈশবব্যবস্থা দেখচ, সবে বেরিয়েচে অদূরবর্তী পাহাড়শ্রেণী থেকে। এখন এসো আমার সঙ্গে—

নদীর ওপারে কিছুদূরে ঘন বনে একটি পর্ণ-কুটিরের কাছে ওরা যেতেই একটি সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন—আসুন আপনারা। আমার বড় সৌভাগ্য আজ—

যতীন ও পুষ্পের মনে হোল তিনি যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখে যতীন অবাক হয়ে গেল, সন্ন্যাসী বলেচেন ওঁর পূর্বজন্মের গুরুভগিনী—অথচ ইনি তো কুড়ি বৎসরের তরুণীর মত সুঠাম, সুরূপা, তন্বী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রূপ যেন ফেটে পড়চে, মাথায় একঢাল কালো চুলের রাশ।

সন্ন্যাসী বল্লেন—ভাল আছ ভগ্নী?

সন্ন্যাসিনী হেসে হিন্দিতে বল্লেন—পরমাত্মা যেমন রেখেচেন। এঁরাও তো দেখচি বিদেহী আত্মা। এঁদের এনেচ কেন?

পুষ্প ও যতীন সন্ন্যাসিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ক্ষেমদাস যুক্তকরে নমস্কার করলেন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এঁরা এসেচেন তোমায় দেখতে। ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আইয়ে মহারাজ, আপকা চরণধূলিসে হামারা আশ্রম পবিত্র হো গিয়া—পরমাত্মাকি কৃপা।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, আপনি দেবী, আপনার দর্শনে আমরা পুণ্যলাভ করলাম।

সন্ন্যাসিনীর সুন্দর মুখের লাবণ্যময় হাসি অরণ্যভূমির জ্যোৎস্নাস্নাত সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। কুটিরের দ্বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এহি নদীমে আজ পূর্ণিমাকী রাতমে স্বর্গসে উতার কর্ অপ্সরীলোগ্ নহ্তে থে। হাম বহুৎ বরষসে দেখতে হেঁ। আপকো মালুম হ্যায়?

ক্ষেমদাস বল্লেন—না মা, আমরা তো জানি না। আমাদের দেখাবেন?

—আপ দেখনে মাংতা?

—হাঁ মা, দেখালেই দেখি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এঁর বয়েস কত বল তো যতীন?

যতীন সঙ্কুচিত ভাবে বল্লে—আমি কি বলবো? দেখে তো মনে হয় কুড়ি-বাইশ।

সন্ন্যাসিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বালিকার মত।

সন্ন্যাসী বল্লেন—তুমি তোমার জ্ঞান-মত বলেচ, তোমার দোষ নেই। তোমার ধারণা নেই এ বিষয়ে।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—তুমি ক্যা বোলতা হ্যায় রে বাচ্চা? হামারা তো এহি আসন পর পঁচিশ বরষ বীত গিয়া—ইসকা পহ্‌লে পঞ্জাবমে রাভি নদীকী তীরমে করিব সত্তর বরষ আসন তা। গুরুজীকা অনুজ্ঞাপর এহি বনমে মহানদীকে কিনারপর আশ্রম বনায়া।

যতীন মনে মনে হিসেব করে বল্লে—তা হোলে আমার প্রপিতামহীর চেয়েও আপনি বড়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—ওঁর বয়েস দেড়শো বছরের কাছাকাছি—বরং কিছু বেশি হবে তো কম নয়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, দেহধারী হয়ে আছেন যে এখনো?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—বহুৎ নেতি ধৌতি কিয়া—ইসিসে শরীর বন্ গিয়া। আভি ধ্বংস নেহি হোগা কোই পান্ ছ' শো বরষ। কোই হরজ নেহি, রহে তো রহে।

যতীন আপন মনে ভাবলে—বাবাঃ, এই দুর্গম বনের মধ্যে উনি একা কি করে থাকেন! বাঘের ভয় করে না? এ তো বাঘের আড্ডা দেখে এলাম।

সন্ন্যাসিনী ওর মন বুঝেই যেন বল্লেন—যখন সমাধিতে থাকি তখন বাঘ আসে, বিষাক্ত সাপ এসে মাথায় ওঠে। গায়ে বেড়ায়। সমাধি ভাঙলে ওদের যাতায়াতের চিহ্নদেখে বুঝতে পারি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আজকাল কি আহার ছেড়েচ?

—না। কন্দমূল খাই, বেলগাছ আছে আশ্রমের পেছনে অনেক, বেল খাই। সামান্যই আহার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তুমিও কি প্রেমভক্তির বিপক্ষে? তুমিও নীরস অদ্বৈতবাদী?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—মাৎ পুছিয়ে। প্রেমভক্তি বহু কৃপাসে লাভ হোতা হ্যায়—হামারা তো তিন যুগ গুজার গিয়া, ও বস্তু নেহি মিলা। কাঁহা মিলেগা বাৎলাইয়ে মহাত্মা কৃপা কর্। আপ দিজিয়ে হাম্‌কো!

ক্ষেমদাস বল্লেন—আমার শক্তি নেই মা। আমি কবি, এই পর্যন্ত। ও সব দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমি নেই। তবে তোমাকে আমি উর্ধ্বলোকে বৈষ্ণবাচার্যদের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারি, তাঁদের কাছে উপদেশ পেতে পারো। তবে দরকার কি মা? তোমরাতো প্রতিক্ষণে সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মকে আস্বাদ করচো—কি হবে প্রেমভক্তি?

—আমার কাছে গৃহস্থদের নানা দেবদেবী আসেন, নানা দেশ থেকে আসেন—একা থাকি বলে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিতে আসেন। লম্বাদামোদর, গোপাল,উগ্রতারা, মৃন্ময়ী, শ্যামরায়, অষ্টভুজা—আরও কত কি নাম। এসে গল্পগুজব করেন, সুখদুঃখের কথা বলেন। সেদিন এক ঠাকুর এসে হাজির আপনাদের বাংলাদেশের মুরশিদাবাদ জেলার কি গ্রাম থেকে—নাম শ্যামসুন্দর। আমায় এসে ছলছল চোখে বল্লেন—যে গ্রামে আছেন, সেখানে নাকি গৃহস্থেরা অনাদর করচে, ঠিকমত ভোগ দিচ্চেনা, খেতে পান না—এই সব। তা আমি বল্লাম—আমার কাছে কেন তুমি? আমি তোমাদের মানিনে। যারা মানে তাদের কাছে গিয়ে প্রকট হও, তোমার নালিশ জানাও, আমাকে বলে কি হবে? বালক বিগ্রহ, ওর চোখে জল দেখে কষ্ট হোল—পাষণ্ডী গৃহস্থেরা কেন সেবা করে না কি জানি। ওই সব দেখে আমার মন কেমন করে, মনে হয় প্রেমভক্তি হোলে এঁদের নিয়ে আনন্দ করতাম।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—মায়া, মায়া, নির্বিকল্প ভূমি থেকে নেমে এসে তুমি আবার ঐ সব মায়িক ঠাকুরদেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাও?

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তোমাকে প্রেমভক্তি দেবার জন্যই ওই সব দেবদেবী আসেন—আরও আসেন তুমি মেয়েমানুষ বলে—হাজার অদ্বৈতবাদী হোলেও এখন তোমাদের মন এই এঁদের মত কঠোর, নীরস, শুষ্ক হয়ে ওঠেনি। তাই তোমার কাছে আসেন, কই এঁর কাছে তো আসেন না? এলে আমল পাবেন না বলেই আসেন না। ভগবানও প্রেম ভক্তির কাঙাল, যে ভক্ত তারই কাছে লোভীর মত ঘোরেন। যে প্রেমভক্তি দিতে পারবে না, তার কাছে তো তিনি—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, তোমার ওই সব অসার, ফাঁকা ভাবুকতাগুলো রাখবে দয়া করে? ওতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে সত্যি বলচি। যত খুশি প্রেমভক্তি বিলোও গিয়ে তোমার সেই বৈষ্ণবাচার্যের আখড়ায়—আমাদের আর শুনিও না—যত খুশি কাব্যরচনা কর বৃন্দাবন আর চাঁদের আলো আর কদম্বমূল নিয়ে সেখানে বসে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাকেও একদিন ভক্তির ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে হে কঠোর জ্ঞান-মার্গী সন্ন্যাসী। আমার নাম যদি ক্ষেমদাস হয়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—আচ্ছা, এখন বন্ধ করো। তুমি আমাকে বলচো নীরস। তোমাকে আমি এমন এক জ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাবো যিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক, জড়বাদী। পঞ্চভূতের বিকারে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েচে বলেন। ঈশ্বর মানেন না, সৃষ্টিকর্তা মানেন না; আত্মাকে বলেন পঞ্চভূতের বিকার, জড়ের ধর্মে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েচে, আপনা-আপনিই একদিন লয় হবে—এই মত পোষণ করেন।

—কে? লোকায়ত দর্শনের কর্তা চার্বাক?

—চার্বাক নন, তাঁর প্রভাবান্বিত কোনো শিষ্য?

—কি অবস্থা লাভ করছেন?

—স্থাণুবৎ অচলাবস্থা। খুব উচ্চস্তরেই আছেন, পুরুষকারের বলে উন্নতভূমি লাভ করেচেন, কিন্তু মুক্তি হয়নি। এর মধ্যে দুবার পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। বলেন, এওজড়ের ধর্ম! মুক্তি বলে কিছু নেই। ঈশ্বর মিথ্যা! কাকে তিনি উপাসনা করবেন? পুনর্জন্মে দুঃখিত নন। জন্মান্তরীণ স্মৃতি জ্বলজ্বল করচে মনে।

—কি অবলম্বনে আছেন?

—জড়ের ধর্ম পরীক্ষা করেন। তরুণ শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন। পৃথিবীতে বহু তরুণদলকে যুগে যুগে প্রভাবান্বিত করচেন জড়ধর্মের একচ্ছত্রত্ব প্রতিপাদনের জন্য। ব্যাসক্তি শূন্য, উদার পুরুষ।

—মৃত্যুর পরে দেহধ্বংসে আত্মা থাকে দেখেও জড়বাদী?

—হাঁ। বলেন, ওটাও জড়ের ধর্ম। গুটিপোকা দেহত্যাগ করে প্রজাপতি হচ্চে এও তো দেখা যায়। আবশ্যক কি ঈশ্বরকে টেনে আনবার?

ক্ষেমদাস কানে আঙুল দিয়ে বল্লেন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, শুনতে নেই এসব কথা।

—কেন শুনতে নেই? এই দ্যাখো তোমাদের অনুদারত্ব। আমরা বলি, ব্রহ্মই জগতের সব হয়ে আছেন। নাস্তিক যিনি তিনি ব্রহ্মের বাইরে নন। ব্রহ্মের মধ্যে থেকে তিনি একথা বলচেন। এমন একদিন আসবে, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করবেন। বাদ পড়বেন না।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আমারও তাই মত।

ক্ষেমদাস অধীরভাবে বল্লেন—বেশ, বেশ। ওসব আলোচনা এখন থাক। চলো যাওয়া যাক্। রাত্রি প্রভাত হয়ে এল—জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে আসচে। ওই শোনোময়ূর ডাকচে বনে।

সন্ন্যাসিনীকে পুনরায় বন্দনা করে সকলে সেই গভীর বন পরিত্যাগ করলেন। কুটিরের আশেপাশে অনেক বন্য দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে। অদূরের শৈলচূড়া শেষরাত্রের হিমবাষ্পে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। বন্য কুক্কুটের রব রজনীর শেষ যাম ঘোষণা করচে।

ক্ষেমদাস আকাশপথে বল্লেন—কি সন্ন্যাসী, যাবে তো রঘুনাথদাসের আশ্রমে?

সন্ন্যাসী রাজী হওয়াতে ওরা চক্ষের নিমেষে বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমের সামনে এসে পড়লো। ওরা সকলে রঘুনাথদাসের আসনের দিকে গেল—পুষ্প গেল গোপাল-বিগ্রহ দেখতে ও তার প্রাণের ব্যথা গোপালের পায়ে নিবেদন করতে। নীল স্ফটিকের অপূর্ব বিগ্রহের মুখে যেন করুণার হাসি লেগেই আছে। পুষ্প বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঐ বিরাট অনন্ত বিশ্ব, আকাশের পটে কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি (বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমে এখন রজনীর প্রথম যাম)—সেই যে সেদিন মহাপুরুষ উপনিষদের বাক্য উচ্চারণ করে শুনিয়েছিলেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে আরও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্বলচে—সব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর, সেই বিরাট দেবতা কেন এখানে ক্ষুদ্র বিগ্রহে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন কিসের টানে কে বলবে?

পুষ্প প্রণাম করলে সাষ্টাঙ্গে। সে বিরাটের কতটুকু ধারণা করতে পারে,মেয়েমানুষ সে। সে অতি ক্ষুদ্র নারী মাত্র। দয়া করে মধুররূপে ধরা না দিলে সে ক্ষীরোদসাগরশায়ী মহাবিষ্ণুর কিংবা তার চেয়েও এককাঠি সরেশ নিরাকার পরব্রহ্মের কি ধারণা করতে সমর্থ? মন্দিরে প্রণাম করে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলে—হে ঠাকুর, আশা বৌদিদিকে কৃপা কর। এবার যতীনদা ও আশার জন্ম তোমার আশীর্বাদে যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আর যেন আশার কুপথে মতি না হয়, হে ঠাকুর। ওর প্রারব্ধ কর্ম এবার যেন ক্ষয় হয়। ওকে দয়া কর।

মন্দিরের নিভৃত কুঞ্জতলে অপূর্ব পুষ্পসুবাস। যেন বহু জাতী, যূথী, মালতী, হেনা, নাগকেশর একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েচে। সন্ন্যাসী ও ক্ষেমদাস শ্বেতপ্রস্তরের চত্বরে বৃক্ষতলে বসে রঘুনাথদাসের সঙ্গে আলোচনা করচেন।

রঘুনাথদাস বলচেন—আপনি আমার বিগ্রহটি দর্শন করে আসুন। আপনার ভক্তি হবে। উনি ভক্তি আকর্ষণ করেন। আপনার আগমনে আমার আশ্রম আজ ধন্য হয়েগেল। কিছুকাল এখানে থাকুন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আপনি মহাপুরুষ, আপনার নিকটে থাকবো এ তো পরম সৌভাগ্য। তবে এবার নয়, আমি ঘুরে আসবো। বিগ্রহ দর্শন করে আসি।

বিগ্রহ দর্শন করে একটু পরেই ফিরলেন। বল্লেন—আপনার বিগ্রহ দেখচি বড় বিপজ্জনক বস্তু—সত্যিই আমাকে উনি আকর্ষণ করছেন। আমায় বল্লেন—আমায় কেমন লাগচে? আমি বল্লাম—আমি তোমাকে মানি না। একরকম জোর করে চলে এসেচি—

বলে আপন মনেই হাসতে লাগলেন।

রঘুনাথদাস বল্লেন—আমার গোপাল আপনার ভক্তি আকর্ষণ করতে চাইচেন। আপনি দেবেন না?

—ক্ষমা করবেন আচার্যদেব। আমার সংশয় যেদিন ছিন্ন হবে সেদিন এসে আপনার আশ্রমে দীক্ষা নেবো প্রেমভক্তির। এখন ওসব আমি পুতুল-পুজোর সমান মনেকরি।

রঘুনাথদাসের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে মৃদুমন্দ হাসি ফুটলো। ঈষৎ দর্পভরে বল্লেন—আমার গোপালের ক্ষমতা থাকে, আপনাকে তিনি ভজাবেন। পুতুল কি কথা বলে? আপনি ব্রহ্মবিৎ, ভেবে দেখুন। আপনার মত ভক্ত উনি চাইচেন। ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এসে ভগবানের লীলাসঙ্গী হয়ে থাকুন।

—আপাতত আমার একটি গুরুভগ্নী প্রেমভক্তির জন্যে ব্যাকুলা। তাকে দিন দয়া করে।

—কোথায়?

—সম্প্রতি দেহে বর্তমান আছেন, মহানদীর তীরের বনমধ্যে তাঁর আসন। পরমাত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েচেন। বহুকাল থেকে দেহধারিণী। আপনি আহ্বান করলে তিনি এখানেই আসবেন।

—আমি অকিঞ্চন। আমার কি সাধ্য প্রেমভক্তি দিই। গোপাল দেবেন—

পুষ্প এই সময়েই হঠাৎ জানু পেতে বসে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বল্লে—ওই সঙ্গে আমাকেও দিন আচার্যদেব। আমার একমাত্র অবলম্বন।

ক্ষেমদাস উৎসাহে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন—সাধু! সাধু!

রঘুনাথ পুষ্পের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—আমি কে মা? গোপালের কাছে চাও। আমি আশীর্বাদ করি তুমি পাবে।

পুষ্প যতীনকে দেখিয়ে বল্লে—একে আশীর্বাদ করুন। ইনি শীঘ্র পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। আদেশ হয়ে গেছে।

রঘুনাথ যতীনের দিকে ভাল করে চেয়ে বল্লেন—পুনর্জন্ম হচ্চে? খুব ভাল। ভগবানে মন যেন থাকে আশীর্বাদ করচি। পুনর্জন্মে ভয় কি, যদি কৃষ্ণপদে মতি থাকে।

যতীন পুষ্প ভিন্ন উপস্থিত সকলের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আবার আপনাদের দেখা ইনি পাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—নিশ্চয়, দেহ অন্তে। আমরা আর কোথায় যাচ্চি।

রঘুনাথ বল্লেন—ইচ্ছা করে প্রভু, আর একবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ভক্তিধর্ম প্রচার করে আসি। জীবের বড় কষ্ট। দেখে শুনে বড় কষ্ট পাই। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন বুঝলে একবার ছেড়ে শতবার যেতে প্রস্তুত আছি। সেদিন মহাপ্রভুকে বলেছিলাম, উনি বল্লেন—এখন পৃথিবীতে অন্যসময় এসেচে, লোকজনের অন্যপ্রকার মতি। এখন আমাদের পূর্বতন পন্থায় কাজ হবে না। গ্রহদেব বৈশ্রবণ এ বিষয়ে সেদিন মহাপ্রভু ও আরও ঊর্ধ্বলোকের কয়েকটি মহাপুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করেচেন! তাঁরা বলেন, পৃথিবী এখনো তৈরি হয়নি। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কয়েকজন শক্তিমান আত্মা পাঠাচ্চেন পৃথিবীতে, এঁরা ধ্বংস ও দুর্দৈব আনবেন পৃথিবীতে গিয়ে। পৃথিবী আলোড়িত হবে—লোকের দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী হবে। ভোগবাদ ও জড়বাদের অবসান না হোলে জীবের মঙ্গল নেই। ঢেলে সাজাতে হবে গোটা পৃথিবীটাকে। আপনিই তো ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

যতীন অসতর্ক মুহূর্তে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কে? ইনি!

ক্ষেমদাস বল্লেন—হাঁ, ইনি। অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, ওঁরা গ্রহদেবের সমান। ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাতে পারেন। ব্রহ্মসূত্রে বলেচে—সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ। মুক্তপুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য সংকল্পমাত্র উদয় হয়।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—ঝোঁকের মাথায় একটু বেশি বল্লে কবি। ভোগমাত্রমেষম্ অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্করাচার্য কি বলেচেন প্রণিদান কর। মুক্তের ভোগ ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি কি তাঁর সমান হয়?

—আমি ঈশ্বরের কথা বলিনি, গ্রহদেবের কথা বলেচি।

—গ্রহদেব শক্তিমান বটে কিন্তু ঈশ্বরের বিনা অনুজ্ঞায় তিনি কিছুই করতে পারেন না।

—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে সমর্থ কি না?

—হ্যাঁ। কিন্তু ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে।

—আপনি?

—না। আমার ওপর সে ভার ন্যস্ত নেই। আমি আদার ব্যাপারী, সৃষ্টি স্থিতির খোঁজে আমার দরকার কি? সৃষ্টি বলচোই বা কাকে? নির্গুণ ব্রহ্ম যখন দেশ ও কালের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন, তখন তাকে বলে সৃষ্টি—ঊর্ণনাভ যেমন নিজের দেহনিঃসৃত রস তন্তুরূপে প্রসারিত করে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—মহাপুরুষ ক্ষেমদাস ঠিকই বলেচেন। আপনি পারেন সব, অসাধারণ শক্তি আপনাদের। সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোনো কাজে আসচে না। ভগবানের দাসভাবে ভক্তভাবে তাঁকে সেবা করে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করুন। কিংবা পৃথিবীর বা অন্য গ্রহলোকের জীবকুলের সেবা করুন। জীবের সেবায় স্বয়ং ভগবান তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে সর্বদা নিযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব?

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে নমস্কার করে বল্লেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

যতীন অবাক হয়ে ভাবলে, এত বড় লোক, কিন্তু কি অদ্ভুত বিনয় এদের। সত্যি, বড় ভাল লাগচে।

ক্ষেমদাস হঠাৎ বলে উঠলেন—বৃন্দাবনে আরতি হচ্চে গোপাল-মন্দিরে। আমি আর থাকতে পারবো না। চল।

আজও পৃথিবীতে সুন্দর জ্যোৎস্না। বৃন্দাবনের বনপথে আলোছায়ার খেলা দেখে ওরা সবাই মুগ্ধ। শহরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, মোটর যাচ্চে ধুলো উড়িয়ে, লোক গিজ্‌গিজ্ করচে। চানাচুরওয়ালা সুর করে মোড়ে দাঁড়িয়ে সওদা ফিরি করচে। গোপালের মন্দিরের আরতির সময়ে কত অশরীরী ভক্ত, কত জ্যোতির্ময় আত্মা সেদিনকার মত মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত। অনেকে স্বর্গীয় পুষ্প বিগ্রহের অঙ্গে বর্ষণ করতে লাগলেন আরতির সময়ে।

পুষ্প চেয়ে দেখতে দেখতে ওঁদের মধ্যে করুণাদেবীকে দেখে চমকে উঠলো। আরও একটি দেবী আছেন ওঁর সঙ্গে। দুজনে মন্দিরের এক কোণে সাধারণ গৃহস্থঘরের নারীদের মত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন করচেন। পুষ্পকে তাঁরা ডাকতেই সে কাছে গেল। পুষ্প দেখলে, অপর দেবীটি তারই পূর্বপরিচিতা প্রণয়দেবী।

প্রণয়দেবী বল্লেন—অনেকদিন তোমায় দেখিনি। আরতি শেষ হয়ে যাক, বাইরে চলো, কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের মনে পড়লো কেবলরাম কুণ্ডুর কথা। প্রণয়দেবীর 'অনেকদিন দেখিনি' এই কথাতে ওর মনে পড়লো। সেই নিম্নস্তরের বিষয়াসক্ত আত্মাকে সে দাদু বলে ডেকেচে। অথচ অনেকদিন তার কাছে যাওয়া হয়নি বটে। তাকে আজ এখুনি বৃন্দাবনে এনে গোপালমন্দিরে আরতি দেখাতে হবে। ধন্য হয়ে যাবে কেবলরাম—স্বর্গমর্তের মিলনদৃশ্য এভাবে দেখার সৌভাগ্য আর তার হবে না।

আচ্ছা, আশা-বৌদিকে আনলে হয় না? ধন্য হয়ে যায়, উদ্ধার হয়ে যায় একদিনে সে।

করুণাদেবীকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে। দেবী বল্লেন—আশার আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনো সুপ্ত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে, দেখেও দেখবে না এ সব। অত সহজে পাপী উদ্ধার হয় না পুষ্প, তাহোলে আমরা বসে থাকতাম না—নরক উজাড় করে পাপী হাজারে হাজারে নিয়ে এসে ফেলতাম।

পুষ্প লজ্জিত হোল।

প্রণয়দেবী বল্লেন—তোমাদের তিনজনের ওপর আমার দৃষ্টি বহু জন্ম আগে থেকে রেখেচি। এখনো অনেক গতাগতি বাকি ওদের দুজনের। পুনর্জন্ম ভিন্ন আশার আত্মা কিছুতেই কর্মক্ষয় করতে পারবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না পুষ্প, যা করবার তিনিই করবেন। আমরা তাঁর দাসী মাত্র।

পুষ্প ওঁদের অনুমতি নিয়ে চক্ষের নিমিষে কেবলরামের স্তরে এসে দেখলে, বৃদ্ধ সেখানে নেই। তবে বোধহয় আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরে ওর ছেলেদের আড়তে গিয়ে বসেচে। কিন্তু একা যেতে পুষ্পের বড় ভয় করে। পৃথিবীর স্থূলস্তরে নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট আত্মাদের উপদ্রব বড় বেশি, এরা অনেক সময় দেহধারী ও বিদেহী

সকলকেই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে ছিল এতক্ষণ, পৃথিবীর হোলেও সে একটা পবিত্র দেবস্থান, ওখানে প্রেতযোনির উপদ্রব খুব কম।

ভগবানের নাম স্মরণ করে সে কুড়ুলে-বিনোদপুরে কুণ্ডুদের গদিতে এসে দেখে বৃদ্ধ কেবলরাম তার বড় ছেলে বিনোদের পাশে হাতবাক্স সামলে বসে আছে। সন্ধ্যার সময়, হাটুরে খরিদ্দারের ভিড় দোকানে। বিনোদের দুই কর্মচারি হেঁকে বলচে—দুজোড়া পুলন শাড়ি, ছ' নং—

বিনোদ খাতায় টুকতে টুকতে মাথা তুলে বলচে—টাকা না লোট্?

খরিদদার বলচে—আজ্ঞে লোট কুণ্ডু মশায়। দুমণ পাট ব্যাচ্‌লাম রাম তেলির আড়তে—সব লোট্ দেলে। লোট্ এখন কনে ভাঙাতি যাই আপনাদের দোকান ছাড়া? বাবু, কিছু কম নেন্ দামটা।

বিনোদের কিছু বলবার পূর্বেই তার পার্শ্বোপবিষ্ট কেবলরাম বলে উঠলো—ওতে লাভ নেই এক পয়সা! তুমি পুরোনো খদ্দের বলে শুধু কেনা-দামে দেওয়া।

পুষ্প বুঝতে পারলে, এ অতি কপটকথা। বৃদ্ধের মন বলচে জোড়াপিছু দেড় টাকা লাভ হয়েচে এই পাড়াগাঁয়ে মূর্খ খদ্দেরের কাছে। এই সময় বিনোদ বল্লে—যাও, দু'আনা কম দাওগে জোড়ায়, তুমি পুরোনো খদ্দের, তোমার সঙ্গে অন্যরকম।

কেবলরাম পুত্রের ওপর চটে উঠে বল্লে—তবেই তুমি ব্যবসা করেচ! খদ্দেরের এক কথায় অমনি জোড়ায় দু'আনা ছাড়!

অবিশ্যি ওর কথা দোকানদার বা খরিদ্দার কেউ শুনতে পেল না! পুষ্প ওর পাশে গিয়ে ডাকলে—ও দাদু। পুষ্পের কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে।পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আচ্ছা, কেন এই সন্ধেবেলা বসে বসে মিথ্যে কথাগুলো বেমালুম কইচ দাদু? ছিঃ—

কেবলরাম অপরাধীর ন্যায় উঠে দাঁড়াল। পুষ্প বল্লে—আবার তুমি এই দোকানে এসে বসে আছ। পৃথিবীর আসক্তি তোমার গেল না? কি হবে তোমার দোকানপসার আর খদ্দেরে? টাকার লাভলোকসানেই বা তোমার কি হবে?

কেবলরাম বিষণ্ণভাবে বল্লে—যাই কোথায় দিদি বলো? এই গদি আর আড়ত ছাড়া গত পঞ্চাশ বছর আর কিছু চিনিনি। কোথাও ভাল লাগে না। এখানটাতে এলে পুরোনো অভ্যেসের বশে আড়তের কাজ করে যাই। নইলে কি করি বলো? তুমিই তো দিদি দর্শন দাওনি কতদিন!

—আচ্ছা এখুনি চলো আমার সঙ্গে...দেরি করো না, বেরিয়ে এসো।

মুহূর্তের মধ্যে কেবলরামকে নিয়ে পুষ্প গোপাল-মন্দিরে এল। ধূপধুনার সুগন্ধি ধূমে মন্দিরের গর্ভগৃহ ভরে গিয়েচে, আরতি তখনো পূর্ববৎ চলচে—পাঁচমিনিটের জন্য মাত্র পুষ্প অনুপস্থিত ছিল। কেবলরাম পুষ্পের কৃপায় সজ্ঞান অবস্থায় আছে, জ্যোতির্ময় মহাপুরুষদের সে দেখে ভয়ে সম্ভ্রমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তির দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলে। আরতির শেষে যখন সবাই মন্দির দ্বারপথে বেরিয়ে আসচে, তখন একজন বিদেহী ভক্ত ক্ষেমদাসকে জিজ্ঞেস করলে—প্রভু, শুনেচি বৃন্দাবনে যমুনাতীরে জ্যোৎস্নারাত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয়—আমি কি দেখতে পাবো? আমি এখানে নতুন এসেচি।

ক্ষেমদাস বল্লেন—আপনি গিয়ে দেখতে পারেন। লোকে দেখে অনেকে, ভাগ্যবান ভক্ত হওয়া চাই।

কেবলরাম অবাক হয়ে পুষ্পকে বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দিদি?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তুমি চিনতে পারলে না? এটা বৃন্দাবন, গোপাল-মন্দির।

পুষ্প বল্লে—আর ইনি বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

কেবলরাম থতমত খেয়ে ক্ষেমদাসের পায়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর করুণাদেবীর সামনে ওকে এনে ফেলতেই ও আরও আড়ষ্ট ও কাঁচুমাচু হয়ে গেল। করুণাদেবী রহস্য করে বল্লেন—তোমার নাতনীর দৌলতে স্বর্গ পাবে তুমি।

কেবলরামের চোখ ধাঁধিয়ে গেল এই দুই দেবীর অপরূপ রূপের জ্যোতিতে। সে হাতজোড় করে বল্লে—স্বর্গ তো এখানে। আমার মত পাপী যে বৃন্দাবনে এসে আরতি দেখেচে, আপনাদের মত দেবী, এঁদের মত মহাপুরুষের দেখা পেয়েচে—আর তো কিছু বাকি নেই স্বর্গের।

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—এখন ছেড়ে দিলে আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরের দোকানে গিয়ে বসবে তো? আর মিথ্যে কথা বলবে!

কেবলরাম জিভ কেটে বল্লে—আর না।

—ঠিক?

—হঠাৎ ছাড়তে পারবো না—মিথ্যে কথা বলে কি হবে। কোথায় যাই বলো তো সন্দেবেলাটা!

—কেন, এই গোপাল-মন্দিরে এসে আরতি দেখবে রোজ। কবি ক্ষেমদাস রোজ এখানে এ-সময় থাকেন, তোমায় যত্ন করবেন দাদু।

—কেউ কিছু বলবে না?

—না, দেবমন্দিরে সবারই অধিকার। যখনই তোমার দেবদর্শনে স্পৃহা জেগেচে, বুঝতে হবে, তখনই তুমি উচ্চতর স্তরের জীব হয়ে যাবে! ইচ্ছামাত্রেই সিদ্ধি। চলো যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে দেখো—

ওরা চীরঘাটের কাছে যমুনার তীরে এসে জ্যোৎস্নালোকে কিছুক্ষণ বসলো। ওদের সঙ্গে সঙ্গে করুণাদেবী ও প্রণয়দেবীও এলেন। কেবলরাম সরল লোক, ওর মনে কেমন একধরনের ভক্তির উদয় হোল। যমুনার দিকে চেয়ে ওর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। করুণাদেবীকে বল্লে—মা, আমার কি পুণ্য ছিল পূর্বজন্মের? বৃন্দাবন, যমুনার তীর, আপনাদের মত দেবীর দেখা পাওয়া—আজ আমার হোল কি তাই ভাবচি।

করুণাদেবী বল্লেন—কেবলরামকে রেখে এস পুষ্প, তারপর আমাদের পৌঁছে দেবে—

পুষ্প হেসে বক্রদৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে চেয়ে বল্লেন—আমি পৌঁছে দেবো আপনাদের! কেন ঠাট্টা করেন বলুন তো!

ফেরবার পথে কেবলরাম বল্লে—তোমায় কি যে বলি দিদি। তুমি সাক্ষাৎ দেবী, নইলে এত দয়া! যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে, আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি নেই সেখানেই যাই। একটা কথা দিদি বলচি। আমার নাতি রামলাল আজ দুবছর হোল এখানে এসেচে পৃথিবী থেকে। তোমায় বলতে লজ্জা হয়, সম্প্রতি রসুলপুরের এক বাগদী মাগীর পিছু পিছু ঘুরচে ছ'মাস। সে যদি জল আনতে যায়, ও তার পিছু পিছু যায়; সে যদি রান্নাঘরে রাঁধে, ও পাশে বসে থাকে। অন্য সময় সেই মাগীর বাড়ির উঠোনে এক তেঁতুলগাছে দ্যাখোদিনরাত বসে। কত ধমক দিলাম—কথা শোনে না। একটা উপায় করো তুমি লক্ষ্মীটি। সে মাগী ওকে দেখতেও পায় না, ওর ঘুরেই সুখ। এ কি বন্ধন বলো দিকি, দিদি? ওই তো নরক। তুমি দেবী, ওকে তুমি বাঁচাও এ নরক থেকে।

গভীর রাত্রিকাল। পুষ্প একা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে দেখা করতে গেল। ওঁকে দেখা পর্যন্ত কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করচে ওঁর প্রতি! না দেখা করে যেন ও থাকতে পারচে না। সন্ন্যাসিনী ওকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন—আপনি সেদিন এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ, মা। আপনার দর্শনে পুণ্য, তাই দেখতে এলাম।

সন্ন্যাসিনীর প্রজ্ঞানেত্র উদ্ভাসিত, সুতরাং পুষ্পকে স্থূল আবরণে নিজ দেহকে আবৃত করতে হয়নি। সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আপনি বিদেহী, পৃথিবীর ফলমূল নিয়েঅতিথি-সৎকার করতে পারলাম না। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে বল্লে—ওকথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মা। আমি কত ক্ষুদ্র।

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—আপনি ক্ষুদ্র কে বল্লে—আপনি এখানে আসবেন আমি সমাধিতে জেনেচি। আপনি আমার প্রেমভক্তি শিক্ষার উপায় করবেন।

পুষ্প সবিস্ময়ে বল্লে—আমি!

—বিশ্বের ভগবান কাকে দিয়ে কি কাজ করান, তা তো বলা যায় না।

—মা, আপনার বাড়ি কোথায় ছিল? পিতামাতা কে ছিলেন? জানবার বড় কৌতূহল হচ্চে।

—আমার দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অল্পবয়সে আমি দীক্ষা নিই, বিবাহ হয়নি, চিরকুমারী। নানাস্থান ঘুরে অযোধ্যায় আসি। সেখানে সে সময়ে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন—সকলে তাঁকে পাগল বাবা বলতো। পাগলের মত থাকতেন। তিনি আমায় দয়া করে যোগদীক্ষা দেন। যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন আপনারা এসেছিলেন, ওঁরও গুরু তিনি।

—তিনি আছেন কোথায় এখন?

—প্রায় পঞ্চাশষাট বছর হোলতিনি দেহ রেখেচেন। তিনি যে কত কালের লোক কেউ জানতো না। আমি কখনো সে প্রশ্ন করিনি। এখন বিদেহী অবস্থায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েচেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে এখনো দেখা দেন। তিনিই বলেছিলেন, তুমি নারী, তোমাকে প্রেমভক্তি শিখতে হবে। অদ্বৈতভূমি থেকে নেমে তোমাকে লীলারস আস্বাদ করতে হবে। তাই অপেক্ষায় আছি। আপনি যে আসবেন তাও তিনি বলেছিলেন।

পুষ্পের চোখ বেয়ে দরদর ধারে জল পড়লো। মনে মনে ভাবলে—ভগবানের কি খেলা! আমার মত নিতান্ত দীনহীনা, অতি সামান্য মেয়েমানুষের ওপর তার কি অসীম অনুগ্রহ। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড, কখনো তো এমনি ভাবিনি।

ও বল্লে—আপনার কাছে সেই ঠাকুরেরা আর এসেছিলেন?

—হ্যাঁ দেখুন, ওই এক কাণ্ড। কেন আমার কাছে? মৃন্ময়ী বলে এক দেবী সেদিন এসেছিলেন। কোন্ গ্রামে ভাঙা মন্দিরে থাকেন—কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। তাঁর সাধ নতুন মন্দিরে কেউ প্রতিষ্ঠিত করে। আমি বল্লাম, কোনো ধনী গৃহস্থকে স্বপ্ন দিন। আমার কি হাত? আমি কি করতে পারি?

—ওদের কি আপনি এমনি স্থূলচক্ষে দেখেন?

—না, সমাধি অবস্থায় দেখা দেন। আমি বলি, আমি তোমাদের মানি না, চলে যাও। ততই আমার কাছে ভিড়। দেখুন তো মুশকিল!

—এও ভগবানের কৌশল আপনাকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার। নীরস অদ্বৈতজ্ঞানী মনকে সরস করবার আয়োজন।

—আমি ওসব মানি না।।

—তবে প্রেমভক্তি কি করে লাভ হবে?

—সাকার উপাসনা মায়িক। যে মৃন্ময়ী দেবীর পূজা করবে, সে দেবীকে নিয়েই মশগুল থাকবে; যে শ্যামসুন্দরের পূজা করবে, সে তাঁর দর্শন পেয়েই খুশি থাকবে। ও সব এক প্রকারের বন্ধন। ওতে বন্ধ হয়ে থাকলে আরও উচ্চভূমিতে উঠে ব্রহ্মদর্শন তার হবে না, নিজের আত্মাকে ব্রহ্মে সে লীন করতেও পারবে না। মায়া তাকে আবদ্ধ করবে।

—আপনি যা জানেন আমি তা জানিনে দেবী। তবে আমি এইটুকু জানি প্রকৃত ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না, ব্রহ্মত্ব চায় না। ভগবানের দাস হয়ে থাকতে চায়, রস আস্বাদ করতে চায়। ভক্তির পথেই সে সমাধিলাভ করে, ব্রহ্মদর্শনও তার হয়। তবে এসব আমার শোনা কথা—আমি অজ্ঞান, কি জানি বলুন। আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলুন, গোবিন্দমন্দিরে আরতির সময় কত ভক্তের দর্শন পাবেন। তাঁরা সব বলে দেবেন।

—যাবো, আমায় নিয়ে যাবেন। একটি গৃহস্থের বৌ আছে, বড় উচ্চ অবস্থা। একপাল ছেলেমেয়ে—ছেলেকে কোলে নিয়ে হয়তো আদর করচে—অমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে। সেদিন আমার কাছে সূক্ষ্মদেহে এসেছিল। সেও প্রেমভক্তি চায়—তাকেও নিয়ে যাবো।

—কি করে বিনা দীক্ষায় এমন উচ্চ অবস্থা পেলে সংসারে থেকে?

—পূর্বজন্মের অবস্থা ভাল ছিল। কর্মবন্ধনে আটকে পড়ে এ জন্মে সংসার করতে হয়েচে। সামান্য কর্ম ছিল, এ জন্মে শেষ হয়ে যাবে। তার বাড়ি এই জঙ্গলের বাইরে এক লোকালয়ে। আহীর জাতের মেয়ে। ওর অবস্থা দেখে আমি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছি। আমার কাছে এসে কত কাঁদে।

পুষ্প বিদায় নিয়ে চলে এল। মানুষেই দেবতা হয়ে গিয়েচে এ যে সে কত প্রত্যক্ষ করলে এই জগতে এসে! যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েচে—সে-ই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েচে, ভগবান তাকেই কৃপা করেচেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হোলে কেউ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মানুষকে দেবত্ব নিয়ে যাবার জন্যে ঊর্ধ্বলোকে কত ব্যবস্থা, কত আগ্রহ। তবুও কেন অন্ধত্ব ঘোচে না মানুষের, কেন রামলালের মত আশা-বৌদিদির মত জীবেরা ভুবর্লোকের অতি স্থূল আসক্তির বন্ধনে দেবত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আছে?

বুড়োশিবতলার ঘাটে যতীন একা চুপ করে বসেছিল। পুষ্পকে দেখে খুব খুশি হোল। বল্লে—যত দেখচি, আমিও অবাক হয়ে যাচ্চি, পুষ্প।আমার চোখ খুলে যাচ্চে। তুই কিছু ভাবিসনে, পৃথিবীতে জন্ম নোব কত বছরের জন্যে? ষাট সত্তর কি আশি? অনন্ত জীবনের তুলনায় কদিন? কিসের জন্য মৃত্যু। সব ছায়া, মায়া—একমাত্র আমি অমর, অনন্ত, শাশ্বত। আমাকে কেউ কোনদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজকালতোর সংসর্গে থেকে আমার চোখ খুলে গিয়েচে।

পুষ্প ওকে রামলালের কথা বল্লে। যতীন সব শুনে হাসতে লাগলো। আজকাল এই শ্রেণীর লোকের জন্যে তার গম্ভীর অনুকম্পা জাগে, পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই তাই এমনি হয়েচে—ওদের দোষ নেই।

পুষ্প বল্লে—তুমি ওর জন্যে কিছু করো। আমি সেখানে যাবো না, গেলেও তার উপকার হবে না। এক মোহ থেকে আর এক মোহে পড়ে যাবে—

—তোর সাহায্য ছাড়া হবে না পুষ্প, আমি অবিশ্যি গিয়ে দেখচি।

যতীন রামলালকে খুঁজে বার করলে। সে একটি নীচজাতীয় মেয়ের বাড়ির উঠানে এসেছিল। মেয়েটি ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানচে। তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়, কালো ও অত্যন্ত কৃশকায়। সম্ভবত মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। মুখখানা নিতান্ত মন্দ নয়, চোখ দুটো বড় বড়—সমস্ত দেহের মধ্যে চোখ দুটোই ভাল।

রামলাল যতীনকে দেখে বল্লে—যতীনদা যে! তোমাকে কে সন্ধান দিলে হে? বুড়োটা নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকতে জ্বালিয়েচে আবার মরেও যে একটু ফুর্তি করবো তার যো নেই। হাড় ভাজা ভাজা করলে। সেদিন এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েছি। বল্লাম—আমি যা ইচ্ছে করবো, তোমার বিষয়ের ভাগ তো পিত্যেশ করিনি যে তোমায় ভয় করবো। এখন আমি স্বাধীন।

যতীন হেসে বল্লে—বুড়োর দোষ নেই। সে তোমার ভালর জন্যেই সন্ধান দিয়েচে। এই ভাবে বাঁশগাছে তেঁতুলগাছে কতদিন কাটাবে?

—দিব্যি আছি। দোহাই তোমার, তুমি আর লেকচার ঝেড়ো না।

—কিন্তু এতে তোমার লাভটা কি? কেন এর পেছনে পেছনে ঘুরচো—

—আমার দেখেই সুখ। ওর নাম সোনামণি। সোনামণি ধান ভানে, আমি ঐ খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; আমতলার পুকুরঘাটে নাইতে যায় একা একা—আমি সঙ্গে যাই, যতক্ষণ না নাওয়া হয়, আমি নোনাগাছে বসে বসে দেখি। রাত্রে ও রাঁধে—আমি রান্নাঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকি। বেশ চমৎকার দেখতে সোনা, অমন চেহারা ভদ্দর-লোকের ঘরে হয় না। শরীরের বাঁধুনি কি!...আমি তো কোনো অনিষ্ট করচিনে কারো, বসে থাকি এই মাত্র।

—নিজের অনিষ্ট নিজেই করচো। ওপরে উঠতে পারবে না। পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

—থাকি থাকবো। বেশ ফুর্তিতেই আছি—আমি ওপরে উঠতে চাইনে, নীচেও নামতে চাইনে। স্বগ্‌গে-টগ্‌গে তোমরা থাকো গিয়ে! আর ওই বুড়োটা যে দোকানের গদিতে বসে আছে দিনরাত, তাতে বুঝি দোষ হয় না? ওটাকে পারো তো তোমাদের স্বগ্‌গে নিয়ে যাও টেনে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও এখানে, বেশ আছি। কেন আর জ্বালাও দাদা, বেঁচে থেকে এমন আনন্দে থাকিনি। বেঁচে থাকতে এমন করলে আমায় ওর স্বামী লাঠি নিয়ে তাড়া করতো—এ বেশ আছি, কেউ টের পায় না।

—চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়, তোমায় নিয়ে যাবো—

—আমায় মাপ করো ভাই। সোনামণিকে ফেলে আমি পাদমেকং ন গচ্ছতি—

—থাক্, আর দেবভাষাকে ধ্বংস করে লাভ নেই! এখন আমার সঙ্গে চলো—যাবে?

রামলাল যতীনের ইঙ্গিতে সোনা বাগ্‌দিনীর বাড়ির উঠোন থেকে অল্পদূরে একটা বাঁশ-ঝাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো।কতদিন পরে শীতের দিনের ঝরা শুকনো বাঁশপাতার ধুলো-ভরা গন্ধ আজ যতীনের নাকে এসে লাগছে। যেন সে দেহেই বেঁচে আছে—পৃথিবী মায়ের বুকের দুলাল। বনমুলোর গাছ কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি—দুচারটে বাঁশঝাড়ের পরেই দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, সবে ধানকাটা হয়ে গিয়েচে অঘ্রাণের শেষে। শুকনো ধানের গোড়া এখনো ক্ষেতের সর্বত্র।

যতীন বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, রামলাল অধীরভাবে বল্লে—কি বলছো বলো যতীনদা।

যতীন বল্লেও কি? আবার ও পাড়ার পুকুরঘাটের দিকে চাইচো কেন? কে আছে ওখানে?

রামলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—নাঃ—বামুনের মেয়ে।

—আবার কি?

—ওই যে সাদা কোঠাবাড়িটা—ওই বাড়ি থেকে রোজ বেরিয়ে পুকুরঘাটে নায়। বামুনবাড়ি।

—তাই হয়েছে কি?

—ষোল সতেরো বছর বয়েস। দেখবে?...এসো, এসো—এতক্ষণ নামচে জলে। নামটি বেশ, সন্ধ্যারানি। ফর্সা, একরাশ চুল, একটু পরে ভিজে কাপড়ে নেয়ে বাড়ি ফিরবে। মুখখানি বড় চমৎকার। ছিপছিপে লিকলিকে সরু বেতের মত হেলে পড়ে। মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করে দাঁতগুলো যখন হাসে। সর্বদাই হাসচে।

—তাতে তোমার কি?

—আমার কিছু না। বামুনের মেয়ে। ওরা মুখুয্যে।

—মরে গিয়েচে, এখন আবার বামুন শুদ্দুরই বা কি? ওতে কি তোমার লাভ?

রামলাল জিভ কেটে দুহাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—বাপ্‌রে! ও কথা বলতে নেই। বামুন জাত! আমরা হলাম তেলী তাম্‌লী। আমি শুধু চোখে দেখেই খুশি। আমার ও সব উঁচু নজর নেই দাদা। সোনামণির হেঁসেলে বসেই আমার সব। ওকে পেয়েই আমার বেশ চলে যাচ্ছে।

—পেলে আর কি করে তা তো বুঝলাম না।

—ওরই নাম পাওয়া। দেহে নেই, কি করবো বলো। সত্যি, একটা কথা দাদা। পৃথিবীতে জন্মাবার কৌশলটা বলে দিতে পারো? দেহ না ধরলে কোনো সুখ নেই। মেয়েদের ভাল করে পাইনি জীবনে। ওদের না পেয়ে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে আমার।

—কেন, তুমি তো বিয়ে করেছিলে?

রামলাল বিরক্তির সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বল্লে—আরে দূর, বিয়ে!—সে ওই বুড়োটার পাল্লায় পড়ে। নাতবৌ-এর মুখ না দেখে নাকি মরবে না! আমার ঘাড়ে যা তা একটা চাপিয়ে দিয়ে বুড়ো তো পটল তুললো। আজকাল কেমন সব স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে দেখিচি কলকাতায়। তাদের শাড়ি পরবার কায়দাই আলাদা। কথাবার্তার ধরনই আলাদা।—না সত্যি যতীনদা, তুমি আমার যথার্থ উপকার করবে, আমায় জন্ম নেওয়ার কৌশলটুকু বলে দাও দাদা। মেয়েমানুষের সঙ্গে দুদিন প্রাণভরে ভালবাসা করে মিলেমিশে আসি দুনিয়াতে ফিরে। আমার বুকের ভেতরটা সর্বদা হু হু করে দাদা। ও জিনিসটা আমি জানিনি—সত্যিকার মেয়েমানুষ পাইনি। স্বগ্‌গে টগ্‌গে তোমরা যাও—আমি তো কারো কোনো অনিষ্ট করতে চাইচি না ভাই। আমার নেয্য অধিকার চাইচি। সবাই দিব্যি কত ফুর্তি করচে—আমি অল্পবয়সে মরে গেলুম, যে বয়সে ভোগ করার কথা সেই বয়সে। আমার একটা হিল্লে করো, তোমার পায়ে পড়ি দাদা। মেয়েমানুষ না পেলে স্বগগে গিয়ে আমার কোনো সুখ হবে না। বুড়োটার সঙ্গে দেখা হোলে তাকেও বোলো। তিনি একা আসেন আমায় উপদেশ দিতে! তুমি জানো, বিয়ের আগে বঙ্কু পালের মেয়ে সরলার সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়েছিল। মেয়েটা কেষ্টনগরে মেয়ে-ইস্কুলে পড়তো। দুবার আমার সঙ্গে লুকিয়ে আলাপ করেছিল! টাকা পাবে না বলে ঐ বুড়ো সেখানে আমার বিয়ে দিতে চাইলে না। সেও দিব্যি মেয়ে ছিল।

—এখন সে কোথায়?

—কেষ্টনগরে বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি থাকে। আমি সেদিন গিয়ে একবার দেখে এসেচি। কষ্ট হয় বলে যাইনে। তার চেয়ে আমার সোনামণিই ভাল। কি চমৎকার একটি তিল ওর নাকের বাঁ-দিকে—দেখনি?...চল্লে?তাহলে—শোনো শোনো—তোমাদের তোঅন্তর্ধান হোতে সময় লাগে না একমিনিটও। এই আছ এই নেই। তোমরা হোলে স্বগ্‌গের মানুষ। তাহলে—আমার একটা উপায়—

যতীন ততক্ষণে বুড়োশিবতলার ঘাটে এসে পৌঁছেচে। পুষ্পের প্রশ্নের উত্তরে বল্লে—হোল না। একেবারে বুভুক্ষু আত্মা। ওকে পুনর্জন্মে পাঠাবার ব্যবস্থা করো পুষ্প। মেয়েমানুষের কথা বলতে অজ্ঞান। ভোগ না করলে ওর নারীতে আসক্তি যাবে না।

পুষ্প হেসে বিজয়িনীর মত দর্পিত সুরে গ্রীবা বাঁকিয়ে বল্লে—স্বর্গে মেয়েমানুষের অভাব? যদি বলো আজই তাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি কাকে মেয়েমানুষ বলে! করুণাদেবীকেও নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—মূর্ছা হয়ে পড়ে যাবে তক্ষুনি।

যতীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর বিদ্যুল্লতার মত অপূর্ব কান্তির দিকে চেয়ে বল্লে—তুমিই যথেষ্ট। আর তাঁকে নিয়ে যেতে হবে কেন। মূর্ছা তো দূরের কথা, একদম পাগল হয়ে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু তার দরকার নেই। বিভ্রান্তি করে দেওয়া হবে, উপকার কিছু হবে না তাতে।

পুষ্প কৃত্রিম রাগের সুরের রেশ তখনো টেনেই বল্লে—না, আমার রাগ হয়েচে শুনে যে, সে মূর্খ বলে স্বর্গে নারী নেই! নারীকে খুঁজতে যেতে হবে পৃথিবীতে।

—তোমরা চোখ ধাঁধিয়ে বেচারীকে পাগল করেই দিতে পারো, কিন্তু সে যা চায় তা দেবে কোথা থেকে? ওকে পাঠিয়ে দাও পৃথিবীতে। একজোড়া আগ্রহভরা কালোভ্রমরচোখের চাউনি ওর দরকার হয়েচে।

—আচ্ছা, যতুদা, আমি যদি ওকে একেবারে আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী করে দিতে পারি?

—জন্ম নেওয়ার পরে?

পুষ্পর হাসি হাসি মুখে বল্লে—হ্যাঁ। নয়তো কি, এখানে?

—কিলিয়ে কাঁটাল পাকানো দরকার কি? আত্মাকে তার স্বাভাবিক পথে তার স্বাভাবিক গতিতে যেতে দাও।

—এই কথাটিই আশা-বৌদির বেলা তুমি এতদিন বুঝতে চাইতে না যতুদা। অপরের বেলাতে বেশ তো বুঝলে।

যতীন চুপ করে রইল।

ওপারের হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে সন্ধ্যার আরতিধ্বনি শোনা গেল। গঙ্গার বুকে সান্ধ্য আকাশের প্রতিচ্ছবি।

সেদিন আশা একা পাথরের ওপরে বসে খুব কাঁদছিল।

একজন বিকটাকৃতি সাধুপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একদিন এই মরুভূমির ও পাহাড়ের দেশে। তিনি ওকে বলেচেন—পৃথিবীর মৃত্যুর পরে সাত লোক, প্রত্যেক লোকে আবার সাতটা স্তর। প্রত্যেক বার মানুষকে মরে নতুন দেহ ধরে নতুন স্তরে জন্ম নিতে হয়—ইত্যাদি। আশার মাথায় ওসব জটিলতা ঢোকে না—এক এক সময়ে সে বেশ বুঝতে পারে সে মরেই গিয়েচে বটে। কিন্তু মরেও তো নিস্তার নেই, দুবার তো মরা যায় না—না হয় আবার চেষ্টা করে দেখতো। কোথায় গেল মা, বাবা, স্বামী, ছেলেমেয়ে—এ কি বিশ্রী জীবন, না আছে আশার আলো, না আছে আনন্দ, না আছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া। কেন মিছে বেঁচে থাকা? অথচ মরতেও তো পারে না। এ কি বন্ধন!

সেই যে একদিন স্বামীকে সে দেখলে, যেন তার পুরোনো শ্বশুরবাড়ির ঘরে সে গেল—কথাবার্তা বল্লে স্বামীর সঙ্গে। কি অদ্ভুত আনন্দে দিনটা কেটেছিল—যত অল্প সময়ের জন্যেই দেখা হোক না কেন। নাঃ—কোথায় কি যে সব হয়ে গেল ওলটপালট। সংসার গেল ভেঙে। সে হোল অল্পবয়সে বিধবা। কত আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে বিয়ের রাত্রে—সব মেয়েই দেখে। কেন তার ভাগ্যে এমন হোল! এই এক জায়গা—এমন ভয়ঙ্কর স্থান সে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে ওর চারিধারে অন্ধকার ঘিরে আসে, মাঝে মাঝে আলো হয়। গাছ নেই পালা নেই—পাথর আর বালি। চারিধারে উঁচু উঁচুপাথরের ঢিবিমত। যতদূর যাও, কেবল এমনি। মানুষ নেই, জন নেই।

মাঝে মাঝে কিন্তু অতি বিকট আকারের দু-একজন লোক দেখা যায়। অসহায় স্ত্রীলোককে একা পেয়ে তাদের মধ্যে দুবার দুজন আক্রমণ করতে ছুটে এসেছিল। একবার সে এক দেবী (—কোথা থেকে এসেছিলেন, তাঁর নাম পুষ্প—বৌদিদি বলে ডেকেছিলেন তার মত সামান্য মেয়েকে—) তাকে উদ্ধার করেন। আর একবার কেউ রক্ষা করতে আসেনি—একা ছুটতে ছুটতে সে এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, যে তার পিছু পিছু ছুটে আসছিল—সে তাকে আর খুঁজে পেলে না।

গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বৌ—একি উৎপাত তার জীবনে!

কি জানি, সেদিন শ্বশুরবাড়িতে কি ভাবে যে সে স্বামীকে দেখেছিল...সেই থেকে তার মন অন্যরকম হয়ে গিয়েচে। কেবলই সাধ হয় আবার সেই শ্বশুরবাড়ির ভাঙা কোঠার ঘরে সে তার ছোট্ট সংসার পাতবে, বাঁশবাগানের দিকের রান্নাঘরটিতে বসে বসে কত কি রান্না করবে। ডাল, মোচার ঘণ্ট, সুক্তুনি (উনি সুক্তুনি বড় ভালবাসেন), কই মাছের ঝোল মানকচু দিয়ে...

উনি এসে বলবেন—কি গো বৌ, রান্না কি হয়ে গেল?

—এসো...হয়েচে। হাত পা ধুয়ে নাও—জল গরম করে রেখেচি। বড্ড শীত আজ।

মাটির প্রদীপ জ্বলচে রান্নাঘরের মেজেতে কাঠের পিলসুজে। তালপাতার চেটাই পেতে স্বামীকে আশা বসতে দিলে। মুখ দেখে মনে হোল উনি খুব ক্ষুধার্ত।—হ্যাঁগা, একটু চা করে দেবো?

—তা দাও, বড্ডই শীত।

—কাপগুলো সব ভেঙে ফেলেচে খোকা। কাঁসার গেলাসে খাও—ওবেলা দুটো কাপ কিনে নিয়ে এসো না গা কুডুলের বাজার থেকে।...চা খেতে খেতে উনি কত রকম মজার গল্প করচেন। সে বসে বসে শুনচে একমনে। সুন্দর দিনগুলি স্বপ্নের মত নেমেছিল তার জীবনে। আনন্দ...অফুরন্ত আনন্দ...সে সতী, পবিত্র, সাধ্বী। স্বামী ছাড়া কাউকে জানে না।

হঠাৎ আশা চমকে উঠলো। সে কার মুখের দিকে চেয়ে আছে? কে তার সামনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করচে? তার স্বামী নয়—এ তো নেত্যনারাণ! কুডুলে-বিনোদপুরের বাড়ি নয়—এ কলকাতার মানিকতলার সেই বাড়িউলি মাসির বাড়ি, সেই রান্নাঘর, তাদের ছোট্ট কুঠুরিটার সামনে ফালিমত রান্নাঘরটা। ওই তো রান্নাঘরে তার হাতে তৈরি সেই দড়ির শিকে, হাঁড়িকুড়ি ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে সে নিজের হাতে ওটা বুনেছিল মনে আছে। ওই তো সেই তাদের ঘরখানা, জানালা দিয়ে একটুখানি দেখা যাচ্চে, মুগের ডালের হাঁড়ি, বিছানার কোণটা।...উঃ! বিছানাটা দেখে ওর গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। এ যে খানিকটা মাত্র আগে সে নিজেকে সতী সাধ্বী, স্বামীঅনুরক্তা, পরম পবিত্রা, আনন্দময়ী রূপে বর্ণনা করে মধুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল,কোথায় গেল ওর সে আত্মপ্রসাদের পবিত্রতা ও নির্ভরশীলতা! সে ঐ বিছানায় একসঙ্গে শোয়নি নেত্যদার সঙ্গে? এই পুরু, ঠোঁটওয়ালা, চোখের কোণে কালি ইন্দ্রিয়াসক্ত নেত্যদা, যার মুখ দিয়ে এই মুহূর্তে এখনি মদের গন্ধবার হচ্চে...যার অত্যাচারে তাকে আফিং খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে মরতে হয়েছিল। ওই তো সেই তক্তাপোশ, যার ওপরে সে ছট্‌ফট্ করেছিল আফিং খেয়ে।

আশা চমকে শিউরে উঠতে নেত্যনারাণ দাঁত বার করে বল্লে—বলি, আর একটু চা দেবে, না একেবারে গরম গরম ভাতই বাড়বে? বড় রাত হয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে চলো শুয়ে পড়া যাক্। যে শীত পড়েচে!

আশা কাঠ হয়ে বসে রইল। এ কোথা থেকে কোথায় সে এসে পড়ল। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস এ!

নেত্যনারাণ বল্লে—সত্যি, আমিও যে দিনকতক তোমায় খুঁজে খুঁজে বেরিয়েচি কত, তারপর—

আশার মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই বেরুলো—কি তারপর?

—তারপর কে যেন টেনে নিয়ে এল আমায় এখানে। উঃ সে কি আকর্ষণ! আমি বলি কোথায় যাচ্চি—তারপরেই দেখি আমি একেবারে বাড়িউলি মাসির বাড়িতে মানিকতলায়। একেবারে তোমার কাছে। চল গিয়ে শুইগে যাই। রাত হোল অনেক।

বিরক্তি, ভয়, হতাশা ও অপবিত্রতার অনুভূতিতে আশার সর্বশরীর যেন জ্বলে উঠলো আগুনের মত। সে যে এইমাত্র তার শ্বশুরবাড়ির সেই পবিত্র কোঠাবাড়িতে তার স্বামীর সঙ্গে ছিল—প্রথম বিবাহিত জীবনের সেই স্মৃতিমধুর রাত্রির ছায়ায়; কেন এই অপবিত্র কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে তার আহ্বান? এ কি নিষ্ঠুরতা।

ও বলে উঠলো—আমি যাবো না। তুমি তো আমায় ফেলে বাড়ি পালিয়েছিলে? কেন আবার এলে তবে? আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাবো না ঘরে।

নেত্যনারাণ ঝাঁঝালো সুরে বল্লে যাবে না শুতে? তবে কি সারারাত এখানে বসে থাকতে হবে নাকি?

—আমি আর মানিকতলায় নেই—আমরা মরে গিয়েচি। তুমি আর আমি দুজনেই। চলে যাও তুমি আমার কাছ থেকে—তুমিও মরে গিয়েচো।

নেত্যনারাণ অবাক হয়ে বল্লে—কি যে বলো তুমি। ঠাট্টা করচো নাকি? এই দ্যাখো সেই মানিকতলায় আমাদের ঘর, চিনতে পারচো না? যাবে কোথায় নিজেদের আস্তানা ছেড়ে? ক্ষেপলে নাকি? চলো—চলো—

আশা কলের পুতুলের মত ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানাটিতে শুয়ে পড়লো। ওর সর্বশরীর ঘৃণায় রি রি করচে, বমি হয়ে যাবে যে এখনি। সমস্ত দেহ মন যেন অপবিত্র হয়ে গিয়েচে ওর, সকালে উঠে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে না এলে এভাব যেন যাবে না। যাবে সে গঙ্গা স্নানে—ভোরে উঠেই যাবে বাড়িউলি মাসিকে নিয়ে।

নেত্যনারাণ ঘরে ঢুকে দোরে খিল বন্ধ করে দিলে।

আশা অসহায় আর্ত সুরে বলে উঠলো—কি! খিল দিলে যে?

নেত্য ওর দিকে চেয়ে কড়া, নীরস কণ্ঠে বলে উঠলো—কী ন্যাকামী করচো সন্ধে থেকে! সরে শোও, ওপাশে যাও!

আশা বিদ্রোহিণীর ভঙ্গিতে বিছানাতে উঠে বসে বল্লে—খিল খুলে দাও বলচি। আমি থাকবো না এ ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো না এক ঘরে—বাড়িউলি মাসির সঙ্গে শোবো—

নেত্যনারাণ ভীষণ রেগে আশার চুলের মুঠি ধরে বিছানায় ঘুরিয়ে ফেলে দিয়ে বাজখাঁই সুরে বল্লে—তোর মেয়েমানুষের না নিকুচি করেচে—ভাল কথার কেউ নও তুমি। যত বলচি রাত হয়েচে শুয়ে পড়। তোর হাড় ভেঙে চূর্ণ করবো বেশি নেকুগিরি যদি করবি। ভুলে গিইচিস নেত্যনারাণকে—হাত ধরে একদিন বেরিয়ে এসেছিলি মনে নেই? সেদিন কে আশ্রয় দিত তোকে, আমি যদি না এখানে আনতাম! কোন্ বাবা ছিল তোর সেদিন?

—খবরদার, বাবা তুলো না বলচি—আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

—তবে রে বেইমান মাগি—তোকে মজা না দেখালে—

কথা শেষ না করেই নেত্যনারাণ আশাকে আতালি-পাতলি কিলচড় মারতে লাগলো। খাট থেকে মেজের ওপর ফেলে দিলে তলপেটে লাথি মেরে।...

কেউ নেই কোনো দিকে। আশা মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, আর্ত অসহায় সুরে—ওর বেদনার্ত পশুর মত চাপা রুদ্ধ চিৎকারে মানিকতলার বাড়িউলি মাসির বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল যেন। কেন এমন হোল? সে যে ভাল হোতে চেয়েছিল, সে যে সব ভুলতে চেয়েছিল, সে যে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল প্রথমযৌবনের বিবাহিত দিনের স্মৃতিমধুর অবকাশে...সেই মাধবী রাত্রির শুভ আহ্বান কেন এ কলঙ্কিত বাড়ির কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে উপপতির নিষ্ঠুর আহ্বানে পরিণত হলো? হা ভগবান।

পরদিন সকালে উঠে আশা ছুট দিলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে।

কেউ ওঠেনি বাড়িতে। বাড়িউলি মাসি ঘুমুচ্চে, পাশের ঘরে পাল মশাই এরা ঘুমুচ্চে...এই ফাঁকে খিল খুলে আশা পালাচ্চে, সুপ্ত কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে। সে কোথায় যাচ্চে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। গতরাত্রির অপবিত্র স্মৃতিতে ওর গা ঘিন ঘিন করচে...না, আর এসব নয়। তাকে ভাল হতে হবে। সে চায় না এ পাপ সঙ্গ। উপপতির আসঙ্গলিপ্সা তার মন থেকে মুছে ধুয়ে গিয়েছে কবে, বমি হয় সে কথা ভাবলে, মরার পরেও যেন গা বমি বমি করে। যতদূর হয় চলে যাবে, গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হবে, এ পাপপুরীর ত্রিসীমানায় আর সে আসবে না। ভগবান তাকে রক্ষা করুন। সে বেঁচে নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে। কলকাতা শহর অনেকদূরে মিলিয়ে গেল।

পৃথিবীর পাপস্মৃতি আর তাকে কষ্ট দেবে না। অনেকদূরে সে চলে এসেচেবাড়িউলি মাসির কাছ থেকে। এ তার শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলিতে সে ফিরে গিয়েচে।

সে যেন তাদের গ্রামে মুখুয্যেদের পুকুরপাড়ে নিতাই ভড়দের বাড়ি নিতাই ভড়ের মেয়ে সুবির সঙ্গে খেলা করতে গিয়েচে। ঐ তাদের পাড়ার পুকুরপাড়ের সেই বড় তেঁতুলগাছটা। ওই নিতাই ভড়ের বাড়ির উঠোনের ধানের গোলা। নিষ্পাপ, সুন্দর শৈশবকাল। এখানে শুধু তার মাকে সে জানে, কোনো স্মৃতি তার মনে নেই—

হেমন্তের প্রথম শিশিরার্দ্র গ্রাম্য মাঠে নব ধান্যগুচ্ছের আন্দোলনের মত তার জীবনের আনন্দে চঞ্চল, ঝরা শিউলিফুলের সুবাস সুরভিত জীবনের অতি মধুর প্রভাত...

—সুবি—ও সুবি—খেলবিনে আজ, বাইরে আয় ভাই—

সুবি বাইরে এসে বল্লে হাসিমুখে—আশাদি, কোথায় ছিলিরে? কদিন খেলতে আসিসনি—

আশা খুশি হোল। এ তার সত্যিকার শৈশব। সে বেঁচে গেল। এই তার সুন্দর, মধুর আশ্রয়। তার মা—এখুনি তার মা ডাকতে আসবে তাকে। খুশির সুরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশা ডাকলে সুবিকে। সুবি ছুটে এল, ওর হাতে একটা পেঁপের ডাল।

—কি হবে রে পেঁপের ডাল?

—বাজাবো। এই দ্যাখ্—

সুবি পেঁপের ডালের ফুটোতে মুখ দিয়ে পোঁ পোঁ করে বাজাতে লাগলো।

আশা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো খুশি হয়ে। কি মজা! কি মজা!

সুবি বললে—চল্ মুখুয্যেদের নন্দিনী দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেচে—দেখে আসি।

—না ভাই, মা বকবে।

—বাড়িতে বলে আয় না? নন্দিনী দিদিকে দেখেই চলে আসবো—

—চল্ তবে। কিন্তু ভাই দেরি করা হবে না—

ওরা কত জায়গায় খেলা করে বেড়ালে। বনমূলো-ফুলের বড়া ভেজে খাওয়ার অভিনয় করলে।

শৈশবের অতিপরিচিত সব খেলার জায়গা। নন্দিনী দিদি কত বড়, ওদের মায়ের বয়সী, ওদের দুজনের আর কি বয়সটা? নদীর ওপর মেঘ আসচে, কতদূর থেকে অকালবর্ষার মেঘ ভেসে আসচে আকাশ ভরে। হেমন্তে কাশ ফুলের শোভা।

সুবি বল্লে—বেলা বেশ হয়েচে—বাড়ি ফিরি—

—হ্যাঁ চল্ ভাই—মা বকবে—

মা তাকে বকবে সে জানে। টক কাঁচা তেঁতুল খাওয়ার জন্যে বকবে, এতক্ষণ বাইরে থাকার জন্যে বকবে। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ওকে খাইয়ে দেবে। উত্তরের ঘরে ওর জন্যে মাদুর পেতে অন্নপূর্ণা দিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। খেয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা দিদির পাশে ও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

সুবি বল্লে—আমাদের বাড়ি দুটি ভাত খাবি আশা?

—দূর, তোরা জেলে। জেলের বাড়ি বুঝি বামুনের মেয়ে খায়?

—নুকিয়ে?

সুবি হাসলে। ওর বড্ড বন্ধু সুবি। কষ্ট হয় সুবির মনে দুঃখু দিতে। তবু সে বল্লে—নানা ভাই সুবি, কিছু মনে করিস্ নি। আমার বাড়িতে ভাত তো হয়েইচে—

—বড়ি-ভাতে ভাত খাবিনি আমার সঙ্গে?মা নতুন বড়ি দিয়েচে—

—দূর, বড়ি বুঝি এখন দেয়? বড়ি দেয় সেই মাঘ মাসে। নতুন কুমড়ো নতুন কলাই-এর ডাল উঠলে। মিথ্যে কথা বলিস্নি সুবি।

—মিথ্যে বলিনি। পুরোনো ডালের বুঝি বড়ি হয় না? চল আমার সঙ্গে—

আশা বাড়ি ফিরচে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েচে। মুখুয্যেদের পুকুরঘাটে আর কেউ নাইচে না, সবাই নেয়ে বাড়ি চলে গিয়েচে। তেঁতুলের ডালে মোটা মোটা কাঁচা তেঁতুল ঝুলচে দেখে ওর জিবে জল এল।

দুটো তেঁতুল পাড়লে হোত। কিন্তু কি করে পাড়ে?সুবিকে বল্লে হোত, সে অনেক রকম বুদ্ধি ধরে, একটা কিছু উপায় করতে পারতো।

পুকুরপাড়েই সরু রাস্তা ধরে খানিকদূর গিয়ে ওদের বাড়ি। সারি সারি পেঁপে গাছ। একটা ধানের গোলা। তাদের মুচিপাড়ার ধানের ক্ষেত থেকে বছরের ধান এসে গোলা ভর্তি হয়। এখুনি সব চোখে পড়বে।

কিন্তু একটু যেন অন্যরকম।

পেঁপে গাছের সারি নেই। ধানের গোলা নেই। তাদের বাড়ির চটা-ওঠা ভাঙা পাঁচিলটা নেই। এ কোথায় সে যাচ্ছে? তাদের বাড়িটা নয়। আতঙ্কে ওর বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে লাগলো। বাড়িউলি মাসির বাড়ির সেই দোরটা। মানিকতলার বাড়িউলি মাসি। আশা চিৎকার করে পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই নেত্যনারাণ দোর খুলে বের হয়ে এসে বল্লে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ চাঁদ? কাল দু'এক ঘা দিয়েছিলাম বলে রাগ হয়েচে বুঝি?

তারপরেই সে আশার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে ইতরের ভঙ্গিতে গাইলে তুড়ি দিতে দিতে—

দুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না?

একঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি, প্রাণ, হয় না?

দুটো কথা কি—

এসো এসো শোবে এসো—বেলা হয়ে গিয়েচে।

ব্যাধবিদ্ধা হরিণীর মত আশা ছটফট করতে লাগলো নেত্যনারাণের হাতে।

তারপর সে দুম দুম করে নিষ্ঠুরভাবে মাথা কুটতে লাগলো ঘরের চৌকাঠে। সে আজ মরে যাবে। এ কলঙ্কিত জীবন সে রাখতে চায় না। ব্যথা লাগচে, রক্তারক্তি হচ্চে—কিন্তু সে মরতে পারবে না। সে অমর। অনন্ত কাল ধরে সে মাথা কুটলেও মরবে না।

নেত্যনারাণ তাকে হাত ধরে ওঠাতে লাগলো। বলতে লাগলো—কি পাগলামি করো, ক্ষেপলে নাকি? চলো শুই গিয়ে—

সন্ধ্যাবেলা উনুনে আঁচ দিয়েচে ঘরে ঘরে। নেত্যনারাণ বাড়ি নেই, কোথায় গিয়েচে। ও এসে বাড়িউলি মাসির দরজায় দাঁড়ালো। কোথায় সে পালাবে তাই ভাবচে। এ কি ভয়ানক নাগপাশের বন্ধনে তাকে পড়তে হয়েচে। আর সে এ বাড়িতে থাকতে পারবে না। ঐ ঘরে কত রাত্রে কত কুলবধূর জীবন কলঙ্কিত হয়েচে। তারপর ঐ ঘরের ঐ তক্তপোশে বিষ খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার সে শোচনীয় মৃত্যু! আবার সে বেরিয়ে পড়লো।

এই কলকাতা শহরের সর্বত্র তার স্মৃতির বিষ ছড়ানো। কালীঘাট? কালীঘাটে কি করে যাবে, নেত্যদা সেখানেও একবার তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিষ ছড়িয়ে এসেচে। আবার সে ছুটে চলে যাবে কুড়ুলে-বিনোদপুরে স্বামীর ঘরে। সেখানে যেতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু একদিন কেমন করে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল—সেইদিন গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার পথ সে জানে না। চিনে আজ আর যেতে পারবে না। ভুলে গিয়েচে সে পথটা।

তার এক সই-এর বাড়ি আছে সুবর্ণপুর। সেখানকার রজনী ডাক্তারের মেয়ে। কুমারীজীবনের বন্ধু। রজনী ডাক্তারের বাড়ির পাশে ছিল ওর বড়দিদির শ্বশুরবাড়ি, যে বড়দিদি বিধবা হয়ে ইদানীং ওদের সংসারে ছিলেন।

জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দিদির ওখানে বেড়াতে গিয়ে সুবর্ণপুরে রজনী ডাক্তারের মেয়ে বীণার সঙ্গে আলাপ হয়।

তাদের কাঁটাল তলায় দুর্গাপিঁড়ি পাতা দেখে আশা বলতো—ভাই সই, কাঁটালতলায় দুর্গাপিঁড়ি কেন?

বীণা বলতো—দুর্গাপিঁড়ি ঘরে তুলতে নেই আমাদের। বাপঠাকুরদার আমল থেকে কাঁটালতলাতেই থাকে—

সই-এর বিয়ে হয়েছিল কাঁচরাপাড়ার কাছে বাগ বলে গ্রামে। বাগের দত্তদের বাড়ি, তারা ওখানকার নাম-করা জমিদার। সই যদি তাকে আশ্রয় দেয়, সেই পবিত্র কুমারী-জীবনে সে লুকুতে পারে! কলকাতার বাড়িউলি মাসির বাড়ি থেকে সে চলে যাবে সোজা—সুবর্ণপুর গ্রামের সেই কাঁটালতলায়, যেখানে সইদের দুর্গাপিঁড়ি পাতা থাকে সারা বছর।

উনুনের আঁচের ধোঁয়ায় অন্ধকারে অস্পষ্ট সিঁড়ির পথ বেয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। কি জানি কেন, বাড়িটা থেকে সামান্য একটু দূরে চলে এলেও সে নিজেকে পবিত্র মনে করে। মনের সব গ্লানি কেটে যায়....সে নির্মল, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আত্মা...এতটুকু পাপের বা মলিনতার ছোঁয়া লাগেনি তার সারা দেহমনে।

হঠাৎ কেমন করে সে রজনী ডাক্তারের কোঠাবাড়িটার উঠোনে নিজেকে দেখতে পেলে। সেই কাঁটালতলায়।

—ও সই!

—ও মা—কত কাল পরে এলি তুই? ভাল আছিস্ সই?

বীণার বিয়ে হয়নি, সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বীণা এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে কত আদরে।

আশা আনন্দে ও উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলো। বীণাকে বল্লে—সই, তুমি আমাকে ধরে রাখ্ ভাই। কোথাও যেতে দিস্ নি।

—না, থাক্ এখানে। কোথাও যেতে দেবো না—

—ভাই, এ সত্য না স্বপ্ন?

—কেন রে?

—আজকাল আমার কি যে হয়েচে, কোন্টা স্বপ্ন, কোন্টা সত্যি বুঝতে পারিনে। দুটোতে কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েচে।

—না ভাই। ওই সেই দুর্গাপিঁড়ি-পাতা কাঁটালতলা। আমাদের ইতুপুজোর ঘট ওখানে সাজানো আছে। এখন সন্দেহ গেল রাজকুমারী?

ঠাট্টা করিস্নি। আমার ভয়-ভয় করে সর্বদা। কি হয়েচে আমায় বলতে পারিস?

—তোর মাথা হয়েচে। নে, আয় দুটো মুড়ি আর ফুট্-কলাই ভাজা খা। তুই ভালবাসিস—মনে আছে?

—খুব।

সারাদিন দুই সই-এ কত গল্পগুজব কতকাল পরে। সব ভুলে গিয়েচে আশা—সে পবিত্র, পবিত্র। সামনে তার সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। সই-এর সঙ্গে গল্পে কত ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন স্বপ্ন আঁকে সে রজনী ডাক্তারের বাগানের বাতাবীলেবুতলার ছায়ায় বসে। শ্বশুরবাড়ি হবে পাড়াগাঁয়ে বড় গেরস্থ ঘরে, আট দশটা ধানের গোলা থাকবে বাড়িতে, সে বাড়ির বৌ-হিসেবে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাবে গোলার সামনে বেদীতে...ধান মেপে মেপে গোলায় তুলবে। স্বামী হবে উকিল বা ডাক্তার। সারাদিন পরে খেটেখুটে এসে বলবে—ও বড়-বৌ—আলো দেখাও—

বীণা হাসে। সেও তার মনের কথা বলে।

গ্রামের একটি ছেলেকে সে ভালবাসে। যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়—

ও সব কথা কেন? ও কথা সে শুনতে আসেনি। তবুও সে জিজ্ঞেস করলে কে ভাই ছেলেটি?

—ব্রাহ্মণ। সত্যনারাণ চাটুয্যের মেজছেলে। তাকে দেখাবো একদিন।

যতক্ষণ সে সই-এর বাড়ি রইল, সে হয়ে গেল একেবারে ঠিক তেরো চোদ্দ বছরের সরলা মেয়েটি। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল। কাঁটালতলায় ছায়া পড়লো, রাঙা রোদএকটু একটু দেখা যায় গাছের তলায়। এ সময়ে আশাকে বাড়ি ফিরতে হবেই।

সইকে বল্লে—আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে চল্ না আমাদের বাড়ি পর্যন্ত সই?

—চল্, এগিয়ে দিয়ে আসি—

বাঁশবাগানের তলা দিয়ে অন্ধকার সন্ধ্যার পথে দুই সই-এ চলেচে। ওই জামাইবাবুদের বাড়িটা। বড়দি এতক্ষণ চা করে নিয়ে বসে আছে ওর জন্যে।

বীণা বল্লে—ওই তোদের বাড়ির দরজাটা—আমি চলি সই। এর পরে একলা যেতে পারবো না—

বীণা চলে গেল অন্ধকার বাঁশবনের পথটা দিয়ে একা একা। আশা সই-এর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে রইল—তারপর যখন আর দেখা গেল না তখন সামনের দিকে চেয়েই ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠলো...কি ওখানে?

ও চিৎকার করে ডাক দিলে—ও সই—ও বড়দি—

ওর সামনে বাড়িউলি মাসির দরজা, যে দরজাটা খুলে সকালে আজই পালিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে। ওর চিৎকার শুনে দরজাটা খুলে নেত্যনারাণ দুপাটি দাঁত বের করেএগিয়ে এসে বল্লে—বাপরে! কি তোমার কাণ্ড! কোথায় গিয়েছিলে সারাদিন?...

তার পর ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলে—চলো, চলো, রাত হয়ে গিয়েচে— শোবে এসো, শোবে এসো..

কতকাল যে কেটে গেল মানিকতলার বাড়িউলি মাসির সেই বাড়িটাতে। তার কোনো হিসেব নেই, কোনো লেখাজোখা নেই—আশার মনে হয় বাল্যকাল থেকে তার বিবাহের সময়, তারপর তার সমস্ত বিবাহিতা জীবন নিয়ে যতটা সময়ের অভিজ্ঞতাতার আছে—তেমনি কত বাল্যজীবন, কত বিবাহিত জীবন, কত বৈধব্যজীবন এবং কত মানিকতলার জীবন তার কেটে গেল—সে কিন্তু সেই এক ভাবেই রইল একই জায়গার স্থাণুবৎ অচল।

নেত্যদা তাকে ছাড়ে না। কতবার সে পালিয়ে গিয়েচে—জীবনের কত জানা অজানা কোণে। কত বছরের ব্যবধান রচনা করচে সে বর্তমান জীবনের ও সেই সব অতীত দিনের শান্তি ও পবিত্রতামণ্ডিত অবকাশের।

কিন্তু কোনো ব্যবধান টেঁকে না।

সব এসে মিশে যায় বর্তমানের এই কলকাতা মানিকতলা বাড়িউলি মাসির বাড়ির দরজায় এই ঘরটাতে, ওই তক্তপোশটাতে।

এখন যেন তার মনে হয়—এসব যা ঘটেচে, এ আসল নয়, সব যেন আবাস্তব, স্বপ্নবৎ...এ সব ছায়াবাজি...জীবনটাই যেন একটা মস্ত ছায়াবাজি হয়ে গেল তার...

সই, মা, ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে-মেয়ে কিছুই নিত্য নয় তার জীবনে...আসে আবার চলে যায়...বাড়িউলি মাসির এ বাড়িটাই কি এদের মধ্যে একমাত্র সত্যি? আর নেত্যদা, আর এই সরু রান্নাঘরটা...আর ওই ছোট ঘরের ছোট তক্তপোশটা? এর কি কোনো শেষ হবে না, এ দিনের এই সব টিকে থেকে যাবে চিরকাল?

কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা স্বপ্ন আজকাল সে বুঝতে পারে না। যেটাকে সত্যি ভেবেহয়তো আঁকড়াতে যায়—সেটাই মিথ্যে হয়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। আর কি কোনো রোগ হোল?এমন সাধের, এমন আদরের, এমন আশা-আনন্দের জীবনের শেষকালে এ কি ঘটলো? কোথায় চলে গেল স্বামী, কোথায় গেল বাপের ভিটে, শ্বশুরের ভিটে? এ কি-ভাবে পাগল বা বুদ্ধিহীন কিংবা রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে পড়ে রইল?

নেত্যনারাণ এসে বল্লে—রান্না করবে না আজ? বসে আছ যে—

—আমি জানিনে। তুমি আমায় বিরক্ত করতে এসো না।

—কেন, আজ আবার রাজরাণীর কি মেজাজ হোল?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে—

নেত্যনারাণ ওর কাছে এসে বল্লে—বড্ড ঠাট্টা কর তুমি মাঝে মাঝে। কোথায় যাই বল তো? এখন আমি চলে গেলে তুমি খাবে কি? রূপের ব্যবসা যে খুলবে, সে আর হবে না। আয়নাতে চেহারাখানা দেখেচো এদানিং?

আবার কি-সব যাচ্ছেতাই কথা। অনবরত অপবিত্র অশ্লীল ধরনের এই সব কথা কেন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বদা শুনতে হয়। ও ভেবে ভেবে বল্লে—আমরা তো মরে গিয়েচি—খাবার আর দরকার কি?

নেত্যনারাণ ওর দিকে চেয়ে বল্লে—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তবে খাচ্চ কেন? রোজ রোজ রান্নাবান্না করচো কেন? বাজার করচি কেন?

—কেউ খাচ্চে না। কেউ বাজার করচে না। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন!

কিন্তু নেত্যনারাণের চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি এত অকপট যে, নিজের বিবেচনার ওপর আশা আস্থা হারালে। নিজে যা বলতে চাইছিল, শেষ করতে পারলে না। মিনতির সুরে বল্লে—আচ্ছা নেত্যদা, তোমার কি মনে হয়? এমন কেন হচ্চে বলতে পারো? এ সব কি? সত্যি না স্বপ্ন?

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—তাই বলে কি তোমার বিশ্বাস?

—নইলে আবোল-তাবোল বকবে কেন? স্বপ্ন কিসের? আমি রইচি, আমি হাটবাজার করচি, খাচ্চি দাচ্চি—সব স্বপ্ন হোল কি ভাবে? এই ঘরবাড়ি দেখতে পাচ্চ না?—বাড়িউলি মাসি, ও বাড়িউলি মাসি—শুনে যাও এদিকে। কি বলচে শোনো ও!

বাড়িউলি মাসি বল্লে—কি গা?

—ও বলচে এ সব নাকি মিথ্যে। তুমি, ঘরবাড়ি, এই বিছানা—সব স্বপ্ন।

—কি জানি বাপু, ও সব তোমরা বসে বসে ভাবো। আমাদের খেটে খেতে হয়, শখের ভাবনা ভাববার সময় নেই। বেলা হোল দুপুর, উনুনে আঁচ পড়েনি। পালেদের বৌ সেই কোন্‌ সকালে একবাটি চা খাইয়েছিল ডেকে। যাই—

নেত্য ওর দিকে চেয়ে বল্লে—শুনলে?

আশা বোকার মত শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে হতাশ ভাবে বলে—কি জানি বাপু; আমার যেন এক এক সময় মনে হয় এ সব স্বপ্ন দেখচি তুমি আর আমি। এ ঘর নেই, বাড়িনেই, খাট নেই, বিছানা নেই—ওই রাস্তা, লোকচলাচল সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন, কেবল তুমি আর আমি আছি—আর এই যে সব দেখচি সব স্বপ্ন দেখচি আমরা দুজনে।

—বা রে, বাড়িউলি মাসি এলো, কথা বলে গেল, ও-ও কিছু নয়?

পরে বিভ্রান্তকে বোঝাবার সুরে সদয়ভাবে বল্লে—ও সব তোমার মাথার ভুল। সব সত্যি—দেখচো না বাড়িউলি মাসি এসে কি বলে গেল। একবার তোমাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়াতে হবে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হচ্ছে না, না কি?

আশা বল্লে—তবে মাঝে মাঝে পাই আবার হারাই কেন?

অনেকটা অন্যমনস্ক সুরে কথাটা বলে ফেলেই ও চাপতে চেষ্টা করলে। বল্লে—কি জানি, যা বলচো, তাই বোধ হয় হবে। আচ্ছা আমরা এখানে কতকাল থাকবো? চলে যাবো এখান থেকে।

—কেন যাবো? বেশ আছি।

—আমাকে আমার গাঁয়ে রেখে এসো—লক্ষ্মীটি?...

নেত্য রেগে উঠে বল্লে—মেরে হাড় গুঁড়ো করবো। সেই শম্ভু বাঁদরটার জন্যে মন কেমন করচে বুঝি? আমি সব জানি।

—না না, সত্যি না নেত্যদা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগচে না। ভয় হচ্চে। মনে হচ্চে যেন একটা জায়গায় এসে পড়েছি, এখান থেকে বেরুবার পথ নেই। এই ছোট্ট ঘরটা, ওই তক্তপোশটা...এ বাড়ির যেন চারিদিকে দেয়াল দিয়ে আমাদের কে আটকেচে। এখান থেকে কেউ বেরুতে দেবে না। এ সবও সত্যি নয়, এ সব মিথ্যে, সব ছায়াবাজি। যা এই সব দেখচি না?...সব ভুল।

নেত্য ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—আবার আবোল-তাবোল বকুনি? মাথা কি একেবারে গেল?

আশা আপন মনেই বলে যাচ্ছিল—এ থেকে তোমার আমার কোনোদিন উদ্ধার নেই। জাননা, আমি অনেক চেষ্টা করেচি পালাবার, বাইরে যাবার। কিন্তু পারিনি—কে আবার এই সবের মধ্যে আমায় এনে ফেলেচে। অথচ আমি চাই উদ্ধার পেতে এ সব থেকে, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে—যেখানে এসব নেই। কেন পারিনে জানো? অনেক চেষ্টা করেচি আমি পালাবার—পারিনি।

আশা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো। নেত্য না বোঝার দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল উদ্বিগ্নভাবে।

নেত্য নানারকম অত্যাচার শুরু করলো ক্রমে ক্রমে আশার ওপর। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে, মারধর তো করেই। বাড়িউলি মাসি যোগ দিয়েচে নেত্যদার দিকে। ওকে বলে—বল্লুম, এক মাড়োয়ারি বাবু জুটিয়ে দিচ্ছি—তা হোল না। লোকে কি যার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গেই ঘর করে চিরকাল? কত দেখনু আমার এ বয়সে। ওই যে পাশের বাড়ির বিন্দি, আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, তা কই এখন? কোথায়গেল সে রসের নাগর দেওর? নোয়াওলা খোট্টা বাবু রাখেনি ওকে? কেমন ছাপর খাট, গদি, এক পিরুস্তত রূপোর বাসন! দুপয়সা গুছিয়েচে—

কি ঝকমারি করেচে আশা। এই কথাবার্তা তার গায়ে ছুঁচের মত বেঁধে আজকাল। কেউ ভাল কথা যদি বলতো দুটো এখানে। কালি ঢেলে ঢেলে তার সারা গায়ে কালি মাখিয়ে দেয় এরা।

কিন্তু কাটলো বহুকাল। অনেক দিন, বৎসর, মাস—অনেক জীবন, জন্ম মৃত্যু যেন জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। সত্যিতে স্বপ্নতে জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। এমন শক্ত হয়ে পাক জড়িয়ে গিয়েচে এবং আরও যাচ্চে দিন দিন যে, কেউ খুলতে পারবে না। একদিন সে আফিং আনিয়ে নিল পালেদের ছেলের হাত দিয়ে। সেদিন নেত্যনারাণ কোথায় বেরিয়েচে—ভালই হয়েচে, একেবারে সব যন্ত্রণার অবসান সে আজ করবে। ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল আফিং খেয়ে—তারপর ক্রমে ঝিমিয়ে পড়লো। পেটে কোথায় যেন ভীষণ বেদনা করচে...সব যন্ত্রণার আজ একেবারে শেষ হবে। সকলের মুখে অশ্লীল কথা শুনতে হবে না। কিন্তু কোথা থেকে নেত্যনারাণ ফিরে এসে ওর ঘরের দোর ভেঙে খিল খুলে ওর মাথার চুল ধরে সারা বারান্দা হাঁটিয়ে বেড়াতে লাগলো। কিছুতেই ওকে বসতে দেয় না, গালে চড় মারে—বলে—বসতে চাও? ন্যাকামি করে আবার আফিং খাওয়া হয়েচে—ওঠো বেঁচে, তারপর তোমার হাড় আর মাস—

বাড়িউলি মাসি কোন্ ফাঁকে কাছে এসে চুপি চুপি বলে—বন্ধু বাপু, দিব্যি মাতোয়ারি বাবু জুটিয়ে দিচ্চি। অমন কত হচ্চে আজকাল। কেন মিছিমিছি আফিং খেয়ে কষ্ট পাওয়া?...দিব্যি সুখে থাকবে। ওই পাশের বাড়ির বিন্দি। ছাপর খাট, কলের গান বাসনকোসন। ও যে আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল—

ওর মন আর পারে না। অবসন্ন, ক্লান্ত মন যেন বলে ওঠে—ভগবান, আমি আর পারিনে। আমায় বাঁচাও—এ থেকে উদ্ধার করো—

কে যেন ওর কথা শোনে। আশার স্বপ্নাচ্ছন্ন, অবসন্ন মন বোঝে না কে সে। অনেক দূরের, অনেক আকাশের পারের কোন দেশ থেকে সে যেন উড়ে আসে পাখায় ভর করে। একবার আশার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী, মহিমময়ী দেবীমূর্তি ভেসে ওঠে। বরাভয়করা স্মিতহাস্যমধুরা...অপরূপ রূপসী জ্যোতির্ময়ী নারী। আর মনে আছে এক সাদা বড় পাহাড়ের ছবি, সবাই মিলে, তাকে ছুঁড়ে যেন সেই সাদা পাহাড় থেকে বহুদূরে নীচের দিকে ফেলে দিচ্চে।

দেবী যেন হাসিমুখে বল্লেন—যাও, ভাল হও—ভুল আর কোরো না।

কে যেন প্রশ্ন করলে—আশা-বৌদি স্বামীর সঙ্গে মিলবে কি করে? ও তো সব ভুলে যাবে।

দেবী বল্লেন—আমি সব মিলিয়ে দিই। ওরা তো নতুন মানুষ হয়ে চললো, ওদের সাধ্য কি?

তারপর গভীর অতলস্পর্শ অন্ধকার ও বিস্মৃতি। অন্ধকার...অন্ধকার।

পুষ্প একদিন এই নির্জন গ্রহটিতে একা গেল। ওর বড় কৌতূহল হয়েছিল বনকান্তার, অরণ্যানী ও শৈলমালায় পরিপূর্ণ ওই ছায়াভরা গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে।

এবারও রাত্রি নেমেচে গ্রহটিতে।

জীবকুল সুপ্ত। অপূর্ব সুন্দর দেশ। বোধহয় ঐ গ্রহে তখন বসন্ত ঋতু। সেই দিক্-দিশাহীন অরণ্যে কান্তারে নাম-না-জানা কত কি বন-কুসুম-সুবাস। বনে বনে ছাওয়া সারা দেশ। বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেঁকে এসে ওর সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না পড়েচে। নৈশ পক্ষীকুলের ক্বচিৎ পক্ষ-বিধূনন।

গ্রহের দিক্‌বিদিক সে চেনে না। পৃথিবীতে গেলে তবে উত্তর দক্ষিণ দিক বুঝতে পারে। এ গ্রহের লোকে কাকে কোন্ দিক বলে কে জানে? কিন্তু এর মাঝামাঝি থেকে একটু বাঁ দিকে ঘেঁষে এক উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী বহুদূর ব্যেপে চলে গিয়েচে, অনেক ছোট বড় নদী এই শৈলগাত্র থেকে নেমে চলেচে নীচেকার বনাবৃত উপত্যকায়। দু-একটি বড় জলপ্রপাত বনের মধ্যে।

ওর আকাশে বাতাসে বনে বনানীতে কেমন একটি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আনন্দ। এর বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে নেবে, সে-ই যেন হয়ে উঠবে আনন্দময় ব্রহ্মদর্শী ভক্ত, ধীরও নির্লোভ, তৃষ্ণাহীন ও উদার। এর বনতলে জীবের অমরত্বের কথা লেখা আছে,লেখা আছে এ বাণী যে এই বনতলে তাঁর আসন পাতা। উচ্চ জগৎ বটে।

হঠাৎ ও দেখলে একটি বনপাদপের তলে শিলাসনে স্বয়ং কবি ক্ষেমদাস বসে।

ও দেখে বড় খুশি হয়ে কাছে গেল। ক্ষেমদাস বল্লেন—এসো এসো, যিনি আদি কবি, বিশ্বস্রষ্টা, তাঁর বিষয়ে আমি কবিতা রচনা করচি।

—আপনি এ গ্রহ জানেন?

—কেন জানবো না? এ রকম একটা নয়—দীর্ঘ বনফুলের মালার মত একসারি গ্রহ আছে বিশ্বেরএ অংশে। আমি জানি। তবে এখানে আসতে হয় যখন এ গ্রহে রাত্রি।

কেন?

—এখানকার লোক উচ্চশ্রেণীর জীব। ওরা আমাদের দেখতে পাবে দিনের আলোয়। এখন ওরা সুপ্ত। বোসো ওই শিলাসনে। বেশ লাগে এখানে। লোকালয় এ গ্রহে খুব কম। বনে হিংস্র জন্তু নেই। কেমন নীল জ্যোৎস্না পড়েচে দেখেচো? বড় ভালবাসি এ দেশ।

—আপনি এখানে আসেন কেন?

—একটি তরুণ কবি আছে এ গ্রহে, তাকে প্রেরণা দিই। ভগবদ্ভক্ত। এই শিলাসনেই সে খানিক আগেও বসে ছিল। প্রতি রাত্রে নির্জনে এসে বসে। সৃষ্টির এ সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে। ওই তার উপাসনা। তুমি জানো আমারও ওই পথ। তাই তার পাশে এসে দাঁড়াই।

—তিনি দেখতে পান আপনাকে?

—না। আমাকে বা তোমাকে দেখতে পাবে না। তোমার সঙ্গী যতীনকে দেখতে পেতো। সে এখন কত বড় ছেলে।

পুষ্প সলজ্জভাবে বল্লে—ন'বছরের বালক।

ক্ষেমদাস হেসে বললেন—আবার নব জন্মলীলা। বেশ লাগে আমার। আবার মাতৃক্রোড়ে যাপিত শৈশব। চমৎকার!

পুষ্প হেসে বল্লে—সন্ন্যাসী এখানে উপস্থিত থাকলে আপনার কথা মেনেনিতেন?

—জানি, সে বলে বার বার দেহ ধারণ করা মুক্তির পথে বাধা। সে বলে, ও থেকে উদ্ধার নেই। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি, চক্রপথে উদ্দেশ্যহীন গতাগতি। সেই একই লোভ, তৃষ্ণা, অহঙ্কার নিয়ে বারবার অসার জন্ম ও মরণ।এই তো?

—কথাটা কি মিথ্যে?

—না। মানি। কিন্তু সে কাদের পক্ষে? যারা জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পায়নি বা ভগবানের দিকে চৈতন্য প্রসারিত করেনি তাদের পক্ষে। যারা জানে না স্থূল দেহের পরিণাম ধূমভস্ম নয়, জন্মের পূর্বেও সে ছিল, মৃত্যুর পরেও সে থাকবে, ভূলোকে শুধু নয়, ব্রহ্ম থেকে জীবে নেমে আসতে যে সাতটি চৈতন্যের স্তর আছে, এই সাত স্তরের প্রত্যেকটি স্তরে এক একটি লোক, সে এই সব লোকেরই উত্তরাধিকারী, ভগবানের সে লীলা-সহচর। যারা এ কথা জানে না, জানবার চেষ্টা করে না, জেনেও গ্রহণ করে না বিষয়ের মোহে—তাদের পক্ষে সন্ন্যাসীর কথা পরম সত্য। কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

পুষ্প একমনে শুনছিল। এই পবিত্র গ্রহের তপোবনসদৃশ অরণ্যকান্তারে এ দেশের ঋষিকবিরা যেখানে নিদ্রাহীন গভীর রাত্রে ভগবানের স্তবগাথা রচনা করেন—এ গ্রহের উপনিষদ জন্ম লাভ করে তাঁদের হাতে—এই স্থানই ক্ষেমদাসের উপদেশ উচ্চারিত হবার উপযুক্ত বটে। পুষ্প ব্যগ্রসুরে বল্লে—বলুন, দেব, বলুন—

ক্ষেমদাস আবার বল্লেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—যে তাঁকে জেনেচে সে দেহধারণ করেও মুক্ত, যেমন দেখেছিলে সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতাকে, বন-মধ্যস্থ সেই সন্ন্যাসীকে। যাঁদের চৈতন্য জাগ্রত হয়েচে, দেহ থেকেও তাঁর জীবমুক্ত। ভগবানকে যারা ভালবাসে মনপ্রাণ দিয়ে, দেহধারণ করেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। তাঁরা জানেন এই বিশ্বের সমস্ত গ্রহ, সব তারা, সব বসন্ত, সব জীবলোক আমার। আমি এদের মাধুর্য উপভোগ করবো। তাঁর সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে যাবো। আমি তাঁর চারণ-কবি। আমি ছাড়া কে গান গাইবে এই বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য-শিল্পের? তাঁর গান গেয়েই যুগে যুগে অমর অজর হয়ে আমি বেঁচে থাকবো। শত জন্মের মধ্যেও যদি তাঁর সেবা করে যাই আর আসি আমার তাতে ক্ষতি কিসের?

ক্ষেমদাস চুপ করলেন।

পুষ্প বল্লে—এ দেশের সেই কবিকে দেখা যায় না?

—এতক্ষণ সে ছিল এখানেই। সেও ভগবানের চারণ-কবি। এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের সে স্তবগীতি রচনা করে। সে এখন ঘুমিয়েচে।

—বিবাহিত?

—এ দেশের নিয়ম বুঝি না। স্ত্রীলোকদের অদ্ভুত স্বাধীনতা এখানে। তারা যার ঘরে যতদিন ইচ্ছা থাকে। আবার যেখানে সত্যকার প্রেম আছে, সেখানে পৃথিবীর স্বামী-স্ত্রীর মত আজীবন বাস করে। আমাদের কবির সঙ্গে তিন-চারটি নারী থাকে—কিন্তু তার কেউই পৃথিবীর তুলনায় সুন্দরী নয়। এদেশের মেয়েরা সুশ্রী নয়। অবশ্য নারী তিনটির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক জানি না। এদেশে হয়তো তাতে দোষ হয় না। যে দেশেরযে নিয়ম।

ওরা কিছুদুর গিয়ে দেখতে পেলে বনের মধ্যে গাছতলাতে দু-তিনটি লোক নিদ্রিত। ক্ষেমদাস বল্লেন—ওই দ্যাখো কবি শুয়ে। ঐ পাশেই তিনটি নারী।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—গাছতলাতে কেন সবাই?

—এখানে লোকের ঘরবাড়ি নেই পৃথিবীর মত। ওদের দেহ অন্য ভাবে তৈরি। রোগ নেই এখানে, হিংস্র জন্তু বা সর্প নেই। দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। অল্প আয়ু বলে ঘরবাড়ি করে না কেউ।

—তবে মরে কিসে?

—এদের স্বেচ্ছামৃত্যু। জ্ঞানীও নিস্পৃহ আত্মা কিনা! নির্দিষ্ট সময় অন্তে যেদিন হয় এরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হবে। মন যেদিন এদের তৈরি হবে সেদিন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে। মৃত্যুতে এরা শোক করে না। এরা জানে মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র।

—পুনর্জন্ম?

—এখানে যারা জন্ম নেয়, তারা অনেক জন্ম ঘুরে এসেছে। পৃথিবীতে বহু জন্ম কেটেচে এদের। শেষ জন্ম এখানে কাটায়। তার পরেই মহর্লোকে চলে যায় একেবারে, আর ফেরে না। কিন্তু তুমি একটা কথা বোধ হয় জানো না—পৃথিবীর চেয়ে নিকৃষ্টতর গ্রহও অনেক আছে। নিম্ন শ্রেণীর আত্মাদের পুনর্জন্ম অনেক সময়ই নিকৃষ্ট ইতরলোকে হয়।

—সে সব স্থান কি রকম?

—একটাতে তোমাকে এখুনি নিয়ে যেতে পারি। চোখেই দেখবে, না কানে শুনবে? তবে একটা কথা। সে সব দেখে কষ্ট পাবে। মেয়েমানুষ তুমি, সে সব গ্রহলোক দেখলে তোমার মনে হবে ভগবান বড় নিষ্ঠুর।

চক্ষের পলকে ওরা একস্থানে এসে পৌঁছলো। সে স্থানটির সর্বত্র উষর মরুভূমি ও কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর স্তূপ। কিন্তু সে স্তূপ প্রস্তর নয়—তা কি, পুষ্প জানে না। উলঙ্গ বিকট-দর্শন অর্ধমনুষ্যাকৃতি জীব দু'একজনকে সেই কৃষ্ণবস্তু স্তূপের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। মাঝে মাঝে তারা উঠে মাটির মধ্যে হাত দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কি বার করচে ও পরম লোলুপতার সঙ্গে মুখে পুরচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—চলো এখান থেকে। ওরা কীটপতঙ্গ খুঁজে যাচ্চে। ওই ওদের আহার। ওই ওদের আহার সংগ্রহ রীতি। একজনের বস্তুস্তূপে আর একটা জীব যদি আসে, তবে দুই জীবে মারামারি করবে। এ ওকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। এ জগতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, সেবা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা, সংগীত কিছু নেই। আছে কেবল দুর্দান্ত আহার-প্রচেষ্টা। জীবে জীবে কলহ।

পুষ্প বল্লে—চলুন এখান থেকে। হাঁপ লাগছে। কি জড় পদার্থে গড়া এ দেশ, প্রাণ যেন কেমন করে উঠলো। এও কি ভগবানের রাজ্য? উঃ—

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—এখনো দেখোনি। চলো আরও দেখাই—এর চেয়েও ভয়ানক স্থান দেখবে। যেখানে পিতামাতা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ পর্যন্ত নেই। যেখানে—না সে তোমাকে বলব না।

পুষ্প অধীর ভাবে বল্লে—কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন? উঃ—বলেই সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। হাত জোড় করে বল্লে—আমার একমাত্র সম্বন্ধ ভগবানে ভক্তি, আর আমার কিছু নেই জীবনে। দেব, দয়া করে সেটুকুও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না—কৃপা করুন—আমি নিতান্ত অভাগিনী!

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—পাগল! সেই অনন্ত মহাশক্তির এক দিকই কেবল দেখবে? রুদ্রদেবের বাম মুখ দেখলেই ভক্তি চটে যাবে অত ঠুনকো ভক্তি তোমার অন্তত সাজে না। তুমি আমি তার উদ্দেশ্যের কতটুকু বুঝি? চলো ফিরি। ওই জন্য আনতে চাইনি তোমাকে এখানে। এতেই এই, এর চেয়েও নিকৃষ্ট লোকে নিয়ে গেলে—

—না দেব। আমায় পৃথিবীতে অন্তত নিয়ে চলুন। আমাদের পৃথিবীতে—চলুন গঙ্গাতীরে—

মহাশূন্য বেয়ে সেই মুহূর্তে ওরা এসে পৃথিবীতে একস্থানে বৃক্ষতলে দাঁড়ালো। বর্ষাকাল পৃথিবীতে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্চে। স্থানটা পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েচে বৃষ্টির ধারায়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—নিয়ে এলাম গঙ্গাতীরে। ওই অদূরে গঙ্গা—

—এটা কোন্ স্থান?

—হরিদ্বার।

পুষ্পের চোখ জুড়িয়ে গেল ধারামুখর অপরাহ্নের বহুপরিচিত, অতি প্রিয় শোভায়। তার মন বলে উঠলো— এই তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বর্গ। ভগবান এখানে কত ফুলে ফলে নিজেকে ধরা দেন, কত জ্যোৎস্নার আলোয়, কত অসহায় শিশুর হাসিতে। আজ চিনলাম তোমায় ভাল করে, আমাদের মাটির স্বর্গকে, আর চিনলাম মানুষকে। মানুষই মাটি দিয়ে গড়া দেবতা—দুদিন পরে সত্যিকার দেবতা হয়ে যাবে। জয় নীলারণ্য-কুন্তলা, অতল-সাগর-মেখলা চিরন্তনী সুন্দরী পৃথিবীর। জয় জয় মানুষের। জয় বেণুরব-শিহরিতা দিগন্তলীন-প্রান্তর-শোভিতা ভূতধাত্রী মাতার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—এবার তোমার মন শান্ত হয়েছে। বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।এখন একটা কথা বলি। কি দেখে অস্থির হয়ে উঠলে?

পুষ্প সলজ্জ হেসে চুপ করে রইল। ক্ষেমদাস বল্লেন—না, বলো, বলতেই হবে। ভগবান কি নিষ্ঠুর—এই ভেবেছিলে। না?

—হাঁ!

—তিনি কি নিষ্ঠুর—ওঃ! এই তো?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে নির্বাক।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমার মত মেয়েরও বিস্মৃতি? তোমারও ভুল? একেই বলে মোহিনীমায়া। মায়ায় কে না ভোলে। ব্রহ্মা বিষ্ণু তলিয়ে যান।

—কেন দেব, বলুন!

—না, তাই দেখচি। নতুবা তোমারও ভুল।

—থাক্ আমার ব্যাখ্যা। আমি তৃণের চেয়েও হীন। আপনি কি উপদেশ করচেন তাই করুন না?

ক্ষেমদাস হাসিমুখে বল্লেন—ভগবান কার উপর নিষ্ঠুর হবেন? সবই তো তিনি। নিজেই নিজের লীলায় তন্ময় হয়ে আছেন বিভিন্ন রূপে। তিনিই সব। সে জ্ঞান যেদিন হবে সেদিন ওই নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট জীব দেখেও বলে উঠবে আনন্দে—তেজো যৎতে কল্যাণতমং তত্তে পস্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি—

ক্ষেমদাস চলে গেলেন। যাবার সময় বল্লেন—বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি। তোমার সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা করবো—একদিন চলো সেই সন্ন্যাসিনীর কাছে যাবো।

পুষ্প স্থির ভাবে বসে রইল শৈলশিখরে। এখানে তার যতুদা আছে, কত জন্মের প্রিয় সাথী সে। তাকে ফেলে কোথায় কোন্ লোকে গিয়ে সুখ পাবে সে? একটি গোয়ালার মেয়ে দুধ দুয়ে নিয়ে আসচে বাজারে। নরনারী প্রদীপ ভাসাচ্চে গঙ্গাবক্ষে। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্চে জলের ওপর।

বুড়োশিবতলার পুরানো ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে পালতোলা নৌকোর দল চলেচে। গোধূলির আব্ছায়া আকাশে শুভ্রপক্ষ বকের দল উড়ে চলেচে ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটের দিকে। প্রাচীন দেউলমন্দিরের চূড়া সান্ধ্য দিগন্তের বননীলরেখায় এখানে ওখানে যেন মিশে আছে।

পুষ্প ঘাটের রানায় বসে ক্ষেমদাসের সঙ্গে কথা বলছিল।

ক্ষেমদাস বৃন্দাবন থেকে এইমাত্র ফিরেচেন। জ্যোৎস্নারাত্রে যমুনাতীরে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন চীরঘাটের কাছে। আরতি দর্শন করবার পরে। মন ভূমানন্দে বিভোর।

পুষ্প বল্লে—কবি, স্ফটিকের কথা কি বলছিলেন?

ক্ষেমদাস গঙ্গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, রাঙা আকাশের ছায়া পড়েচে জলে। জল যদি ঘোলা হোত, আকাশের ছায়া পড়তো না। স্ফটিককে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হতে হবে, তবে আলো তার মধ্যে দিয়ে আসবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আত্মাতে যদি এতটুকু ত্রুটি থাকে কোথাও, তবে ভগবানের আলো তার মনে নামে না। সম্পূর্ণ নির্মল স্ফটিক হওয়া চাই এতটুকু খুঁৎ থাকলে চলবে না।

—ভগবানের দাবি এত বেশি কেন?

—উপায় নেই। ভগবানের আলো যদি মনের দর্পণে ঠিক অখণ্ড ভাবে পেতে কেউ চায়, তার জন্যে এই ব্যবস্থা। লোকে মুখে বলে সাধুতা ও পবিত্রতার কথা। কিন্তু জেনো এ দুটি বস্তু অতি ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

পুষ্প বল্লে—বুঝতে পারচি কিছু কিছু। নিজের জীবনে দেখচিনে কি? তবুও বলুন।

—সাধুতা, পবিত্রতা—শুনতে খুব ভলো। কিন্তু এদের আবির্ভাব বিষয়ী লোকের পক্ষে কষ্টকর। কামনাকলুষিত আধারে ভগবানের জ্যোতি অবতরণ করবে কি ভাবে? এজন্যে আধার-শুদ্ধির প্রয়োজন। যাকে ভগবান কৃপা করেন, শুদ্ধ আধার করে নিতে তার সব কিছু ভোগ কামনার জিনিস ধ্বংস করে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেন। ভগবানের কৃপা সেখানে বজ্রের মত কঠোর, নির্মম, ভয়ঙ্কর। সর্বনাশের মূর্তি ধরে তা আসে জীবনে, ধ্বংসের মূর্তিতে নামে। সে রকম কৃপার বেগ সামলাতে পারে কজন?

পুষ্প চুপ করে রইল। এর সত্যতা সে নিজের জীবনে বুঝেচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—দ্যাখো, আমি ভক্তিপথের পথিক, তুমি জানো। সন্ন্যাসী যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথাবলে, তাঁকে বুঝতে হোলে জ্ঞানের পথ দরকার। জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। আমি সাকারের উপাসক, মধুর ভাবে মধুর মূর্তিতে তাঁকে পেতে চাই—তাই আমি বৃন্দাবন গিয়ে সেই রস আস্বাদ করি। সন্ন্যাসী বলে, ও অপ্রাকৃত মূর্তির উপাসনা কর কেন? আমি বলি, তোমার নিয়ে তুমি থাকো, আমার নিয়ে আমি থাকি। ও বলে, ব্রহ্ম আবর্তিত হতে হতে জীব হয়েচে, জীব হয়ে স্বরূপ ভুলে গিয়েচে। ব্রহ্ম দেশ-কালের মধ্যে ধরা দিয়ে জীব হয়েচে। কেন হয়েচে? লীলা। আমি বলি, বেশ, এক যখন বহু হয়েচেন লীলার আনন্দকে আস্বাদ করতে, তখন আমিও তাঁর লীলাসহচর তো? আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর লীলা চলে না। এই তো প্রেমভক্তি এসে গেল। কেমন?

পুষ্প বল্লে—বনের সেই সন্ন্যাসিনী কিন্তু প্রেমভক্তির কাঙাল। আমি সেবার রঘুনাথদাসের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই থেকে গোপালবিগ্রহের ভক্ত হয়ে উঠেচেন।

—সে যে মেয়েমানুষ। শুষ্ক জ্ঞানপথে সে তৃপ্তি পায় না—লীলারস আস্বাদ করতে চায়। আমি চল্লাম খুকি, তুমি আজ তো বৃন্দাবনে গেলে না, কাল এসে নিয়ে যাবো। সন্ন্যাসী তোমাকেও কি বলেছিল না?

—বলেছিলেন, এখনো অপ্রাকৃত লোক আঁকড়ে আছ কেন? তোমার তো উচ্চ অবস্থা, উচ্চস্তরে চলো।

পৃথিবীর হিসেবে আজ কয়েক বছর হোল পুষ্প এই স্বরচিত বুড়োশিবতলারঘাটে সম্পূর্ণ একা। করুণাদেবীও ওকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তত উচ্চস্তরে গমন করলে আর সে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে পারবে না বলেই এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ—তার মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক—লোকাতীত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক। কোথাও পোষাবে না তার। সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই প্রাচীন ভাঙা ঘাটটি।

কেউ নেই আজ এখানে।

যতীনদা, চলে গিয়েচে আজ দশটি বছর।...

ঊর্ধ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়—আজ এতকাল পরে তার কাছে শূন্য অর্থহীন!

এক এক সময়ে মনে হয় সেই ভ্রাম্যমাণ বহূদক দেবতা যদি আসেন! তার মুখে বহু জগতের, বহু নক্ষত্রলোকের, বহু বিশ্বের গল্প শোনে। নিজে তিনি বেড়িয়ে দেখেচেন, এখনো দেখচেন—শেষ করতে পারেন নি।

সন্ন্যাসী এসে প্রায়ই বলেন—মহর্লোকে তোমার আসন, এখানে কি নিয়ে পড়ে আছ কন্যে? সেই পৃথিবীর গঙ্গা, পৃথিবীর হালিসহর সাগঞ্জ, নৌকো—এসব মায়িক কল্পনা তোমার সাজে না। ছি ছি—

পুষ্প সকৌতুকে বলেছিল—নিয়ে যান না তার চেয়ে উচ্চতর লোকে, যাচ্চি এখনি।

সন্ন্যাসী বলেন—জ্ঞান থাকবে না বেশিক্ষণ। কারণ এসব লোক আত্মিক অবস্থা মাত্র। কোনো স্থান নয়। সে উচ্চতর চৈতন্য জাগ্রত হোলে পৃথিবীতে জড়দেহধারী হলেও তুমি সত্যলোকের অধিবাসী। যেমন দেখেচিলে আমার সেই গুরুভ্রাতাকে। চিদানন্দময় আত্মা সেখানে আপনার অস্তিত্বের আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে গাঁথা। মুখে বলা যায় না সে অনুভূতির কথা।

পুষ্প বল্লে—বুঝবার ক্ষমতা নেই আমার দেব। তবে শুনলাম বটে। আপনার দয়া।

—বিধাতৃপুরুষদেরও উচ্চস্তরের দেবতাদের দেখা পাওয়ার জন্যে তপস্যা করতে হয় জানো তো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাতজন বিধাতৃপুরুষ আছেন, এঁদের ওপর ঈশ্বর। বিধাতৃপুরুষেরা ইচ্ছা করলেই ভগবানের লোকে যেতে পারেন না—গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এজন্যে তপস্যা দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হয়—তবে সেই সাময়িক তপস্যার সাময়িক শক্তি নিয়ে ঈশ্বর সমীপে যেতে পারেন। অথচ বিধাতৃপুরুষেরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন।

—ভগবান তবে কি করচেন, তিনি কি ঠুঁটো জগন্নাথ?

—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্চে, কন্যে। একটা তৃণও নড়ে না তাঁর ইচ্ছা না হোলে।

—তিনি দয়ালু? ডাকলে সাড়া দেন?

—এখনো এ সন্দেহ? এইজন্যে আমি বলি, প্রার্থনা কোরো না তাঁর কাছে কিছু। প্রার্থনা করলেই তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি পরম করুণাময়। জীবের দুঃখ দেখে থাকতেপারেন না। হয়তো এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করে বসলে, যা মঞ্জুর হোলে তোমার আত্মার অমঙ্গল। এইজন্যে কিছু চাইতে নেই তাঁর কাছে—তিনি আমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু করে যাচ্চেন বা বিধাতৃপুরুষদের কর্মে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। এইজন্যে অনেক সময় ভগবানকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। জীবের কল্যাণের জন্যে তিনি ব্যবস্থা করচেন, আমাদের তা মনঃপূত হচ্চে না।

—ক্ষেমদাস তাই বলেন।

—কে? আমাদের কবি? ওর কথা বাদ দাও। আজ এত বছরেও ওর ভাবালুতা ওকে ছেলেবেলার ওপরে উঠতেই দিলে না! গোপাল আর বৃন্দাবন, আর আরতি, আর চোখের জল—আর চাঁদের আলো...

সন্ন্যাসী সেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পুষ্পের হাসি পায় ওঁর সব কথা ভেবে। মেয়েমানুষের মনের কথা এরা কি করে জানবে? শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মা ওরা—ব্রহ্মের মত হয়ে গিয়েচে। শত স্নেহ প্রেম প্রীতির বাঁধনে যে মেয়েমানুষের মন বাঁধা। এও সেই বিধাতৃপুরুষদেরই গড়া নিয়ম তো, সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

পৃথিবীতে কি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে?

পুষ্প একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর পৃথিবীর সন্ধ্যায় দেহ মিলিয়ে নেমে এল কোলা-বলরামপুর গ্রামে। যতীনের মা রান্নাঘরের মধ্যে ভাত চড়িয়ে উনুনের পাশে বসে আলুবেগুন কুটচে। সে আর ঠিক তরুণী নয় এখন, বিগত-যৌবনের চিহ্ন সারা দেহে পরিস্ফুট। নতুন ধান এসেচে সামনের উঠানে, শীতের সন্ধ্যা, পাশের বাড়ির আমতলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগুন জ্বেলে পোয়াচ্চে।

যতীনের মা রান্নাঘর থেকে বল্লে—ও অভয়—কোথায় গেলি?

পাশের বাড়ির আমতলায় যে সব ছেলেমেয়ে আগুন পোয়াচ্চে, তাদের ভেতর থেকে একটি আট-ন' বছরের বালক উত্তর দিলে—কেন, কি হয়েচে?

—ঠাণ্ডা লাগাস নি বাইরে। ঘরের মধ্যে আয়।

বালকের এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সমবয়সীদের মজলিস ছেড়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকতে। সে বল্লে—আমি বাইরে বসে ধান চৌকি দিচ্চি যে—

—না, তোমায় ধানচৌকি দিতে হবে না। চলে আয় ঘরে। এই উনুনের পাড়ে বসে আগুন পোয়া। ছেলের লেগেই আছে সর্দি কাশি—আবার রাত পজ্জন্ত বাইরে বসে থাকা—

আর একটি ছেলে ওকে বল্লে—যা, কাকিমা বকবে—

অভয় মুখ ভার করে মায়ের কাছে উনুনের পাশে এসে বসলো। ওর মা বল্লে—সেই গরম জামাটা আজ গায়ে দিস্ নি?

—আহা হা—সে তো ছেঁড়া!

—তা হোক, নিয়ে আয়, বড্ড শীত পড়েচে।

—না মা।

অভয়ের মা ছেলের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বল্লে—তোমার একগুঁয়েমিগিরি ঘুচিয়ে দেবো আমি একেবারে। দুষ্টু ছেলে—এখুনি বলবেন, মা আমার জ্বর এয়েছে—তখন নিয়ে এসো সাবু, নিয়ে এসো ওষুধ—যা নিয়ে আয় জামা, মাঝের ঘরের আনলায় আছে—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—ও যতুদা, কেমন মজা? এ আমি নয় যে একগুঁয়েমি করে নিস্তার পাবে—

পুষ্প এই সময়টা মাঝে মাঝে এখানে এসে কাটায়। অভয়ের মা ছেলেকে খাওয়ায়, কাছে বসে পড়ায়—প্রথমভাগ, ধারাপাত—পুষ্প বসে বসে দেখে। বেশ লাগে ওর।

স্বপ্নের মত মনে হয় সংসারের জীবনমৃত্যু...সন্ন্যাসীই জ্ঞানী, সব মায়া আর স্বপ্ন।

আশা-বৌদিকেও একদিন সে দেখে এসেচে। সে এখন বহু দূর মুরশিদাবাদ জেলায় এক মাঝারি গোছের গেরস্তবাড়ির ছোট একবছরের খুকি।

সে করুণাদেবীকে বলেছিল সেদিন—এরা মিলবে কি করে দেবী? কি করেজানবে এরা?

দেবী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ওদের সাধ্য কি? আমরা সে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবো সময় এলে। দেখতেই পাবি পুষ্প।

অভয়ের মা ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে পাশের ঘরে ঘুমুতে পাঠায়। পুষ্প এসে সেই সময় খোকার শিয়রে এসে বল্লে—খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও—দুষ্টুমি করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো?

অভয় ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো এক একদিন কোনো রূপসী দেবীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের মত স্নেহে তার শিয়রে বসে ঘুম পাড়াচ্চে। মায়ের মতই বলে মনে হয় তাকে।

নৈশ আকাশ দিয়ে তারপর পুষ্প উড়ে চলে যায় তার নিজ লোকে। অগণ্য জ্যোতিমণ্ডল অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাব্যোমে সর্বত্র ছড়িয়ে—অগণ্য জীবকুল, অগণ্য জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ।

পুষ্পের মন বলে ওঠে—কোথায় আছ হে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, মহাদেবতা, মুখের আবরণ অপসারণ কর—অপাবৃণু, অপাবৃণু, আমরা তোমার স্বরূপ দেখি—ধন্য কর আমাদের জন্মমরণ, দয়ালু দেবতা!

স্বর্গ ও মর্তের সেই মোহনায় পুষ্প এসে দাঁড়ালো।

ওর কিছুদূরে নীল শূন্যে আগুনের লেখা এঁকে বিরাট এক ধূমকেতু অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে নিজের গোঁ ভরে চলে গেল।—সে মুহূর্তের হিসেব নেই। ওদের পায়ের তলায় কোন্ গ্রহের এক নদীতীর, হয়তো বা পৃথিবীরই—শান্ত অপরাহ্ণ, একদল সাদা বক মেঘের কোলে কোলে উড়চে নলখাগড়া বনের ঊর্ধ্বে আকাশে।

আজ পুষ্প যেন, দেখতে পেলে সেই দেবতাকে—নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো এই অপূর্ব জীবন-উল্লাসের স্রোতে সে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেচে যে মহাদেবতারইঙ্গিতে। কোথায় যেন তিনি মহাসুপ্তিমগ্ন, তাঁর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি, সুন্দর চোখ দুটি ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখাচ্চে, সেই স্বপ্নালসনিমীলিত আয়ত চোখ দুটি! পুষ্প বল্লে—উনি উঠবেন কখন? চরম বন্দনা করি।

পুষ্পের মনের মধ্যে থেকেই প্রশ্নের উত্তর এল—উনি ওঠেন না। অনন্ত শয্যায় অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিঃশ্বাসে যুগযুগান্ত কেটে যায়। তুমি ওঁর চরণ বন্দনা করবে? ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা? উনি কাউকে দেখেন না, কারো উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে! সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে। কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত, ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষীরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপ পুণ্য, দেশ ও কাল—সবই তাঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—কে কার উপাসনা করবে? ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে?

ভক্তিভরে প্রণাম করলে পুষ্প। উপাসনা হয় না তো হয় না।

ঘন ঘুমে অচেতন সেই দেবদেবের সুন্দর চোখ দুটি, স্বর্গ ও মর্তের দূরতম প্রান্তে, শুকতারার অস্তপথে,

ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।